মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

সুপারিশ প্রণয়নের জন্য

কনসালটেশন কমিটির প্রতিবেদন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ফেব্রুয়ারি ২০২৬

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে
সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত

কনসালটেশন কমিটির প্রতিবেদন

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত

কনসালটেশন কমিটির প্রতিবেদন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
ফেব্রুয়ারি ২০২৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © ২০২৬

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা বা জনসাধারণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃক পূর্ণ প্রতিবেদন বা এর অংশ বিশেষ পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে।

কম্পোজ, লে-আউট ও ডিজাইন
মৃনাল কৃষ্ণ দাস
মোঃ খবির উদ্দিন
হ্যাপি দেওয়ান

মুদ্রণঃ

ISBN:

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে
সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত

কনসালটেশন কমিটি

সভাপতি

১. **ড. মনজুর আহমদ,** ইমেরিটাস অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

২. **অধ্যাপক শাহেদা ইসলাম**, সাবেক চেয়ারম্যান,
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম

৩. **ড. মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ**, সহযোগী অধ্যাপক,
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. **মোঃ মুসা মিয়া,** বিশিষ্ট সাংবাদিক

৫. **মোঃ শফিকুর রহমান**, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক,
শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

৬. **এ. কে. এম. মোস্তফা কামাল**, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক,
আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

সদস্য সচিব

৭. **তরফদার মোঃ আক্তার জামীল,** যুগ্মসচিব, (সরকারি মাধ্যমিক অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

গবেষণা ও লিখন সহায়তা দল

১। **ড. শেখ শাহবাজ রিয়াদ**
অধ্যাপক (শিক্ষা), সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা

২। **খোন্দকার লুৎফুল খালেদ**
এডুকেশন এডভাইজার, আইআইডি এবং প্রাক্তন কর্মকর্তা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল

৩। **মোশাররফ হোসেন তানসেন**
পিএইচডি গবেষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪। **নাহিদ পারভীন**
সিনিয়র ম্যানেজার, স্পেশালিস্ট ইন ইসিডি এন্ড ট্রেইনিং, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

৫। **সায়েবা বিনতে জহির**
বি.এড. (সম্মান) এবং এম.এড., শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬। **তাসনুভা তাবাসসুম**
বি.এড. (সম্মান) এবং এম.এড., শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭। **সুমাইয়া এষা**
বি.এড. (সম্মান), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৮। **রাফিয়া খাতুন**
বি.এড. (সম্মান), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দাপ্তরিক ও সাচিবিক সহায়তা দল

১। **মৃনাল কৃষ্ণ দাস**
সিনিয়র গ্রাফিক ডিজাইনার, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

২। **মোঃ খবির উদ্দিন**
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচআর এন্ড এডমিন টিম, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

৩। **হ্যাপী দেওয়ান**
সিনিয়র কারিকুলাম ডেভেলপার, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি. আর. আবরারের বিশেষ উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে এক পরামর্শক কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যরা এই অতি প্রয়োজনীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে মাননীয় উপদেষ্টা ও মন্ত্রণালয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

কমিটির কার্যধারা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা, মতবিনিময় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানী থেকে দূরে ১০টি জেলার ১৪টি উপজেলা ও মহানগর এলাকায় বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় হয়। অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষানুরাগীদের সঙ্গে সংলাপের সুযোগ হয়।

রাজশাহী, যশোর ও বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আমন্ত্রণে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। উক্ত শহরগুলোর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কমিটির বৈঠক হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বমোট ৪৪টি কর্মশালা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেগুলো থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিস্থিতি, সমস্যা ও সমাধানের পথ সম্বন্ধে বক্তব্য ও পরামর্শে কমিটি উপকৃত হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী ও সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কমিটির আলোচনা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, নায়েম, এনসিটিবি, শিক্ষা বোর্ড, ব্যানবেইস, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এনটিআরসিএ, বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারি কল্যাণ ট্রাস্ট। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গেও কমিটির মতবিনিময় হয়।

সময়ের স্বল্পতা ও আরও কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে কমিটিকে কাজ করতে হয়েছে। কমিটির গবেষণা ও প্রতিবেদন তৈরির কাজে এক গবেষণা ও লিখন দলকে যুক্ত করা হয়েছিল। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কমিটিকে দাপ্তরিক সাহায্য, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও আপ্যায়নসহ অকুণ্ঠ সহযোগিতা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক ড. ইরাম মরিয়ম সার্বক্ষণিক সমর্থন দিয়েছেন। বিভিন্ন কর্মশালা ও সভার আয়োজনে নায়েম বিশেষ সহায়তা দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিযুক্ত ভিশন কমিটির আহ্বায়ক ড. আবেদ চৌধুরী মৌলভীবাজারে পরামর্শক কমিটির কাজে সহায়তা করেছেন এবং আতিথেয়তা প্রদান করেছেন। এঁদের সকলের কাছে কমিটি কৃতজ্ঞ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা তাঁদের ভাবনা ও পরামর্শ জানিয়েছেন এবং কমিটিকে সর্বোতভাবে সহায়তা দিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিভিন্নভাবে কমিটির কাজে সাহায্য করেছেন। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের কাজে লেইস প্রজেক্ট থেকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কমিটি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

কমিটির আশা এই প্রতিবেদন মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগে সহায়ক হবে এবং নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলায় অবদান রাখবে।

মনজুর আহমদ

ড. মনজুর আহমদ
সভাপতি
মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পরামর্শক কমিটি
ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সূচিপত্র

শব্দ-সংক্ষেপ i

সারসংক্ষেপ iii

অধ্যায় ১: ভূমিকা ১

১.১ প্রেক্ষাপট ২

১.২ প্রয়োগবাদী শিক্ষা দর্শন (Pragmatic Education Philosophy) ৪

১.৩ কমিটির কাজের সীমাবদ্ধতা ৫

১.৪ নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন সম্ভাবনা ৫

১.৫ প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ৬

অধ্যায় ২: শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ৭

২.১ প্রেক্ষাপট ৮

২.২ পর্যবেক্ষণ ১০

২.৩ সুপারিশমালা ২৪

২.৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব ২৭

অধ্যায় ৩: শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ২৯

৩.১ প্রেক্ষাপট ৩০

৩.২ পর্যবেক্ষণ ৩১

৩.৩ সুপারিশমালা ৩৮

৩.৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব ৪১

অধ্যায় ৪: অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন ৪৩

৪.১ প্রেক্ষাপট ৪৪

৪.২ পর্যবেক্ষণ ৪৫

৪.৩ সুপারিশমালা ৫০

৪.৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব ৫৩

অধ্যায় ৫: বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ৫৫

৫.১ প্রেক্ষাপট ৫৬

৫.২ পর্যবেক্ষণ ৫৮

৫.৩ সুপারিশমালা ৬১

৫.৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব ৬৪

অধ্যায় ৬: মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক শাসন ও ব্যবস্থাপনা ৬৫
৬.১ প্রেক্ষাপট ৬৬
৬.২ পর্যবেক্ষণ ৬৯
৬.৩ সুপারিশমালা ৭৯
৬. ৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব ৮২

অধ্যায় ৭: সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান **৮৩**
৭.১ প্রেক্ষাপট ৮৪
৭.২ পর্যবেক্ষণ ৮৫
৭.৩ সুপারিশমালা ১০০
৭.৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব ১১৩

অধ্যায় ৮: সংস্কার বাস্তবায়ন, অর্থায়ন ও পরবর্তী পদক্ষেপ ১১৫
৮.১ সংস্কার অপরিহার্য ১১৬
৮.২ বিভিন্ন সময়সূচির কার্যক্রম পরস্পর-সম্পৃক্ত ১১৭
৮.৩ অবহিতকরণ ও প্রাথমিক পর্যালোচনা ১১৮
৮.৪ মন্ত্রণালয়ের ও সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১১৮
৮.৫ আশু ও মধ্যমেয়াদি বাস্তাবায়ন বিষয়ে পদক্ষেপ ১১৯
৮.৬ দীর্ঘমেয়াদি ও সামগ্রিক শিক্ষক সংক্রান্ত বিবেচনা ১২০
৮.৭ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা খাত পরিকল্পনা এবং এর অংশ হিসেবে বিদ্যালয় শিক্ষা ১২০
৮.৮ মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থায়ন ১২১
৮.৯ সংস্কারের সূচনা-পরবর্তী পদক্ষেপ ১২২

পরিশিষ্ট ১২৫
পরিশিষ্ট ১: মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কনসালটেশন কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন ১২৬
পরিশিষ্ট ২: পরামর্শক কমিটি কর্তৃক বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পরিদর্শন ও কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্য ১২৮
পরিশিষ্ট ৩: পরামর্শক কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কর্মশালা এবং মতবিনিময় সভার তালিকা ১৩০
পরিশিষ্ট ৪: এক নজরে সুপারিশের ক্ষেত্রসমূহ ও বাস্তবায়নের সময়সীমা ১৩৪
পরিশিষ্ট ৫: মাধ্যমিক শিক্ষায় সহায়ক এবং নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৪২
পরিশিষ্ট ৬: মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের ফলাফল মূল্যায়ন ১৪৯
পরিশিষ্ট ৭: মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক কনসালটেশন কমিটি কর্তৃক শিখন যাচাই অভীক্ষা ১৬৬
পরিশিষ্ট ৮: মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা - বাছাইকৃত ৭টি উপজেলার কেইস স্টাডি ১৭৪

শব্দ-সংক্ষেপ

AI – Artificial Intelligence
B.Ed. – Bachelor of Education
BANBEIS – Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics
BBS – Bangladesh Bureau of Statistics
BCS – Bangladesh Civil Service
BEDU – Bangladesh Examination Development Unit
BEERI – Bangladesh Education Extension and Research Institute
BISE – Board of Intermediate and Secondary Education
BOU – Bangladesh Open University
BRAC – Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee
BSEd – Bachelor of Special Education
DIA – Department of Inspection and Audit
DSHE – Directorate of Secondary and Higher Education
EEC – Education Extension Center
EED – Education Engineering Department
EFA – Education for All
ELT – Expanded Learning Time
EMIS – Education Management Information System
GIS – Geographic Information System
GPE – Global Partnership for Education
HSC – Higher Secondary Certificate
HSTTI – Higher Secondary Teachers' Training Institute
IBAS – Integrated Budget and Accounting System
IEIMS – Integrated Education Information Management System
IER – Institute of Education and Research
LAISE – Learning Acceleration in Secondary Education
LASI – Learning Assessment of Secondary Institution
LDC – Least Developed Country
MEd – Master of Education
MICS – Multiple Indicator Cluster Survey

MoE – Ministry of Education
MPhil – Master of Philosophy
MPO – Monthly Pay Order
MSEd – Master of Special Education
NAEM – National Academy for Educational Management
NCTB – National Curriculum and Textbook Board
NGO – Non-Governmental Organization
NID – National Identity Card
NTRCA – Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority
NU – National University
ODL – Open and Distance Learning
OECD – Organization for Economic Co-operation and Development
PhD – Doctor of Philosophy
PLC – Professional Learning Community
PSC – Bangladesh Public Service Commission
PTR – Pupil-Teacher Ratio
RAEM – Regional Academy for Educational Management
SBA – School-Based Assessment
SDG – Sustainable Development Goals
SEDP – Secondary Education Development Program
SEQAEP – Secondary Education Quality and Access Enhancement Project
SESP – Secondary Education Stipend Project
SESIP – Secondary Education Sector Investment Program
SHED – Secondary and Higher Education Division
SMC – School Management Committee
SSC – Secondary School Certificate
TIB – Transparency International Bangladesh
TP – Teaching Practice
TQI – Teaching Quality Improvement
TTC – Teachers' Training College
UITRCE – Upazila ICT Training and Resource Center for Education in Bangladesh
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF – United Nations Children's Fund
WHO – World Health Organization

সারসংক্ষেপ

প্রেক্ষাপট

শিক্ষা মন্ত্রণালয় "মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে" এক কমিটি গঠন করে।

অংশীজনদের নিয়ে একটি কর্মশালার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয় এবং এগুলোকে ধরে গভীরতর পর্যালোচনা মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের পথনির্দেশক হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

চিহ্নিত প্রধান ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

- শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন
- শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী
- অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা
- মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক শাসন ও ব্যবস্থাপনা
- মাধ্যমিক শিক্ষা সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান
- সংস্কার বাস্তবায়ন, অর্থায়ন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ

কমিটি সীমিত সময়ের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪৪টি কর্মশালা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। দেশের দশটি জেলার এগারোটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে। সেখানে সর্বমোট অষ্টম ও নবম শ্রেণি সমাপ্ত করা সর্বমোট ৪৩৭জন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়। এছাড়াও পরিদর্শনকালে যশোর, রাজশাহী এবং বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে এবং এসব জেলার সরকারি টিটিসির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী ও সহায়ক ১৪টি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ৫টি পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা হয়। এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য।

এই প্রতিবেদনে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির) সীমিত পরিসরে আশু, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবসম্মত সুপারিশ প্রদানে কমিটি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা কমিটির কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উল্লিখিত চিহ্নিত সমস্যার ক্ষেত্র অনুসারে পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের ৬টি প্রধান ক্ষেত্রে আশু, মধ্যমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে করণীয় হিসেবে সর্বমোট ১১৮টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। সারসংক্ষেপে প্রধান সুপারিশগুলো তুলে ধরা হলো। প্রধান সুপারিসহ অন্যান্য সুপারিশের বিস্তারিত বিবরণ মূল প্রতিবেদনে আছে।

শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভিত্তিমূলক দক্ষতা নির্ধারণে, শিক্ষার্থী দক্ষতা স্তর নির্ধারণে ও নিরাময়মূলক শিক্ষায়। মাধ্যমিক শিক্ষাকে সকল শিশুর জন্য একটি অবিভাজিত প্রয়োজনীয় শিক্ষা অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক সহশিক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুর এই সংবেদনশীল বয়ঃসন্ধিক্ষণে মানসিক ও আবেগিক স্বাস্থ্য সহায়তাও জরুরি বলে ধরা হয়েছে।

এই সব লক্ষ্য পূরণের জন্য দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন চালু করা প্রয়োজন। সেজন্য তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো, শিক্ষণ-শিখন, ব্লেন্ডেড লার্নিং, নমনীয় বিদ্যালয়পঞ্জি প্রবর্তন ও বার্ষিক শিক্ষাপঞ্জির পরিবর্তন সম্বন্ধে সুপারিশ করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ হিসেবে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়কে সর্বজনীন করা এবং জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষাকে বিকেন্দ্রায়িত করার কথা বলা হয়েছে। কিছু প্রধান সুপারিশ নিচে সন্নিবেশিত হলো।

১. **ভিত্তিমূলক ক্ষেত্র নির্ধারণ:** মাধ্যমিক স্তরে বর্তমান পাঠ্যবিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে ভাষা (বাংলা ও ইংরেজি), গণিত, বিজ্ঞান এবং তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষতা তৈরিকে ভিত্তিমূলক দক্ষতা হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষতা তৈরির উপায় হবে শ্রেণিকক্ষে এবং শিক্ষার্থীদের নিজের কাজে কম্পিউটার ব্যবহার ও চর্চার সুযোগ করে দেওয়া।

২. **বিদ্যালয়ভিত্তিক দক্ষতা-স্তর নির্ধারণ ও নিরাময় সেশন চালু:** শিখন ঘাটতি পূরণে প্রতি শিক্ষার্থীর চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতি বিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা-স্তর যাচাইয়ের জন্য সহজ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ এবং শ্রেণিকক্ষে দক্ষতা দল অনুযায়ী নিরাময়মূলক শিক্ষা দিতে হবে ।

৩. **দশম শ্রেণি পর্যন্ত অবিভাজিত শিক্ষাক্রম:** নবম শ্রেণি থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বিভিন্ন ধারায় (বিজ্ঞান-মানবিক-ব্যবসায় শিক্ষা) বিভাজিত করার সিদ্ধান্ত সুবিবেচিত হয়নি। এই বিভাজন একাদশ শ্রেণি থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. **বিদ্যালয়ভিত্তিক সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের গুরুত্ব:** মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমকে বছরব্যাপী একটি নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৫. **পাবলিক পরীক্ষা ও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন:** পাবলিক পরীক্ষা মূল দক্ষতার বিষয়সমূহে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজপাঠ ও বিজ্ঞানে) সীমিত থাকবে । এসব বিষয়ে প্রশ্ন দক্ষতাভিত্তিক ও প্রয়োগমুখী হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কম্পিউটার দক্ষতার জন্য পরীক্ষার চেয়ে চর্চা ও অভিজ্ঞতার সুযোগ বেশি

প্রয়োজন। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন ও পাবলিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও ভূমিকা ভিন্ন। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রধানত হবে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক, অন্যদিকে পাবলিক পরীক্ষা হবে মূলত শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য। বিদ্যালয় মূল্যায়ন অনুসারে বার্ষিক রিপোর্ট কার্ড দেওয়া যেতে পারে। এতে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বিষয়ে অংশগ্রহণের মূল্যায়ন প্রতিফলিত হবে। পাবলিক পরীক্ষার ফল অনুযায়ী আলাদা বিষয়ভিত্তিক গ্রেডিং দেওয়া যাবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন ও পাবলিক পরীক্ষার মূল্যায়নের সংখ্যাগত মিশ্রণ সঙ্গত নয়।

৬. **অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা ও বৃত্তি পরীক্ষা অপ্রয়োজনীয়:** অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত বহাল থাকা উচিত এবং জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা পুনপ্রবর্তনের প্রয়োজন নেই।

৭. **নমনীয় বিদ্যালয়পঞ্জি প্রবর্তন ও বার্ষিক শিক্ষাপঞ্জি পরিবর্তন:** বিদ্যালয়ের শিক্ষায় সময়ের যথার্থ ব্যবহারের জন্য বার্ষিক শিক্ষাপঞ্জি পুনর্বিবেচিত হওয়া দরকার। বাংলাদেশের জলবায়ুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেপ্টেম্বর থেকে জুন বা কাছাকাছি সময়ে শিক্ষাবর্ষ নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং প্রধানত জুলাই-আগস্ট মাসে বার্ষিক গ্রীষ্মের ছুটি হতে পারে।

৮. **সামগ্রিক বিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়ন:** সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হবে।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের চাবিকাঠি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের হাতে। এই অধ্যায়ে তাদের জবাবদিহি, পেশাগত প্রস্তুতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ও শূন্যপদ পূরণের কথা আশু পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে পেশাগত শিখনসমাজ গঠন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতের প্রয়োগ, জনবল বৃদ্ধি ও পদোন্নতি, মূল্যায়ন ও জবাবদিহি এবং শিক্ষক বদলি নীতি বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষকতা পেশাকে উচ্চতম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নতুন সিদ্ধান্তের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে।

১. **শিক্ষকের জবাবদিহি:** প্রতি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেদের জন্য নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও জবাবদিহি প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবেন এবং তা শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বদলি নিয়ে নানা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগের প্রতিবিধানে কর্তৃপক্ষকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

২. **শিক্ষকের পেশাগত প্রস্তুতি - শিক্ষাবিজ্ঞানে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার:** মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসনে এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পদের জন্য শিক্ষা বিষয় এম-এড বা বি-এড বা সমকক্ষ ডিগ্রি প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার

দিতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে এটিকে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে। নতুন যোগদানকারী শিক্ষকদের জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ, নিয়ম-নীতি এবং মূল্যবোধের সাথে মানিয়ে নিতে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম চালু করা প্রয়োজন।

৩. **শূন্যপদ পূরণ:** স্বল্প সময়ের মধ্যে শূন্যপদ পূরণ করার জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রত্যন্ত বা দুর্গম অঞ্চলে, যেখানে স্থানীয়ভাবে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যায় না, সেখানে শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ভাতা বা প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. **শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ও নৈতিক মূল্যবোধ:** প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্কে কীভাবে নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণ প্রদর্শিত হতে পারে সে সমন্ধে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সম্মিলিতভাবে আচরণবিধি তৈরি করা বিবেচনা করতে পারেন।

৫. **পেশাগত শিখন সমাজ:** শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, আঞ্চলিক-জেলা-উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগে এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এলাকাভিত্তিক ও প্রতি বিদ্যালয়ে পেশাগত শিখন সমাজ (Professional Learning Community - PLC) গড়ে তুলতে হবে।

৬. **শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত:** দ্রুত নিয়োগ ও পদায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষক এর একটি যুক্তিসঙ্গত অনুপাত নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনো শ্রেণিকক্ষে অগ্রহণযোগ্য সংখ্যার শিক্ষার্থী না থাকে।

৭. **শিক্ষক বদলি নীতি:** শিক্ষকতা পেশায় বদলির নিয়ম সাধারণ সব সরকারি কর্মীদের মতো থাকা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর স্বার্থে প্রয়োজন কি না তা বিবেচনা করা দরকার।

৮. **জনবল বৃদ্ধি ও পদোন্নতি:** মাঠ পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষায় আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করা উচিত। মাঠ পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের জনবল অনতিবিলম্বে অন্তত দ্বিগুণ হওয়া উচিত।

৯. **স্ব-মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা:** নিজের কাজ, দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা এবং শক্তির ও দুর্বলতার জায়গাগুলো তালিকাভুক্ত করে আত্ম-মূল্যায়ন সংস্কৃতি চালু করা প্রয়োজন। প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে বার্ষিক ও মধ্যমেয়াদি (৫ বছরের) নিজস্ব পেশাগত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরিতে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও সহায়তা দিতে হবে।

১০. **শিক্ষকতা পেশার উচ্চতম মর্যাদা:** মানসম্মত সমতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও মর্যাদা নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে চার ধাপবিশিষ্ট দীর্ঘমেয়াদি কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- উচ্চ মাধ্যমিক-উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের চার বছরের সম্মান ডিগ্রি কোর্সে আকৃষ্ট করা যাতে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রণোদনা দিয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের এই কোর্সে ভর্তি করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ছাড়াও মানসম্মত সুযোগ সুবিধা, শিক্ষক ও একাডেমিক প্রোগ্রাম নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে প্রতি জেলায় একটি বা দুটি করে সারা দেশে অন্তত ১০০টি উচ্চমানের ডিগ্রি কলেজে শিক্ষাবিজ্ঞান প্রোগ্রাম চালু করা যায়।
- আকর্ষণীয় বেতন, ভাতা, মর্যাদা ও পেশাগত উত্তরণের পথসহ একটি জাতীয় শিক্ষা সেবা বাহিনী (National Teaching Service Corps) চালু করা যায়। নতুন ডিগ্রি কোর্স থেকে উত্তীর্ণরা শিক্ষা সেবা বাহিনীতে যোগ দিয়ে অন্তত পাঁচ বছর সরকার নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকবে।
- শিক্ষকদের পদ মর্যাদা, পারিতোষিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষক তাঁর প্রস্তুতি ও পেশাগত মান এবং আচরণ দ্বারা তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ চরিত্র হিসেবে প্রতিভাত হবেন, তাই হবে শিক্ষকতা পেশার লক্ষ্য।

অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন

অন্তর্ভুক্তি ও অভিগম্যতার অভাব এবং বৈষম্য বিদ্যালয় শিক্ষার এক প্রধান সমস্যা। এই অধ্যায়ে বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যে দ্রুত বৈষম্য হ্রাস, ঝরে পড়া রোধ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা দেওয়ার কথা আশু পদক্ষেপ হিসেবে বলা হয়েছে । মধ্যমেয়াদি সুপারিশে আছে কাঠামোগত সংস্কার, কার্যকর গুণগত উন্নয়ন এবং অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস। টেকসই, ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অধিকারভিত্তিক মাধ্যমিক শিক্ষাকে আরও কার্যকর করা ও সংস্কারকে স্থায়ীরূপ দেওয়া দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

১. **দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তা:** দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার ব্যয় লাঘবের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। সকলের জন্য উপবৃত্তির পরিবর্তে দরিদ্র বলে বিবেচিত শিশুদের জন্য উচ্চতর হারে উপবৃত্তি দেওয়া যেতে পারে। স্বল্পমূল্যে মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা হবে এক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

২. **দুর্গম এলাকায় শিক্ষক সংকট মোকাবিলায় দ্রুত নিয়োগ ও পদায়ন:** হাওর, চর, পাহাড়ি, উপকূলীয় ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ঘাটতি পূরণে অস্থায়ী/চুক্তিভিত্তিক এবং স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগ ও পদায়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এলাকার বাইরে থেকে নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য আবাসন ও বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩. **নিরাপদ ও সহিংসতামুক্ত বিদ্যালয় পরিবেশ:** ইভটিজিং (মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা), মাদক, বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন, বিদ্যালয় ও কমিউনিটির যৌথ নজরদারি ও তাৎক্ষণিক প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

৪. **পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্য নৃ-গোষ্ঠী এলাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা:** শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদগুলোর সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের লোকবল ও অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। আবাসিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থী সংখ্যা ও অবকাঠামো উন্নতির জন্য আশু প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী সরকার মাথাপিছু বরাদ্দ দিতে পারে।

৫. **বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য উদ্যোগ:** বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প, সহায়ক শিক্ষা উপকরণ, পরীক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনভিত্তিক সহায়তা দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে। প্রতি বিদ্যালয়ে এবং প্রতি উপজেলার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবে।

৬. **অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জীবনদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব:** বিশেষ চাহিদা, নৃ-গোষ্ঠী, জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও বহুভাষিক শিক্ষার বিষয়ে প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে জীবনদক্ষতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, জলবায়ু সচেতনতা ও কর্মমুখী উপাদান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. **ডিজিটাল বৈষম্য নিরসনে সমতাভিত্তিক বিনিয়োগ:** গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ, স্মার্ট ডিভাইস, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির উপকরণ চালু রাখায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে শিখন কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ও চর্চা বাড়াতে হবে।

৮. **সমগ্র বিদ্যালয় শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক ও আইনি স্বীকৃতি:** সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং পৃথক শিক্ষা অধিকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষাকে আদালতে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৯. **জলবায়ু ও দুর্যোগ-সহনশীল শিক্ষা অবকাঠামো ও জরুরি শিক্ষা ব্যবস্থা:** দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিদ্যালয় নির্মাণে জলবায়ু সহনশীল নকশা, নমনীয় শিক্ষাপঞ্জি, বিকল্প শিখন পদ্ধতি ও জরুরি শিক্ষা পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

শিক্ষার আসল কাজ সম্পন্ন হয় বিদ্যালয়ে। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য নির্ধারিত হয় বিদ্যালয়ে কী ঘটে তার ওপর। এই অধ্যায়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও দায়িত্ব, প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্ব এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখন ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের আওতায় প্রতি বিদ্যালয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের রূপ নেবে বলে সুপারিশ করা হয়েছে।

১. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

বেসরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও দায়িত্বের পরিধি উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন প্রয়োজন।

ক) কমিটি প্রধানের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। এর ব্যতিক্রম হতে পারে যদি এলাকায় সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে পাওয়া না যায়।

খ) নির্বাচিত জন প্রতিনিধি (সংসদ সদস্য বা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি) কমিটিতে সভাপতি হতে পারবেন না। কমিটিতে প্রকৃত অভিভাবকদের এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে।

গ) কমিটির কার্যপরিধিতে পরিবর্তন আনতে হবে। কমিটি বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেট উন্নয়ন পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাপনাজনিত বড় সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেবে।

২. প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ ও যোগ্যতা

ক) সরকারি ও এমপিওভুক্ত সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে।

খ) প্রধান শিক্ষকের নিয়োগের সিদ্ধান্তে শিক্ষণ-শিখন অভিজ্ঞতা ছাড়াও নেতৃত্বগুণ ও প্রশাসনিক যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

৩. বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখন উন্নয়ন

ক) প্রতি বিদ্যালয়ে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং এলাকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকদের বা অন্য বিশেষ সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা ও শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জনের মাত্রা যাচাই করতে হবে। এটি যাচাইয়ের ভিত্তিতে পরবর্তী এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত শিক্ষণ-শিখনের মান উন্নয়নের জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে।

খ) সকল বিষয়ের জন্য নির্ধারিত অভিন্ন ৪৫ মিনিটের পাঠদান পিরিয়ডে আবদ্ধ না থেকে একটি বিষয়ের জন্য এক সপ্তাহের মোট সময় ঠিক রেখে দিনের পাঠদান পিরিয়ড দীর্ঘতর করা যেতে পারে।

গ) পিছিয়ে থাকা শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের মধ্যে অতিরিক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য অভিভাবকদের থেকে সীমিত ফি নেওয়া যেতে পারে।

ঘ) সহ-শিক্ষাকার্যক্রমকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এটিকে বিদ্যালয় শিক্ষার অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখতে হবে।

ঙ) শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিদ্যালয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতি শিক্ষককে নিজের পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করে পরিকল্পনা তৈরি করতে উৎসাহিত করতে হবে।

চ) বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সহপাঠীদের সঙ্গে উপযুক্ত আচরণ ও আদান-প্রদান, পড়াশোনা সংক্রান্ত বা অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

৪. **বিদ্যালয় পর্যায়ে ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা:** শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক ও অধিকতর বিকেন্দ্রায়নের আলোকে বিদ্যালয় স্তরে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্কের মূল ভিত্তি হবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতায় অর্জন কতখানি হলো সেটি।

৫. **কমিউনিটির কাছে দায়বদ্ধতা:** সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়কে কমিউনিটির কাছে দায়বদ্ধ হতে হবে। সে লক্ষ্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করা জরুরি।

৬. **জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ:** ভবিষ্যতে মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বের পরিসর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে, শাসন ও ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে বিকেন্দ্রায়িত হবে এবং জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। এসব পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি প্রতিষ্ঠান অনেকটা স্বায়ত্বশাসিত সত্ত্বা হিসেবে পরিচালিত হবে। বিদ্যালয় তার অভিভাবক ও স্থানীয় কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক শাসন ও ব্যবস্থাপনা

এই অধ্যায়ে সামগ্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা, জনবল ও সক্ষমতা, বিকেন্দ্রায়ন, শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার, অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন উদ্যোগ, সামগ্রিক শিক্ষাখাত পরিকল্পনা এবং অদক্ষতা ও দুর্নীতি সম্মন্ধে সুপারিশ করা হয়েছে। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে উন্নত বিদ্যালয়ের জন্য উন্নত ব্যবস্থাপনা, স্থায়ী শিক্ষা কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা টাস্কফোর্স এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিষয়ে সুপারিশ আছে।

১. কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান নীতিনির্ধারণী ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের উদ্দেশ্যে নির্বাহী কাজের দায়িত্ব যথাসম্ভব অধিদপ্তর ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরে অনতিবিলম্বে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এজন্য সদিচ্ছাসহ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

খ) মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ভিন্ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে কার্যকর হওয়া উচিত। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে এই অধিদপ্তরের। এই অধিদপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকবে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে।

২. জনবল ও সক্ষমতা

ক) আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থায়ী পদায়ন দিয়ে বর্তমান শূন্যপদ পূরণ করার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) সরকারি ও এমপিওভূক্ত সকল বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের ও স্থায়ী পদায়নের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) বিশেষায়িত ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানের জন্য জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ এবং বিদ্যালয় স্তরে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব পূরণে আশুকরণীয় বিষয়ে (অধ্যায় ৩ ও ৭ এ লিপিবদ্ধ) বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে সত্বর উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য এবং অন্যান্য সুপারিশ বাস্তবায়নে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন টাস্কফোর্স গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

ঘ) মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতর পদসমূহে পেশাগতভাবে শিক্ষায় অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে উচ্চপদে প্রশাসন ও শিক্ষা ক্যাডারের মিশ্রণ হওয়া দরকার।

৩. **বিকেন্দ্রায়ন:** বিকেন্দ্রায়িত ও জবাবদিহি ব্যবস্থাপনা সুসংহত করার জন্য জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনাগত ও নির্বাহী দায়িত্ব যথাসম্ভব আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা স্তরে হস্তান্তরের (delegation) উদ্যোগ নিতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরে জনবল ও সক্ষমতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনতিবিলম্বে শুরু করতে হবে।

৪. **শিক্ষা জনবল ব্যবস্থাপনা:** অধিদপ্তরসহ সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় ও বিভিন্ন বিশেষায়িত ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানের কর্মীর যোগ্যতা নির্ধারণ, যোগ্যতার প্রত্যয়ন, ও নিয়োগ-পদায়ন-পদোন্নতির সুপারিশ একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা সার্ভিস কমিশনের হাতে ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন।

৫. **শিক্ষাবিজ্ঞানে ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার:** বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অফ এডুকেশন (সম্মান) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমএড ডিগ্রিধারীদের প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন।

৬. **জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ:** মাধ্যমিক শিক্ষার আঞ্চলিক উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ব্যাপকতর বিকেন্দ্রায়নের উদ্দেশ্যে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। মধ্যমেয়াদে অন্তত: ১০টি জেলায় এই পাইলট শুরু করা যেতে পারে যা দীর্ঘমেয়াদে সারাদেশে বাস্তবায়ন করা যায়।

৭. **সামগ্রিক শিক্ষাখাত পরিকল্পনা:** মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত উপখাত উন্নয়ন সামগ্রিক শিক্ষাখাত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিবেচনা করে শিক্ষাখাত পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে।

৮. **অদক্ষতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ:** অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্তরে তত্ত্বাবধান, নজরদারি ও জবাবদিহির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অভিযোগ দ্রুত ও সহজে দাখিল ও নিস্পত্তির জন্য একটি হটলাইনসহ অন্যান্য কার্যকর প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে।

৯. **মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব:** দেশে বেসরকারি শিক্ষা সেবা থাকবে, কিন্তু সে সুযোগ যারা গ্রহণ করবে না, তারাসহ সকল শিশুর জন্য রাষ্ট্র হবে শেষ অবলম্বন (provider of last resort)। এজন্য বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থাপনার নীতিতে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক শিক্ষা সেবার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।

১০. **স্থায়ী শিক্ষা কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা টাস্কফোর্স:** মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন টাস্কফোর্স স্থায়ী সত্ত্বায় পরিণত হবে ও স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠিত হবে ।

সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে উপজেলা পর্যন্ত প্রশাসনিক অবকাঠামো এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী ও সহায়ক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোর সফল কার্যক্রম এবং কীভাবে তারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজে সহায়তা দিতে পারে তার ওপর নির্ভর করে দেশের শিক্ষার লক্ষ্য কতখানি অর্জিত হচ্ছে। নিচে এরূপ ১৫টি প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য প্রধান সুপারিগুলো উল্লেখ করা হলো। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ অধ্যায়-৭ এ দেওয়া আছে।

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

- সেক্টর-ভিত্তিক পরিকল্পনা ও স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা
- নীতিনির্ধারণী সক্ষমতা জোরদারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-এর প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদ পুনর্গঠন
- শিক্ষা-সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিস্পত্তির জন্য বিশেষ বিচারিক ব্যবস্থা ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়
- মাধ্যমিক শিক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ

২. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

- মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকার প্রদান; স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা
- পেশাদার, শিক্ষাবিষয়ে দক্ষ ও স্থায়ী মানবসম্পদ কাঠামো নিশ্চিতকরণ
- মাউশির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদারে কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন
- মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যকর আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা

৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

- আইন ও বিধিমালা আধুনিকায়ন
- জনবল কাঠামোর বিশেষায়ন, আধুনিকায়ন ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ
- গবেষণা ও গুণগত মানোন্নয়ন ইউনিট গঠন
- আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও আঞ্চলিক শিক্ষা পরিকল্পনা
- প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন ও পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন

৪. পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

- জনবল বৃদ্ধি ও বিশেষায়িত নিয়োগ
- অভিযোগ তদন্তে নিরপেক্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা
- একাডেমিক পরিদর্শনের সমন্বয়, সনদ যাচাই ও এমপিও সংক্রান্ত অনিয়ম ব্যবস্থাপনা
- আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অটোমেশন

৫. এনসিটিবি

- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে এনসিটিবি -এর মূল কার্যাবলির পুনঃসংজ্ঞায়ন ও গবেষণাভিত্তিক রূপান্তর
- বিশেষায়িত ও পেশাদার মানবসম্পদ কাঠামো গঠনের মাধ্যমে এনসিটিবি -এর কারিগরি সক্ষমতা জোরদার
- প্রমাণভিত্তিক শিক্ষাক্রম সংস্কার ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হ্রাসে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা
- শিক্ষাক্রমের উল্লম্ব ও আনুভূমিক (vertical and horizontal) সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদারকরণ
- পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য স্বতন্ত্র সংস্থা

৬. নায়েম

- বিশেষায়িত মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ফলাফলভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা
- সমন্বিত প্রশিক্ষণ মাস্টার প্ল্যান ও ডিজিটাল ডাটাবেজের মাধ্যমে নায়েম -এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ভূমিকা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
- আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ ও টেকসই অর্থায়ন

৭. ব্যানবেইস

- প্রকল্প-নির্ভরতা হ্রাস ও স্থায়ী জনবল কাঠামো
- টেকসই অর্থায়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ডেটা ব্যবস্থাপনা
- সমন্বিত জাতীয় শিক্ষা ডেটা সেন্টারে রূপান্তর

৮. টিটিসি

- প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে টিটিসির অংশগ্রহণ
- সমন্বিত জাতীয় শিক্ষক উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় ভূমিকা
- টেকসই অর্থায়ন কাঠামো প্রণয়ন
- প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ও বিশেষায়িত বিভাগ প্রতিষ্ঠা
- জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও নেতৃত্ব বিকাশ
- অবকাঠামো উন্নয়ন ও ল্যাব স্কুল পুনঃপ্রতিষ্ঠা
- ১ বছর ও ৪ বছর মেয়াদি বি.এড. প্রোগ্রামের কাঠামোগত সংস্কার

৯. এনটিআরসিএ

- দক্ষতা ও পেশাগত উপযুক্ততা যাচাইয়ে শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ পরীক্ষার সংস্কার
- প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়
- বিশেষায়িত মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-কে কার্যকর সংস্থায় রূপান্তর
- তথ্যভিত্তিক শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ ও প্রক্ষেপণের মাধ্যমে সময়োপযোগী নিয়োগ

১০. বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট

- স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ
- বিশেষায়িত মানবসম্পদ ও গবেষণাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি
- শিক্ষা বোর্ডসমূহের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের মানগত সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ

১১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

- অংশগ্রহণমূলক ও সময়োপযোগী বি.এড শিক্ষাক্রম সংস্কার
- একাডেমিক নেতৃত্ব ও মাননিয়ন্ত্রণ কাঠামো শক্তিশালীকরণ
- পরীক্ষা, ফলাফল ও একাডেমিক ক্যালেন্ডারে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ
- প্রশাসনিক সক্ষমতা উন্নয়ন এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়

১২. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (স্কুল অফ এডুকেশন)

- দূরশিক্ষণ দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একাডেমিক কাঠামো ও শিক্ষার্থী সম্পৃক্ততা জোরদার
- শিক্ষাক্রম, শিক্ষণ উপকরণ, একাডেমিক রিসোর্স ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি
- স্টাডি সেন্টারভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন, টিচিং প্র্যাকটিস ও টিউটর ব্যবস্থার মাননিয়ন্ত্রণ

১৩. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

- ঠিকাদার নির্বাচন ও তদারকিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি
- বিকেন্দ্রায়িত ও অংশগ্রহণমূলক অবকাঠামো পরিকল্পনার কার্যকর প্রবর্তন
- শিশু-বান্ধব ও দেশীয় স্থাপত্যভিত্তিক বিশেষায়িত নকশা সক্ষমতা উন্নয়ন
- জনবল, রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই বাজেট কাঠামো শক্তিশালীকরণ

১৪, ১৫. বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারি অবসর সুবিধা বোর্ড ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

- প্রাতিষ্ঠানিক একীভূতকরণ ও সেবা প্রক্রিয়ার সরলীকরণ
- পেন্ডিং আবেদন নিষ্পত্তিতে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা, বাজেট ও জনবল
- ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন ও স্বয়ংক্রিয় অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা জোরদারকরণ
- স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কাঠামো জোরদারকরণ

সংস্কার বাস্তবায়ন, অর্থায়ন ও পরবর্তী পদক্ষেপ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদের শেষ সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য পরামর্শক কমিটি নিয়োগ দেওয়া হয়। নির্বাচন পরবর্তী নতুন সরকারের জন্য সংস্কারের এজেন্ডা হিসেবে পরামর্শক কমিটির প্রতিবেদন বিবেচিত হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। কমিটি এই লক্ষ্য সামনে রেখে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা নতুন সরকারের নেতৃত্বে দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এ জন্য সুপারিশের তালিকা তৈরি যথেষ্ট নয়। সুপারিশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারসহ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরামর্শক কমিটির মতে প্রতিবেদন ও এর সুপারিশসমূহের যথার্থ বিবেচনা ও বাস্তবায়নের পথে এগোনোর জন্য অন্তত: ছয়টি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

১. অবহিতকরণ ও প্রাথমিক পর্যালোচনা: সংস্কার সফল করতে হলে এটি প্রধান অংশীজন এবং জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং তাদের সমর্থন আদায় করতে হবে। সরকারের কাছে প্রতিবেদন হস্তান্তরের পর এটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। নতুন রাজনৈতিক সরকারের জন্য সামগ্রিক শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্য অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে বলে আমরা মনে করি। এজন্য গণসচেতনতা ও জনসমর্থন তৈরি করা প্রয়োজন হবে।

২. মন্ত্রণালয়ের ও সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ: শিক্ষা সংস্কারে, বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের কিছু আশু পদক্ষেপ হবে নতুন সরকারের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা। সরকারের আন্তরিকতা ও সংকল্পের নিদর্শন দ্রুত দেখাতে হবে। এজন্য সরকারের বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্বরান্বিত করে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। জন অবহিতকরণ চলাকালে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সুপারিশ পর্যালোচনা শুরু হতে পারে। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন টাস্কফোর্স গঠন করে এই কাজের সূচনা হতে পারে। আশু, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ও মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের আওতার বিষয় এবং সরকারি উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৩. আশু ও মধ্যমেয়াদি বাস্তাবায়ন বিষয়ে পদক্ষেপ: বিদ্যমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দৈনন্দিন কার্যক্রম চলমান আছে। এ সবের অর্থায়ন, কাজের পরিধি ও অগ্রাধিকার স্থির হয় সরকারের বার্ষিক বাজেটের মাধ্যমে। এছাড়াও আছে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম। বর্তমানে দাতা-সহযোগিতায় চালু লেইস প্রজেক্টের বিভিন্ন কার্যসূচির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ অন্য কার্যসূচি বিবেচনাধীন থাকতে পারে। এই প্রতিবেদনে যে সংস্কার বা পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলো দৈনন্দিন ও উন্নয়ন কার্য পরিচালনা উভয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরবর্তী শিক্ষা বাজেট ও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে আশু ও মধ্যমেয়াদি সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে প্রাধান্য দিতে হবে।

৪. দীর্ঘমেয়াদি ও সামগ্রিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিবেচনা: প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিদ্যালয়কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা এবং এর অংশ হিসেবে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও অর্জনযোগ্য ফলাফল পুনর্বিবেচনা এই প্রতিবেদনের মূল কথা। বর্তমান প্রতিবেদনে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার সীমিত পরিসরে আলোচনা ও সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত হিসেবে সীমারেখা টানলেও শিক্ষার ও সমাজের লক্ষ্য অর্জনে এই প্রাচীর অতিক্রম করা প্রয়োজন।

৫. পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাখাত পরিকল্পনা এবং এর অংশ হিসেবে বিদ্যালয় শিক্ষা: মাধ্যমিক শিক্ষা উপখাতের বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। ২০২০ সালে এ ধরনের এক উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ এখন পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে, "শিক্ষার রূপকল্প" প্রতিবেদন, বর্তমান প্রতিবেদন এবং শিক্ষার অন্যান্য উপখাত (উচ্চশিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা) বিষয়ে বিভিন্ন পর্যালোচনার ভিত্তিতে মধ্যমেয়াদি শিক্ষা খাত পরিকল্পনা ও দশ সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন।

৬. মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থায়ন: শিক্ষা একটি শ্রমঘন খাত। সরকারের বাজেট ব্যবস্থায় চলতি (রাজস্ব) ও উন্নয়ন এই দুই খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় হয়। শিক্ষা ব্যয়ের এক বড় অংশ জনবল খাতে, যা প্রধানত রাজস্বখাতের ব্যয়। অবকাঠামোজনিত ব্যয় হয় উন্নয়ন খাত থেকে। সংস্কারের সুপারিশগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে হলে উভয় ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি, উপযুক্ত প্রাক্কলন ও যথার্থ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

সংস্কারের বিভিন্ন সুপারিশের আলোকে এই সব ব্যয়ের ধরন, বিতরণ ও জবাবদিহি এবং ফলাফল-সাপেক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যথার্থ বিকেন্দ্রায়িত শাসন ও ব্যবস্থাপনা শ্রমঘন এই সেবাখাতে বিনিয়োগের কার্যকর ব্যবহারে সহায়ক হবে। মূল লক্ষ্য হবে পরিবারের সঙ্গতির অভাবে মানসম্মত শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বাংলাদেশের কোনো শিশু বঞ্চিত হবে না। পরবর্তী বার্ষিক শিক্ষাখাত বাজেট এ সম্বন্ধে জাতিকে নতুন বার্তা দেওয়ার এক সুযোগ।

সংস্কারের সূচনা - পরবর্তী পদক্ষেপ

নবনির্বাচিত সরকার ও নতুন রাজনৈতিক আবহ শিক্ষা উন্নয়নের দ্বার উন্মোক্ত করতে পারে; তেমনি সংস্কার ও উন্নয়ন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক ইশতিহারে শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলোতে সামগ্রিক শিক্ষা উন্নয়নের দর্শন, লক্ষ্য ও কৌশলের যথার্থ প্রতিফলন থাকা দরকার। এজন্য কীভাবে এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তা স্পষ্ট করতে হবে। রাজনৈতিক ইশতিহারে তা স্পষ্ট করা সহজ নয়। তবে বিচ্ছিন্ন কিছু শিক্ষা টার্গেট থেকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা উন্নয়নের রূপকল্প, কর্মপরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয়, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়ন দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া এবং অর্থায়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, সেই স্বীকৃতি প্রয়োজন।

সংস্কারের কার্যকর সূচনার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন:

ক) বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন টাস্কফোর্স অবিলম্বে গঠন করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় নিতে পারে।

খ) শিক্ষা খাত পরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা দেওয়া এবং এ সম্বন্ধে সরকারের অনুমোদন সংগ্রহ করার উদ্যোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে। প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপখাত উন্নয়ন হবে সামগ্রিক শিক্ষা খাত পরিকল্পনার অংশ। এই উদ্দেশ্যে নেতৃত্ব দিতে পারে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত টাস্কফোর্স।

গ) সমগ্র বিদ্যালয় শিক্ষাকে (প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত) একই মন্ত্রণালয়ের বা তত্ত্বাবধানের আওতায় নিয়ে আসার বিষয় বিবেচনা করার উদ্যোগ নিতে হবে। সর্বজনীন প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে এই পদক্ষেপ প্রয়োজন। নতুন রাজনৈতিক সরকারের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত হবে শিক্ষা উন্নয়নে এক ইতিবাচক বার্তা।

বর্তমান প্রতিবেদনের সুপারিশ শিক্ষা সংস্কারের শেষ কথা নয়। আসল কথা, শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়ন অবহেলিত হয়ে এসেছে। এই অবহেলার অবসান ঘটাতে হবে। সামগ্রিক সংস্কার প্রক্রিয়ার সূচনা হতে হবে - কালক্ষেপণ না করে এবং খন্ডিত ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগে সীমাবদ্ধ না থেকে। শিক্ষা ও জনসম্পদ উন্নয়নের জন্য 'দশ সালা' জাতীয় এক মহাপরিকল্পনা নয় কেন?

অধ্যায়

১

ভূমিকা

শিক্ষায় অবহেলার অবসান হবে কি?

১ ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

শিক্ষা মন্ত্রণালয় "মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে" এক কমিটি গঠন করে।

কমিটির কার্যপরিধির বিবরণে মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সংস্কারের চাহিদা নির্ণয় এবং শিক্ষা কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুপারিশ প্রদানের কথা বলা হয়।

কমিটির কার্যসম্পাদনের প্রয়োজনে মাধ্যমিক শিক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের আলোচনায় আমন্ত্রণ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মশালার আয়োজন ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কথা বলা হয়। ২০২৫-এর নভেম্বর মাসে কাজের সূচনা থেকে কমিটিকে বাস্তবসম্মত সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তিন মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

সরকার মনোনীত দশ সদস্যের কমিটিতে একজন অসুস্থতাজনিত কারণে ও বর্তমানে সরকারি পদে কর্মরত দুইজন তাঁদের দৈনন্দিন কাজের চাপে কমিটির নিয়মিত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। অন্য সদস্যরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন। কমিটির কাজে এবং গবেষণা ও প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তার জন্য একটি গবেষণা ও লিখন সহায়তা দল তৈরি করা হয়।

ব্যক্তির শিক্ষাজীবন এবং পরিণত বয়সে সাফল্যের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই স্তরে শিশু মৌলিক দক্ষতা অর্জন করে - বিশেষত বাংলা ও ইংরেজি ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান ও বর্তমানে অতি প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষতার ক্ষেত্রে। এসব দক্ষতা পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা ও কর্মজীবনের প্রস্তুতির ভিত্তি। তাছাড়া, কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধিকাল শিশুর শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগিক বিকাশের জন্য সংবেদনশীল সময়। নৈতিকতা, চরিত্র, মানবিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ গঠনের সময় এটি। জীবন, সমাজ এবং বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা ও মনোভঙ্গি তৈরির সূত্রপাত হয় এসময়। এক কথায় ভবিষ্যত প্রজন্ম কেমন হবে তা স্থির হয় এই বয়সে। তাই বিদ্যালয় শিক্ষা শিশুর বিকাশ ও গঠনে কী ভূমিকা রাখবে, তা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর প্রতি আমরা কি সুবিচার করতে পারছি, তাও এক বড়ো প্রশ্ন।

বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষায় সংখ্যাগত প্রসার ঘটেছে, কিন্তু গুণগত মান উন্নয়ন, বৈষম্য নিরসন এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নানা সমস্যা বিদ্যমান। ২০১৫ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ -এর চতুর্থ লক্ষ্যে (এসডিজি ৪) সকল শিশুর জন্য মানসম্মত, বৈষম্যহীন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মাধ্যমিক শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশও এই লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার আশা পূরণে সর্বজনীন ও গ্রহণযোগ্যমানের মাধ্যমিক শিক্ষা অপরিহার্য। কিন্তু এজন্য কার্যকর কোনো জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তদাতাদের দ্বিমুখীতার এক উদাহরণ। এই সিদ্ধান্তহীনতা থেকে দেশকে পরিত্রাণ পেতে হবে।

পরামর্শক কমিটির নির্ধারিত লক্ষ্য ও কার্যপরিধি অনুযায়ী এর কার্যধারা স্থির করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার বহুল আলোচিত ও প্রচলিত সমস্যার তালিকায় সীমাবদ্ধ না থেকে অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে প্রধান সমস্যার ধরন ও চরিত্র নিরূপণ, প্রধান বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এসব থেকে উত্তরণের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে এক প্রাথমিক আলোচনার আয়োজন করা হয়। ২০২৫ সালের ৮ নভেম্বর মাসে নায়েমে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় মাধ্যমিক শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দায়িত্ব ও ভূমিকায় থাকা প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার সূচনায় দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণাপত্র ও কর্মশালার উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, মূল্যবোধ ও দক্ষতার মান বৃদ্ধি এবং শিক্ষায় বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের ব্যাপক প্রসার কীভাবে হতে পারে তা আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রতিপাদ্য হিসেবে ধরা হয়। কর্মশালায় দলবিভক্ত আলোচনার পর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যার কিছু ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয় এবং এগুলোকে ধরে গভীরতর পর্যালোচনা মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের পথনির্দেশক হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

চিহ্নিত প্রধান ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

- শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন
- শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী
- অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা
- মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক শাসন ও ব্যবস্থাপনা
- মাধ্যমিক শিক্ষা সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান
- সংস্কার বাস্তবায়ন, অর্থায়ন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ

কমিটির প্রতিবেদনে ও সুপারিশে এসব সমস্যার ক্ষেত্রবিন্যাস অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথম কর্মশালায় চিহ্নিত সমস্যার ক্ষেত্রগুলোকে পর্যালোচনা ও মতবিনিময়ের প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে পরবর্তী মতবিনিময় সভা ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়। আলোচনাগুলোয় সমস্যা সমাধানের পথ

খোঁজা ও বাস্তবসম্মত করণীয় নির্ধারণের ওপর জোর দেওয়া হয়। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমস্যা ও স্থানীয় সমাধান তুলে ধরাকে উৎসাহিত করা হয়।

কমিটি সীমিত সময়ের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মতবিনিময় ও কর্মশালার আয়োজন করে। এই উদ্দেশ্যে কমিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ দেশের দশটি জেলার চৌদ্দটি উপজেলা/মহানগর এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে কর্মশালা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি কর্মশালায় ৫০ থেকে ৬০ জন শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সরেজমিনে এগারটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবক ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের সংগে মতবিনিময় হয়। বিদ্যালয়ে অষ্টম ও নবম শ্রেণি সমাপ্ত করা গড়ে প্রায় ২৫ জন করে শিক্ষার্থীকে নিয়ে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে কিনা সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া। এছাড়াও পরিদর্শনকালে যশোর, রাজশাহী এবং বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে এবং এসব জেলার সরকারি টিটিসির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে মত বিনিময় হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী ও সহায়ক ১৪টি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ৫টি পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা হয়। এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য।

১.২ প্রয়োগবাদী শিক্ষা দর্শন (Pragmatic Education Philosophy)

শিক্ষার সংস্কার ও পরিবর্তনে বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্যোগে অন্তত তিনটি ধারা বিদ্যমান বলা যায়। প্রথম, নতুন দর্শন ও রূপকল্পের ধারণা পোষণ করে বর্তমান ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপান্তরের প্রচেষ্টা। অকার্যকর চলমান ব্যবস্থার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন এর লক্ষ্য। দ্বিতীয়, বিদ্যমান শিক্ষা আয়োজনের বিভিন্ন দিক, যেমন - শিক্ষাক্রম, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ও শিক্ষক প্রস্তুতি ইত্যাদি একাধিক ক্ষেত্রে বর্তমান দুর্বলতা কাটিয়ে এগুলোকে আরও কার্যকর করা। তৃতীয়, শিক্ষার পরিবর্তনে এক ধরনের অর্থনীতিবাদী (economistic) কৌশল। এই ধারায় শিক্ষার এক বা একাধিক উপখাতে বিনিয়োগ-মুনাফার হিসেব প্রয়োগ করে করণীয় নির্ধারণে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার ফল বা পরিণাম বিচারে শ্রম বাজারের জন্য উপযুক্ত কর্মী তৈরিকে প্রাধ্যান্য দেওয়া হয়।

এই বিভিন্ন চিন্তাধারা বা কৌশলের প্রত্যেকটির নিজস্ব যৌক্তিকতা ও সার্থকতা আছে। তেমনি প্রত্যেকটির সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক দুর্বলতাও আছে। তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার খোল নলচে পাল্টে ফেলা যায় না। অন্যদিকে চলমান কার্যক্রমে বড়ো পরিবর্তন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। জটিল ও বহুমাত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক বা একাধিক উপাদানে পরিবর্তনে কোনো এক উপখাতের কার্যকারিতা অর্জিত নাও হতে পারে।

এজন্য সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংস্কারের উদ্যোগ প্রয়োজন। তেমনি প্রতি পদক্ষেপে লাভ-ক্ষতি যাচাই সীমিত আর্থিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের জন্য জরুরি।

বর্তমান প্রতিবেদনের পর্যালোচনা ও সমাধানের বিবেচনায় উল্লিখিত তিন ধারার সমাহার ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অন্তত দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও করণীয়ের সুপারিশে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপান্তরের ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছে। আশু ও মধ্যমেয়াদে মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানে সংস্কার সংক্রান্ত পদক্ষেপ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব বিবেচনায় স্থান পেয়েছে। শিক্ষা উন্নয়নের দর্শন ও কৌশল হিসেবে দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন ডিউয়ির (John Dewey, 1859-1952) প্রয়োগবাদী শিক্ষা দর্শন (Pragmatic Education Philosophy) কমিটিকে প্রভাবিত করেছে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (system thinking), অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন, বিদ্যালয়কে সামাজিক সত্ত্বা হিসেবে দেখা, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিখন - এসব ডিউয়ির প্রয়োগবাদী ও প্রগতিশীল শিক্ষা চিন্তার বৈশিষ্ট্য (Dewey, 1916)।

১.৩ কমিটির কাজের সীমাবদ্ধতা

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যে কমিটির কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তিন মাস সময়ের মধ্যে পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন তৈরির সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। সকল সদস্য কমিটির কাজে বিভিন্ন কারণে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাছাড়া কমিটির কার্যপরিধি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে সীমিত রাখা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসনিক বিভাজনের কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরসহ সম্পূর্ণ বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে পর্যালোচনার সুযোগ কমিটির কার্যপরিধিতে ছিল না। মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাও কমিটির কাজের আওতায় ছিল না। কমিটির বিবেচনায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ বিদ্যালয় শিক্ষার ধারাবাহিকতা, শিক্ষণ-শিখন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও সম্পূর্ণ বিদ্যালয় শিক্ষায় সর্বজনীন অধিকারের স্বীকৃতি শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় থাকা প্রয়োজন। আমাদের পর্যালোচনায় এই উপলব্ধি আবার উঠে এসেছে। বর্তমান প্রতিবেদনে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির) সীমিত পরিসরে বাস্তবসম্মত সুপারিশ প্রদানে কমিটি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

১.৪ নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন সম্ভাবনা

জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থান ও আত্মত্যাগের ফলে অভাবনীয় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদের শেষ সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাচন পরবর্তী নতুন সরকারের জন্য সংস্কারের এজেন্ডা হিসেবে পরামর্শক কমিটির প্রতিবেদন বিবেচিত হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে। এসব প্রতিশ্রুতিকে শিক্ষা রূপান্তরের দর্শন,

রূপকল্প ও বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনার অন্তর্গত করতে হবে। দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা নির্বাচন পরবর্তী নতুন সরকারের নেতৃত্বে দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষাকে অবহেলার অবসান ঘটবে। এই উদ্যোগে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের প্রতিবেদন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-নিযুক্ত প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মনোন্নয়নের জন্য পরামর্শক কমিটির ইতোমধ্যে প্রণীত সুপারিশমালা অবদান রাখবে বলে আমরা আশা করি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী দশ বছরে শিক্ষা রূপান্তরের রূপকল্প (vision) প্রণয়নের জন্য আরেকটি কমিটি গঠন করেছে। এই তিন উদ্যোগকে পরস্পর সম্পূরক ও পরিপূরক হিসেবে দেখতে হবে। নতুন সরকার তার শিক্ষার অঙ্গীকার পূরণে এসব পর্যালোচনা ও সুপারিশ যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট হিসেবে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার এখন বিশ্বময় স্বীকৃত। বাংলাদেশে ২০৩০ সালে না হলেও কবে এই লক্ষ্য অর্জিত হবে তা স্থির করতে হবে। এজন্য মধ্যমেয়াদি শিক্ষা খাত পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা তৈরি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নতুন সরকারের এটি একটি আশু সিদ্ধান্ত হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। এই জরুরি কাজে বর্তমান প্রতিবেদন ও উল্লিখিত অন্য উদ্যোগ অবদান রাখবে বলে আমরা আশা করি।

১.৫ প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু

এই ভূমিকার পর প্রতিবেদনের মূল উপস্থাপনা ওপরে উল্লিখিত সমস্যা নির্ণয়কারী চিহ্নিত প্রধান ক্ষেত্রগুলো অনুসারে সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। অধ্যায় ২ থেকে অধ্যায় ৭ কে প্রেক্ষাপট, পর্যালোচনা ও সুপারিশ এই তিন অংশে ভাগ করা হয়েছে। অধ্যায় ৮ এ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরবর্তী পদক্ষেপের কথা বর্ণিত হয়েছে। মূল অধ্যায়ের পরিসর সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পরিশিষ্টে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনের বিবরণ, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে মূল্যায়নের তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে কিছু উপজেলার সংক্ষিপ্ত কেইস স্টাডি পরিশিষ্টে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া আছে পরামর্শক কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন এবং কর্মশালা ও মতবিনিময় সভার তালিকা। প্রতিবেদনের প্রারম্ভিক অংশে একটি সারসংক্ষেপ যোগ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*, The MacMillan Company.

অধ্যায়

২

শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে দেশের প্রতিটি তরুণ হবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে চৌকস।

২.১ প্রেক্ষাপট

মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তিমূলক ভূমিকা এবং শিক্ষার্থীর বিকাশগত বৈশিষ্ট্য

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা একটি ভিত্তিমূলক ও রূপান্তরমূলক (Transitional) স্তর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্জিত মৌলিক সাক্ষরতা, গাণিতিক দক্ষতা ও সামাজিক আচরণগত সক্ষমতা এই স্তরে সুসংহত হয়। অতঃপর শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের জন্য প্রস্তুত হয়। এই স্তর কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের এক সংবেদনশীল সময় (UNICEF, 2021; World Health Organization [WHO], 2021)। মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিদ্যালয় পরিবেশ শিক্ষার্থীদের বিকাশগত বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া জরুরি।

কৈশোরে মস্তিষ্কের বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ দ্রুততর হয়। বিশ্লেষণী চিন্তা, সমস্যা সমাধান, নৈতিক বিচারবোধ এবং সহমর্মিতা বিকাশের অনুকূল সময় এটি (Darling-Hammond et al., 2020)। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা কেবল পাঠ্যজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্র নয়, বরং সামাজিক দক্ষতা, নেতৃত্বগুণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, মানসিক স্থিতি এবং জীবনদক্ষতা গঠনেরও একটি সময় ও সুযোগ।

কিশোরীদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন, মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক বিধিনিষেধ বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে প্রভাব ফেলে (UNICEF, 2021)। অন্যদিকে কিশোর ও কিশোরী উভয়ের ক্ষেত্রে পরিচয় সংকট, সহপাঠীর প্রভাব, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে জড়ানোর প্রবণতা এবং পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে চাপ মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব বিস্তার করে (WHO, 2021)। তাই বিদ্যালয়ে পরামর্শসেবা (Counseling), স্বাস্থ্য ও জীবন দক্ষতার শিক্ষা, সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজ এবং ইতিবাচক আচরণ চর্চার সুযোগ শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন।

বর্তমানে বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ১ কোটি শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত এবং সরকারি, বেসরকারি বিদ্যালয়সহ প্রায় ২০ হাজার প্রতিষ্ঠান এই স্তরে আছে (BANBEIS, 2024)। সাম্প্রতিক বছরে মোট ভর্তি হার (gross enrolment rate) কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও নিট ভর্তি হার (net enrolment rate), শ্রেণিতে ধারাবাহিক উপস্থিতি এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা শেষ করার হার এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। বিশেষ করে কৈশোরকালীন সামাজিক চাপ, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, বাল্যবিবাহ এবং শিখন ঘাটতির কারণে নবম ও দশম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া তুলনামূলকভাবে বেশি (World Bank, 2019; BANBEIS, 2024)।

মাধ্যমিক শিক্ষার নানা দুর্বলতা সমাধানে 'পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় ধারণা' (whole school concept) এবং সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। শিক্ষাক্রম, বিদ্যালয় পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কেবল একাডেমিক সাফল্যের জন্য নয়; বরং সুস্থ, আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য একটি কার্যকর ভিত্তি হতে পারে।

রাষ্ট্রের দায়িত্বের ধরন

সংবিধান ও জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্মত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, উপযুক্ত ও কার্যকর শিক্ষণ-শিখন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ মাধ্যমিক স্তরে সর্বজনীন শিক্ষার কোনো পরিকল্পনা বা অঙ্গীকার এখনো নেই। এসডিজি ৪-এ সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত থাকলেও বাংলাদেশে এ ব্যাপারে কোনো লক্ষ্য স্থির হয়নি।

শিক্ষা সেবাদাতা ছাড়া রাষ্ট্রের ভূমিকা পরিকল্পনাকারী, নিয়ন্ত্রক ও সহায়ক- এই তিনটি মাত্রায় বিস্তৃত। শিক্ষকদের নিয়োগ ও পেশাগত উন্নয়ন, শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার এবং তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষা সম্প্রসারণ- এসবের মাধ্যমে রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন করে। শিক্ষাক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ না থাকায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন ব্যাহত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ২০২৬ সালে LDC (Least Developed Country) অবস্থান থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উত্তরণ করবে। আগামী দশকে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে বাংলাদেশ আশা পোষণ করে। সকল শিশুর জন্য মানসম্মত বিদ্যালয় শিক্ষার নিশ্চয়তা এজন্য অপরিহার্য। শুধু মাথাপিছু আয়ের হিসাবে নয়, শিক্ষার সূচকেও উচ্চমধ্যম আয়ের দেশের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

উচ্চমানের মানবসম্পদ তৈরি, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী শিক্ষায় বিনিয়োগ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ নির্মাণ মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বারা সম্ভব হতে পারে, যা আজকের প্রেক্ষাপটে অপরিহার্য।

মাধ্যমিক শিক্ষায় উন্নয়ন উদ্যোগ

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে গুণগত উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ কাঠামোর মধ্যে Secondary Education Sector Investment Program (SESIP)-এ মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, পাঠ্যক্রম আধুনিকীকরণ, শিক্ষক সক্ষমতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছে। তাছাড়া Secondary Education Development Program (SEDP)-এর আওতায় ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং জেন্ডারসমতা জোরদারের চেষ্টা করা হয়েছে।

সম্প্রতি Learning Acceleration in Secondary Education (LAISE) প্রকল্প (২০২৩-২৮) গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে শিখন ঘাটতি নিরসন, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, তদারকি এবং ই-মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রায় তিন দশক ধরে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু আছে। মেয়াদকাল ও কার্যক্রমে এগুলোর মধ্যে কিছু পুনরাবৃত্তি (overlap) দেখা যায়। এগুলোকে খাতভিত্তিক (sector-wise) হিসেবে আখ্যায়িত করলেও দেশের সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন এগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কাঠমোগত পরিবর্তন ও অধিকারভিত্তিক বিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য এসবে স্থান পায়নি। এসব উদ্যোগের ফল অঞ্চল, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীভেদে সমভাবে দেখা যায়নি। গ্রাম-শহর বৈষম্য, দারিদ্র্যপীড়িত ও প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং মানবসম্পদ ঘাটতি এখনো উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান।

এই অধ্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী উপস্থিতি ও কার্যকর শিখন সময়, শিখন ঘাটতির প্রকৃতি, শিক্ষণ-শিখনের সামগ্রিক অবস্থা, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, কোচিং ও গাইডবইয়ের প্রভাব, শিক্ষা পরিবেশ ও অবকাঠামো, সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য, মূল্যায়ন ব্যবস্থা (ধারাবাহিক, প্রান্তিক ও পাবলিক পরীক্ষা) এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে।

২.২ পর্যবেক্ষণ

শিখন ঘাটতির প্রকৃতি ও শিক্ষণ-শিখনের পরিস্থিতি

মৌলিক দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়- বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা, প্রয়োগমুখী সক্ষমতা এবং উচ্চ-ক্রমের জ্ঞানগত দক্ষতায় (higher order skills) দুর্বলতা দেখা যায়। ২০১৫ সালের LASI (Learning Assessment of Secondary Institution) অনুসারে ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণিত, বাংলা ও ইংরেজিতে দক্ষতা ব্যাপকভাবে নিম্ন স্তরে ছিল। কিন্তু তারপর মাধ্যমিক

স্তরে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এবং পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ নেই ।

পরামর্শক কমিটি দেশের ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়গুলো শহর ও গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি জলাবদ্ধ এলাকা, চর, হাওর, অতি দরিদ্র অঞ্চল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আবাসভূমি, শরণার্থী অধ্যুষিত এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চল এবং শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত। এই পরিদর্শনের অংশ হিসেবে মোট ১০টি বিদ্যালয়ের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ৪৩৭ জন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে মোট ৫০ নম্বরের একটি অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অভীক্ষাটিতে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে যথাক্রমে ১৫, ১৫ ও ২০ নম্বরের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল। অভীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় এই ফলাফল সারাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ করা যাবে না এবং এটি এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্যও নয়। অভীক্ষাটির মাধ্যমে পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান এবং তাদের শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শিখন অর্জনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে ধারণা পাওয়া যায়।

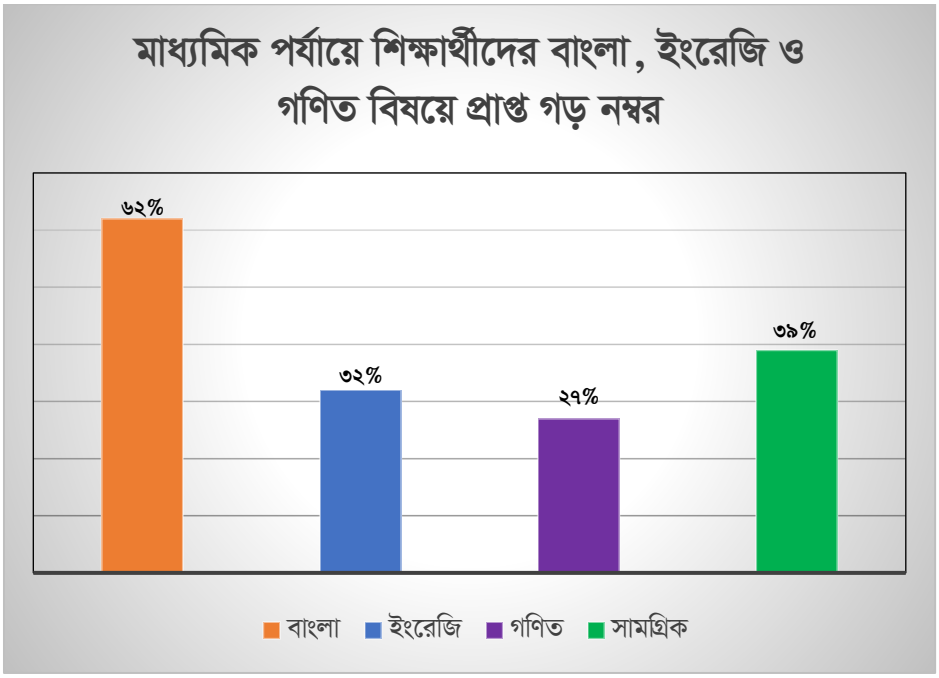

উল্লেখ্য অভীক্ষার প্রশ্নগুলো পাঠ্যবিষয়ে নির্ধারিত বিষয়বস্তু অনুসারে প্রণীত। প্রশ্নগুলো কঠিন মানে নয় বা উচ্চতর দক্ষতা (mastery) পরিমাপ করার জন্য করা হয়নি; প্রশ্নগুলো মূলত সহজ এবং মৌলিক বা ভিত্তিমূলক বিষয়গুলোকে যাচাই করার জন্য করা হয়েছে। প্রত্যাশিত ছিল এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থীরা গড়ে ৮০% বা তার চেয়ে বেশি নম্বর পাবে। কিন্তু বাংলা, ইংরেজি, গণিত এবং এই তিনটি বিষয় মিলিয়ে সামগ্রিক অর্জনের স্কোর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের গড় অর্জন তুলনামূলকভাবে কিছুটা গ্রহণযোগ্য হলেও ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের গড় স্কোর, অভীক্ষার মোট স্কোরের এক-

তৃতীয়াংশেরও কম। এই ফলাফল শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষাগত দক্ষতা এবং যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধানমূলক দক্ষতার ক্ষেত্রে চরম দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়। তিনটি বিষয় সমন্বিত সামগ্রিক অর্জনের স্কোর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বাংলা বিষয়ে তুলনামূলক ভালো শিখন অর্জন থাকা সত্ত্বেও ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা সামগ্রিক শিখন অর্জনের মানকে উল্লেখযোগ্যভাবে নিচের দিকে টেনে নিয়েছে।

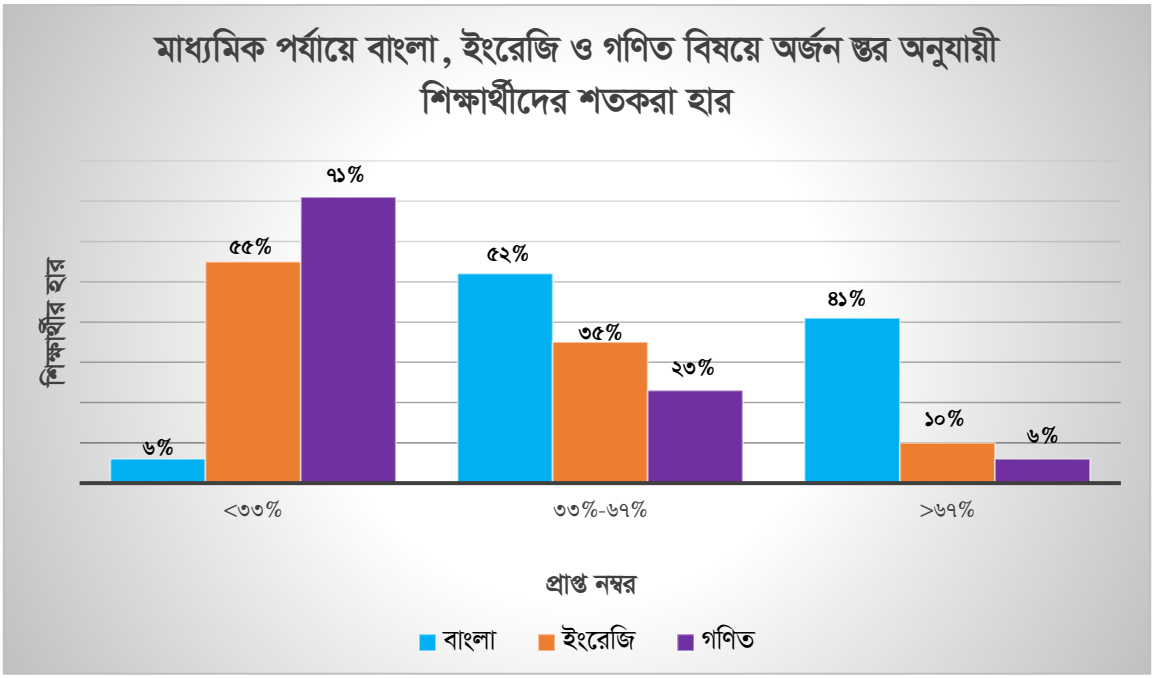

উপরের লেখচিত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে অর্জনের স্তরভিত্তিক বণ্টন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইংরেজিতে অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী (৫৫.৪%) এবং গণিতে সিংহভাগ শিক্ষার্থী (৭১.৪%) ৩৩ শতাংশের নিচে স্কোর অর্জন করেছে, যা এই দুই বিষয়ে ব্যাপক শিখন ঘাটতির নির্দেশক। বিশেষ করে গণিতে উচ্চ স্তরের শিক্ষার্থীর হার মাত্র ৫.৭%, যা শিক্ষার্থীদের গাণিতিক ও যৌক্তিক দক্ষতা বিকাশে বড় ধরনের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সামগ্রিকভাবে এই উপাত্তগুলো প্রমাণ করে যে, বাংলা বিষয়ে শিখন ফলাফল মোটামুটি হলেও ইংরেজি ও গণিতের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক দুর্বলতা রয়েছে।

২০২৫ সালে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট বা এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ৬৮%, অর্থাৎ প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী পাশ করতে পারেনি। উত্তীর্ণ হতে না পারা শিক্ষার্থী বেশিরভাগ ইংরেজি এবং গণিতে খারাপ করেছে।

প্রাথমিক স্তরে শিখনের ভিত্তি দুর্বল থাকার বিষয়টি মাধ্যমিক পর্যায়ে শিখন ঘাটতির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে প্রতীয়মান। এই প্রাথমিক দুর্বলতা মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যবস্তুর জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে আরও প্রকট হয়। ফলে শিক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলেও দক্ষতার ঘাটতি বহন করে এবং তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মৌলিক দক্ষতায় ঘাটতি থাকলে পরবর্তী স্তরে অগ্রগতি, কর্মদক্ষতা এবং যুক্তিভিত্তিক চিন্তার

বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। শ্রমবাজারে শিক্ষিত বেকার সংখ্যা ও সম্ভাব্য নিয়োগ দাতাদের অভিযোগে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

শিখন ঘাটতির এই চিত্র শিক্ষণ-শিখনের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শ্রেণিকক্ষে এখনও মুখস্থ-নির্ভর শিক্ষণ-শিখন, অধিক শিক্ষার্থীর শ্রেণি, অনুসন্ধান-ভিত্তিক শিখনের অভাব, সহায়ক শিক্ষাসামগ্রীর ঘাটতি এবং প্রযুক্তিগত বৈষম্য বিদ্যমান। এছাড়া শিক্ষকদের ওপর প্রশাসনিক দায়িত্ব, মূল্যায়ন-কাজ এবং পরীক্ষাকেন্দ্রিক চাপে গুণগত উন্নয়নের উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি শনাক্ত ও নিরসনে ধারাবাহিক সহায়তা যথাযথ কার্যকর হয় না। এভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের দুর্বল ভিত্তি থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে উত্তরণ শিক্ষণ ব্যবস্থায় স্থায়ী দুর্বলতা সৃষ্টি করছে; যে কারণে ভাষা, গণিত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার মৌলিক শক্তি বিকশিত হচ্ছে না।

সার্বিকভাবে, শিখন ঘাটতির এই অবস্থা কেবল শিক্ষণ-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা নয়; বরং এটি মানসম্মত শিক্ষার পূর্বশর্ত- দক্ষ শিক্ষক, উপযুক্ত শিক্ষাসামগ্রী, সহায়ক মূল্যায়ন কাঠামো এবং সমতাভিত্তিক শিখন সুযোগ- এসবের ঘাটতির সম্মিলিত ফল। নীতি, পরিকল্পনা ও সম্পদ বরাদ্দে শিখন ঘাটতি নিরসনকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং ভিত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়নে লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত রূপান্তর সম্ভব নয়।

শিক্ষার্থীর দক্ষতার স্তরভেদে নিরাময়মূলক পাঠদানে ব্যর্থতা

যে কোনো শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী মেধা ও দক্ষতায় একই স্তরে হতে পারে না। শিক্ষার্থীদের দক্ষতার স্তরভেদে পৃথক (differentiated) ও নিরাময়মূলক (remedial) পাঠদানের ব্যবস্থা এখনও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুপস্থিত। শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন দক্ষতার শিক্ষার্থী থাকা সত্ত্বেও পাঠদান প্রায় সম্পূর্ণরূপে একই গতি ও পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। ফলে দুর্বল শিক্ষার্থীরা মূল শিখন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (World Bank, 2023)।

বিদ্যমান ব্যবস্থায় দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণিকরণ এবং সে অনুযায়ী নিরাময়মূলক পাঠদান এখনও সীমিত আকারে ও প্রকল্প পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। তাও কার্যকরভাবে পরিচালিত হয় কিনা সন্দেহ আছে। জাতীয় পর্যায়ের তথ্য অনুযায়ী, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত সহায়ক বা নিরাময়মূলক পাঠদানের হার ২০ শতাংশেরও কম (BANBEIS, 2024)। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নিয়মিত শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের বাইরে শিক্ষক স্বল্পতা বা তাঁদের কাজের বোঝার কারণে নিরাময়মূলক পাঠদান সম্ভব হয় না।

বর্তমানে এমপিওভুক্ত স্কুলে ৫৫ জন শিক্ষার্থীর বেশি হলে নতুন শাখা খোলা যায়। কিন্তু আমরা দেখেছি অনেক স্কুলেই একই শ্রেণিকক্ষে শতাধিক শিক্ষার্থী। শিক্ষকের অভাবে শাখা খোলা যায় না এবং শাখার অনুমোদন শিক্ষাবোর্ডের সুপারিশে মন্ত্রণালয় থেকে নিতে হয়। তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষক দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন ও পাঠদানের বিষয়ে পর্যাপ্ত পেশাগত প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় তাঁরা গতানুগতিক পন্থার ওপর নির্ভরশীল।

কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে এই সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। দীর্ঘ বন্ধের ফলে সৃষ্ট শিখন-ঘাটতি পূরণে নিরাময়মূলক পাঠদানের প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে তা পদ্ধতিগতভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। সীমিত আকারে পরিচালিত নিরাময় ও পুনরুদ্ধারমূলক উদ্যোগগুলো প্রধানত স্বল্পমেয়াদি। পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর অভাবে এগুলো টেকসই প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি (World Bank, 2023)। কোভিডজনিত শিক্ষার ক্ষতি বিদ্যালয় শিক্ষায় যে আঘাত করেছে তা এখনো কাটিয়ে ওঠা যায়নি।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবিষয়জনিত সমস্যা

বিদ্যমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা শিক্ষণ-শিখনের গুণগত উন্নয়নে একটি বড় বাধা। পাঠ্যক্রম কি অনেক বিষয়ের ভারে ভারাক্রান্ত? মাধ্যমিক স্তরে প্রায় তেরোটি বিষয়ে পাঠদান হয়। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান ও বর্তমানে অতি প্রয়োজনীয় কম্পিউটার দক্ষতা কি অনেক বিষয়ের ভারে হারিয়ে যাচ্ছে? পাঠদানের সময়ে কি মৌলিক দক্ষতায় যথেষ্ট অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে? শিক্ষার্থী মূল্যায়নে কি সকল বিষয়কে একই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? এসব প্রশ্ন সঙ্গতভাবে সামনে আসছে।

বর্তমান কাঠামোয় সব শ্রেণিতে অধিক সংখ্যক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা শিক্ষার্থীদের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ে ভিত্তিমূলক ভাষা ও গণিত দক্ষতা দৃঢ় করার পরিবর্তে বহু বিশেষায়িত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকায় শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন ও মনোযোগ ব্যাহত হচ্ছে। এ পর্যায়ে কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য- এসব বিষয়ের পাঠ্যবইয়ে তাত্ত্বিক বর্ণনা বাধ্যতামূলক পাঠ্যবিষয় হিসেবে রাখা শিক্ষার অগ্রাধিকার নির্ধারণের পরিচায়ক নয়। এবং তা শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উপকারেও আসে না।

বিভিন্ন "কর্মমুখী" বা "জীবনমুখী" বিষয়ে পাঠদান শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে- এসব বিষয় শিক্ষাক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, উপযুক্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহের অভাবে এসব বিষয়ের শিক্ষণ-শিখন কার্যকর হয় না। বরং, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময়ের অপচয় হয় এবং বাংলা, ইংরেজি, গণিত ইত্যাদি মৌলিক দক্ষতার বিষয়গুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কৃষকের সন্তানরা পরিবার থেকেই কৃষির দক্ষতা

আয়ত্ত করতে পারে। বিদ্যালয় থেকে শেখার বিশেষ কিছু থাকে না। এসব বিষয়ে পাঠদান স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী "ঐচ্ছিক" হিসেবে থাকতে পারে।

ভাষা ও গাণিতিক দক্ষতায় ঘাটতি থেকে গেলে পরবর্তী স্তরের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি বা উচ্চতর বিষয়ভিত্তিক শিখন কার্যকরভাবে অর্জন করা সম্ভব হয় না– এটি বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়। এ প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা, যোগাযোগ দক্ষতা, গণিত ও বিজ্ঞান – এই ক্ষেত্রগুলোকে শিখনের ভিত্তি (foundational learning domains) হিসেবে অগ্রাধিকার প্রদান করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে) ভিত্তিমূলক দক্ষতা সুদৃঢ় করতে হলে সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই অবিভাজিত মূল শিক্ষাক্রম থাকা যুক্তিসঙ্গত। বৈশ্বিকভাবে ভাষা শিক্ষা (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি), গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মূল শিক্ষাক্রম হিসেবে স্বীকৃত।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে পাকিস্তান শাসনামলে শরিফ কমিশনের সুপারিশে মাধ্যমিক স্তর থেকে বৃত্তিগত প্রস্তুতিতে গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণি থেকে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার ভিন্ন ধারা যুক্ত করা হয়। তখন অল্প বয়সে পেশাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে প্রশ্নের উদ্রেক হয়। ২০০২ সালে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অবিভাজিত শিক্ষাক্রমের প্রস্তাব করা হয়। সন্তানের পেশাগত ভবিষ্যত নিয়ে অতি উদ্বিগ্ন মা-বাবার প্রতিবাদে তা স্থগিত করা হয়। ২০২২ সালে অবিভাজিত ধারা আবার চালু করা হয়। কিন্তু পূর্বতন সকল শিক্ষাক্রম সংস্কার বাতিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২৪ সালে বিভাজন পুনঃপ্রবর্তিত হয়। কমিটির বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। শিশুর বিশেষায়িত উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত জীবন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও সময় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মৌলিক দক্ষতার গুরুত্ব সকল শিশুর জন্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায়ও এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়।

সার্বিকভাবে, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবিষয়জনিত সমস্যা মাধ্যমিক শিক্ষার শিখনমানের একটি মৌলিক নির্ধারক। বিষয়ের অতিরিক্ত চাপ, মৌলিক দক্ষতা বহির্ভূত বিষয়ের বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তি এবং ভিত্তিমূলক শিখনের ওপর পর্যাপ্ত গুরুত্বের অভাব শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিক প্রস্তুতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের পাশাপাশি মাধ্যমিক স্তরে বিষয়সংখ্যা যৌক্তিকীকরণ এবং ভাষা-গণিতভিত্তিক শিখন শক্তিশালীকরণ একটি নীতিগত অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন: বিদ্যালয়ভিত্তিক ও পাবলিক পরীক্ষার সমন্বয়

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে বিদ্যমান মূল্যায়ন ব্যবস্থা এখনও মূলত প্রান্তিক ও পাবলিক পরীক্ষাকেন্দ্রিক, যেখানে মুখস্থনির্ভর প্রস্তুতি ও লিখিত পরীক্ষার ওপর অতি-নির্ভরতা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত দক্ষতা মূল্যায়নে বাধা সৃষ্টি

করছে। ফলে বিশ্লেষণী চিন্তা, সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ দক্ষতা ও প্রয়োগভিত্তিক শেখা ও উচ্চতর দক্ষতা যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয় না (MoE, 2023; World Bank, 2019)| মূল্যায়ন ব্যবস্থার আংশিক সংশোধনের পরিবর্তে একটি কাঠামোগত ও সমন্বিত সংস্কার প্রয়োজন, যেখানে বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং পাবলিক পরীক্ষার মধ্যে ভূমিকার বিভাজন ও সম্পর্ক স্পষ্ট করতে হবে।

কার্যকর শিখনের জন্য মূল্যায়ন কাঠামোতে বিদ্যালয়-ভিত্তিক মূল্যায়ন (School-Based Assessment - SBA) হবে ধারাবাহিক, গঠনমূলক ও শিখন-সহায়ক। শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, উপস্থাপনা, দলগত কার্যক্রম, ব্যবহারিক কাজ এবং নিয়মিত ক্লাস টেস্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শেখার অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করার ও তাকে সহায়তা করার সুযোগ দেবে এবং শিক্ষক সময়োপযোগী পরামর্শ (feedback) প্রদানে সক্ষম হবেন।

অন্যদিকে, পাবলিক পরীক্ষা হবে একটি প্রান্তিক মূল্যায়ন, যার পরিধি সীমিত ও লক্ষ্যভিত্তিক হবে। পাবলিক পরীক্ষা কেবল মূল (core) বিষয়সমূহের যেমন - বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ও যোগাযোগ, গণিত এবং বিজ্ঞানের হতে পারে। এসব পরীক্ষায় পাঠ্যবই নির্ভর প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক, প্রয়োগমুখী ও সমস্যা-সমাধানমূলক প্রশ্ন প্রাধান্য পাবে, যাতে শিক্ষার্থীর ভাষাগত প্রকাশ ও গাণিতিক যুক্তি ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য জ্ঞান মূল্যায়িত হয়। বিদ্যালয়ের মূল্যায়ন ও পাবলিক পরীক্ষার মূল্যায়নে মূল তফাৎ হতে পারে- প্রথমটিতে পাঠ্যবই ও পাঠ্যবিষয় থেকে শেখায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। দ্বিতীয়টিতে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করা হবে। বাংলা ও ইংরেজির জন্য দুটি করে আলাদা পত্রের ভিন্ন পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয়েও পাবলিক পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না, যা বিদ্যালয় পর্যায়ে মূল্যায়িত হবে। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষায় না রাখলেও চলবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির দক্ষতা শ্রেণিকক্ষে বা শিক্ষার্থীর নিজের কাজে চর্চার মাধ্যমে অর্জিত হবে। এজন্য পাবলিক পরীক্ষার প্রয়োজন নেই।

পাবলিক পরীক্ষার পর ধারাবাহিক ও প্রান্তিক পরীক্ষার ফল যোগ করে কি গ্রেড বা চূড়ান্ত ফল দেওয়া হবে? তা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই দুই ধরনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ভিন্ন এবং এতে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হতে পারে। স্কুল থেকে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর জন্য বার্ষিক রির্পোট কার্ড দেওয়া যেতে পারে এবং শিক্ষা বোর্ড থেকে পাবলিক পরীক্ষার ফল অনুযায়ী সনদ দেওয়া যেতে পারে।

প্রস্তাবিত মূল্যায়ন কাঠামোর একটি বড়ো সুফল হবে পরীক্ষাজনিত কারণে বিদ্যালয় বন্ধের সময় কমে আসা। যখন অনেক বিষয় বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় থাকবে এবং পাবলিক পরীক্ষা সীমিত বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীভূত হবে, তখন দীর্ঘ পরীক্ষাকাল ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার চাপ কমবে। ফলে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে না। সার্বিকভাবে, বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও

দক্ষতাভিত্তিক সীমিত পাবলিক পরীক্ষার এই সংস্কার শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে।

ইতোমধ্যে নিচের শ্রেণির অল্পবয়সী শিশুদের ওপর পাবলিক পরীক্ষার চাপ ও অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনা করে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু অষ্টম শ্রেণিতে ২০২৫ সালে বৃত্তি পরীক্ষা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। বৃত্তি পরীক্ষার দ্বারা বিদ্যালয়ের নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদের থেকে কিছু শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়। তাতে সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় এবং পিছিয়ে থাকা শিশুদের শিক্ষায় সহায়তার ক্ষেত্রে কোনো ফল দেখা যায় না। বরং বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের অধিকতর মনোযোগ থাকায় অন্য শিক্ষার্থীরা অবহেলিত হয়। মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা দেওয়া যদি বৃত্তির উদ্দেশ্য হয়, তবে অন্য উপায়ে স্থানীয় ও বিদ্যালয় পর্যায়ে তাদেরকে শনাক্ত করে এ অর্থ দেওয়া যেতে পারে। পরামর্শক কমিটি বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় বৃত্তি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষকদের ব্যস্ততা এবং বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পাঠদান ব্যাহত হওয়া প্রত্যক্ষ করেছে।

শিক্ষার্থী উপস্থিতি ও কার্যকর শিখন সময়

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ও কার্যকর শিখন সময় (effective learning time) বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। বিদ্যালয় প্রদত্ত তথ্য অনুসারে গড় উপস্থিতি ৭৫-৮০ শতাংশ হলেও কার্যকর উপস্থিতি নানা কারণে অনেক কম।

বর্তমান কাঠামোয় শ্রেণিকক্ষের জন্য ৪৫ মিনিট সময় নির্ধারিত থাকলেও বাস্তবে এই সময়ের পূর্ণ ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত হয় না। পরামর্শক কমিটির বিদ্যালয় পরিদর্শনে দেখা গেছে যাতায়াত সমস্যা ও আবহাওয়া বা দুর্যোগজনিত কারণে বহু এলাকায় শিক্ষার্থীরা সময়মতো বা পূর্ণসময় শ্রেণিকক্ষে থাকে না।

শিক্ষকদের মতে প্রতিদিন প্রতি বিষয়ের জন্য ৪৫ মিনিটের পাঠ সময়ের যান্ত্রিক রুটিনে পরিবর্তন দরকার। কোনো পাঠের বিষয় উপস্থাপন করে আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তরের সময় নিয়ে ব্যক্তি বা দলীয় অনুশীলন করে একটি পাঠ সম্পূর্ণ করা যায় না। বড় শ্রেণিকক্ষে এই সমস্যা তীব্রতর। আসলে ৪৫ মিনিট সময়ও পাওয়া যায় না, কারণ ক্লাস শেষ হওয়ার পর আরেক ক্লাসের শুরু হতে সময় ব্যয় হয়। সমস্যার সমাধান হতে পারে সপ্তাহের মোট পাঠের সময় ঠিক রেখে মূল পাঠ্য বিষয়গুলোর দীর্ঘতর পিরিয়ড নির্ধারণ করা। এই সিদ্ধান্ত বিদ্যালয় পর্যায়ে নেওয়া যেতে পারে।

ভৌগোলিক চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা এবং পার্বত্য অঞ্চলের বহু বিদ্যালয় মৌসুমি বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলাবদ্ধতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকে, যা শিক্ষার্থীদের শিখন ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। একটি নমনীয় শিক্ষা ক্যালেন্ডার (flexible school calendar) প্রণয়ন প্রাসঙ্গিক, যেখানে

স্থানীয় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ক্লাস সময় পুনর্বিন্যাস, দৈনিক শিক্ষণ-শিখন সময় সামঞ্জস্যকরণ এবং মৌসুমি বাস্তবতা বিবেচনায় সময়সূচি নির্ধারণের সুযোগ থাকবে।

বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের মতো মৌলিক দক্ষতাভিত্তিক বিষয়ের জন্য তুলনামূলক বেশি সময় বরাদ্দ শিক্ষার্থীদের ভাষা, গাণিতিক যুক্তি ও বিশ্লেষণী চিন্তা সুসংহত করতে সহায়ক হতে পারে। এই ধরনের সময় পুনর্বিন্যাস কেবল সময়ের পরিমাণ বৃদ্ধি নয়, বরং পাঠ্যক্রম অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং কার্যকর শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির সঙ্গে সময় ব্যবস্থাপনার সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের বার্ষিক শিক্ষাপঞ্জি পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বিদ্যালয়ের বর্তমান বার্ষিক শিক্ষাপঞ্জি যথার্থ কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। ঔপনিবেশিক সময় থেকে খৃষ্টীয়পঞ্জি অনুসারে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর শিক্ষাবর্ষ হিসেবে চলে আসছে। তা আমাদের উচ্চ শিক্ষাপঞ্জির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বর্তমান বিদ্যালয় বর্ষে বছরের সবচেয়ে ভালো আবহাওয়ার সময় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পড়ালেখার কাজে লাগানো হয় না। শ্রেণিকক্ষে পড়ালেখার পরিবর্তে এসময় চলে বার্ষিক পরীক্ষা, নতুন বছরের সূচনা, বর্ষশেষ ও শুরুর বিভিন্ন কার্যকলাপ। অন্যান্য অনেক দেশের মতো সেপ্টেম্বর থেকে জুন বা কাছাকাছি সময়ে শিক্ষাবর্ষ হতে পারে এবং প্রধানত জুলাই-আগস্ট বার্ষিক গ্রীষ্মের ছুটি হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে বছরের পূর্ণ ছুটির তালিকাও পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন এবং অঞ্চলভেদে বিশেষ ভৌগলিক পরিবেশ বিবেচনায় যথার্থ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকতে হবে।

শিক্ষাসামগ্রী, পাঠ্যপুস্তক ও উপকরণ

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাসামগ্রী, পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক উপকরণের প্রাপ্যতা শিক্ষণ-শিখনের গুণগত মান নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। জাতীয় পর্যায়ে প্রতি বছর শতভাগ শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। তবে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রয়োজনীয় সহায়ক শিক্ষাসামগ্রী, ব্যবহারিক উপকরণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর বিষয়বস্তুর প্রাপ্যতা এখনও ব্যাপকভাবে অসম ও অপ্রতুল।

প্রশাসনিক ও জরিপভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, দেশের মাত্র ৩০-৪০% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কার্যকর লাইব্রেরি ও বিজ্ঞান ল্যাব বিদ্যমান, এবং এসবের গুণগত মানও বিদ্যালয়ভেদে ভিন্ন (BANBEIS, 2022; World Bank, 2023)| গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে এই ঘাটতি তুলনামূলকভাবে বেশি, ফলে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা, পরীক্ষণভিত্তিক অনুসন্ধান এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরের পাঠের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিজ্ঞান, গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ল্যাব সুবিধা ও সরঞ্জামের অভাব শিক্ষার্থীদের ধারণাগত বিকাশ (conceptual understanding) ও দক্ষতা অর্জনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সম্প্রসারণে সম্প্রতি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এর বাস্তবায়নে স্পষ্ট শহর-গ্রাম বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। BANBEIS-এর তথ্য অনুযায়ী, শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ইন্টারনেট সংযোগের হার গ্রামীণ বিদ্যালয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। অনেক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট সংযোগ এবং শিক্ষক দক্ষতার সীমাবদ্ধতার কারণে বিদ্যমান ডিজিটাল উপকরণ কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না (BANBEIS, 2024; World Bank, 2020)। সহায়ক শিক্ষাসামগ্রী ও ব্যবহারিক উপকরণের অপ্রতুলতা শিক্ষকদের শিক্ষণ কৌশলকেও প্রভাবিত করছে। প্রয়োজনীয় চার্ট, মডেল, অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক উপকরণ না থাকায় অনেক শিক্ষক পাঠ্যবই নির্ভর ও বক্তৃতাভিত্তিক পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ থাকছেন (Sabarwal et al., 2021)। ফলে পাঠ্যক্রমে উল্লেখিত দক্ষতাভিত্তিক ও অনুসন্ধানমূলক শিক্ষণ বাস্তবে প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

সার্বিকভাবে, পাঠ্যপুস্তক বিতরণে সাফল্য সত্ত্বেও সহায়ক শিক্ষাসামগ্রী, লাইব্রেরি, ল্যাব ও ডিজিটাল উপকরণের ঘাটতি মাধ্যমিক শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত বৈষম্য সৃষ্টি করছে। এই বৈষম্য শিক্ষার্থীদের শেখার সুযোগ, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও কর্মজীবনের প্রস্তুতিকে সীমিত করছে। শিক্ষাসামগ্রী ও উপকরণ ব্যবস্থাপনায় সমতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত না করা হলে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নকে টেকসই করা কঠিন হবে।

কোচিং ও গাইডবইয়ের প্রভাব

বর্তমান পরীক্ষাব্যবস্থা মূলত পাঠ্যবই-নির্ভর ও পূর্বানুমানযোগ্য প্রশ্নধারার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। তাই শিক্ষার্থীরা ধারণাগত বিকাশ বা দক্ষতাভিত্তিক শেখার পরিবর্তে সম্ভাব্য প্রশ্ন, সাজেশন ও গাইডবইকেন্দ্রিক প্রস্তুতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে বিদ্যালয়ভিত্তিক নিয়মিত শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের কাছে পর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয় না। তারা অতিরিক্ত কোচিং সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির এই মুখস্থ নির্ভর কাঠামো শিক্ষাকে সংকীর্ণভাবে "উত্তর প্রস্তুতকরণ" প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ করে। দক্ষতাভিত্তিক শিখন যেমন– পাঠ্যবিষয় বোঝা, বিশ্লেষণ, সমস্যা সমাধান, প্রয়োগধর্মী চিন্তা ও সৃজনশীলতা- এসবের পরিমাপের পরিবর্তে তথ্য পুনরুৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় বলে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই গাইডবই ও কোচিংয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

পরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন দক্ষতাভিত্তিক, প্রেক্ষিতভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হলে গাইডবই নির্ভরতা ও সম্ভাব্য প্রশ্নমুখী কোচিংয়ের প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস পাবে। উন্মুক্ত-উত্তরভিত্তিক, প্রয়োগমূলক ও সমস্যা-সমাধানধর্মী মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর প্রকৃত শেখাকে অগ্রাধিকার দিতে সহায়ক হবে।

বিকল্প হিসেবে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় সহায়ক পাঠদান (school-based academic support) চালু করা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সহায়ক ক্লাস পরিচালিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জন্য ভাতা বা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। এতে কোচিং কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতরে আনা সম্ভব হবে এবং গুণগত মান ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সহজ হবে।

শিক্ষার্থীদের ওপর গাইডবই বা বাণিজ্যিক সহায়ক বই ক্রয়ের চাপ সৃষ্টি করা শিক্ষার সমতা ও ন্যায্যতার পরিপন্থী। বিদ্যালয় পর্যায়ে স্পষ্ট নির্দেশনা ও নজরদারির মাধ্যমে নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে পাঠ্যপুস্তক ও অনুমোদিত শিক্ষাসামগ্রীই শিক্ষণ-শিখনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং কোনো শিক্ষার্থী বা অভিভাবককে গাইডবই ক্রয়ে বাধ্য করা হবে না। দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন, গুণগত শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষণ এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক সহায়ক ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগ ছাড়া এই প্রবণতা টেকসইভাবে হ্রাস করা কঠিন।

শিক্ষার পরিবেশ ও অবকাঠামো

বিভিন্ন প্রকল্পে অবকাঠামোতে বিনিয়োগ সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। পরিসংখ্যান ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, দেশের বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, নিরাপদ ভবন, পৃথক ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, নিরাপদ পানীয় জল, বিদ্যুৎ এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামোর ঘাটতি বিদ্যমান। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে এখনও প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা মানসম্মত পর্যায়ে পৌঁছায়নি, বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে (BANBEIS, 2024)।

গ্রামীণ ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত অনেক বিদ্যালয়ে পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিশেষত বর্ষাকাল, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বিদ্যালয় ভবনের ক্ষতি শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে নিয়মিতভাবে ব্যাহত করে।

স্যানিটেশন ও পানীয় জলের অপর্যাপ্ততা মেয়েদের শিক্ষায় একটি বড় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত। পৃথক ও ব্যবহারযোগ্য টয়লেটের অভাব, মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা এবং নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে অনেক কিশোরী শিক্ষার্থী অনিয়মিত হয়ে পড়ে বা বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পর্যাপ্ত স্যানিটেশন

ও স্বাস্থ্যসম্মত সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে মেয়েদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় (UNICEF, 2021)।

এছাড়া বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প, হ্যান্ডরেল, উপযোগী টয়লেট ও সহায়ক অবকাঠামোর অভাব তাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও সক্রিয় অংশগ্রহণকে সীমিত করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নীতিতে এসব সুবিধার গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও বাস্তবায়নে ঘাটতি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় (MoE, 2020)।

বিদ্যালয় অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়ন ও কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় কমিউনিটির সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায় থেকেই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC), অভিভাবক প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা হলে অবকাঠামো নির্মাণ বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং ব্যবহার-পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাও শক্তিশালী হবে।

বিদ্যালয় অবকাঠামো নির্মাণে মানহীন কাজ, বিলম্ব এবং ব্যয়ের অস্বচ্ছতা-সংক্রান্ত অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এ প্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা, সামাজিক জবাবদিহিতা এবং কমিউনিটি মনিটরিং ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা নির্মাণকাজের তদারকি, উপকরণ ব্যবহারের মান যাচাই এবং রক্ষণাবেক্ষণ দুর্নীতির ঝুঁকি হ্রাস এবং সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়ক হতে পারে (Transparency International Bangladesh, 2019)। বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়নকে কেবল নির্মাণকেন্দ্রিক কার্যক্রম হিসেবে নয়, বরং পরিকল্পনা-নির্মাণ-ব্যবহার-রক্ষণাবেক্ষণ–এই সমন্বিত চক্র হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন, যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায় একটি সক্রিয় অংশীদার।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের নৈতিক বোধ, সামাজিক-আবেগিক বিকাশ, দলগত কাজের সক্ষমতা এবং বাস্তবভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিতর্ক, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, খেলাধুলা, স্কাউটিং, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ, পরিবেশ ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব ও সাহিত্যচর্চার মতো উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গঠনে সহায়ক। একইসঙ্গে এসব কার্যক্রম সামাজিক-আবেগিক শিখন (social and emotional learning) ত্বরান্বিত করে। এসব আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহযোগিতা, দ্বন্দ্ব-সমাধান এবং ইতিবাচক আত্মপরিচয় গঠনে ভূমিকা রাখে (Darling-Hammond et al., 2020)।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম দ্বারা প্রকল্পভিত্তিক শিখনের (project-based learning) সুযোগ তৈরি হতে পারে। যেমন- বিজ্ঞান মেলা, কমিউনিটি সমস্যা নির্ধারণ ও সমাধানভিত্তিক প্রকল্প, স্থানীয় ইতিহাস বা পরিবেশবিষয়ক অনুসন্ধান, স্কুল গার্ডেনিং, স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব

প্রেক্ষাপটে জ্ঞান প্রয়োগ, সমন্বিত উদ্যোগ ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এই ধরনের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা এবং সহযোগিতামূলক নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে, যা ভবিষ্যৎ কর্মজীবন ও নাগরিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার ভিত্তি গড়ে তোলে (Darling-Hammond et al., 2020)। এসব কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বিদ্যালয় পর্যায়ে মূল্যায়নে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বার্ষিক রিপোর্ট কার্ডে এই মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ হবে।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম এখনও নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে পরিচালিত হয় না। বিভিন্ন প্রশাসনিক ও গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের একটি সীমিত সংখ্যক বিদ্যালয়ে এসব কার্যক্রম সক্রিয় রয়েছে। সেগুলোর বড় অংশই পরীক্ষাকেন্দ্রিক পাঠদানের চাপ, প্রশিক্ষিত শিক্ষক স্বল্পতা ও পর্যাপ্ত সম্পদের অভাবে সীমিত আকারে পরিচালিত হয় (BANBEIS, 2024; World Bank, 2023)। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা, ক্লাবভিত্তিক নেতৃত্ব বিকাশ বা সামাজিক সেবা কার্যক্রমের সুযোগ সীমিত, ফলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট এনজিও বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গ্রাম এলাকার শতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ভাব (Volunteers Assosiaton for Bangladesh)- এর সহযোগিতায় দৈনন্দিন পাঠদানের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের উদ্যোগ। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছ থেকে এই কার্যক্রমে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেছে (ভাব, ২০২২)।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমকে পাঠ্যক্রমের পরিপূরক নয়, বরং শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান প্রয়োজন। বার্ষিক বিদ্যালয় পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্লাব ও কার্যক্রম পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং প্রকল্পভিত্তিক ও সামাজিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রমকে মূল্যায়নের সঙ্গে আংশিকভাবে যুক্ত করা গেলে শিক্ষার্থীদের নৈতিক, সামাজিক-আবেগিক ও ব্যবহারিক দক্ষতার বিকাশ আরও সুসংহত করা সম্ভব হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য

কঠোর পরীক্ষানির্ভরতা, ফলাফলের অতিরিক্ত চাপ এবং প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার পরিবেশ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যে ক্রমবর্ধমান নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নিয়মিত মূল্যায়নের পরিবর্তে উচ্চঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষার (high-stake examinations) ওপর নির্ভরতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ, মানসিক চাপ ও আত্মবিশ্বাসহীনতা সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক চাপ কিশোর বয়সী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, স্মৃতি ও শেখার আগ্রহকে দুর্বল করে দেয় এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার ঝুঁকি বাড়ায় (OECD, 2017; WHO, 2021)।

বাংলাদেশে এই পরিস্থিতি জটিল, কারণ বিদ্যালয়ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা ও কাউন্সেলিং ব্যবস্থা অনুপস্থিত। প্রায় কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই প্রশিক্ষিত কাউন্সেলর নেই এবং শিক্ষকদেরও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সীমিত (BRAC, 2018; UNICEF, 2022)। প্রাথমিকভাবে সব বিদ্যালয়ে পৃথক কাউন্সেলর নিয়োগ সম্ভব না হলেও অন্তত উপজেলা পর্যায়ে পেশাদার কাউন্সেলর নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়সমূহকে সহায়তা দেওয়ার একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। তাছাড়া পেশাদার কাউন্সেলর নিয়োগের পাশাপাশি প্যারা-কাউন্সেলর তৈরি করে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মনোসামাজিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অধিকন্তু, শিক্ষক প্রশিক্ষণে মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাধ্যমিক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও এর প্রাপ্যতা, ব্যবহারিক দক্ষতা ও কনটেন্টের গুণগত মানে স্পষ্ট বৈষম্য বিদ্যমান। প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৫০% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোনো না কোনো ধরনের আইসিটি সুবিধা (যেমন- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, কম্পিউটার বা প্রজেক্টর) থাকলেও এসব সুবিধার নিয়মিত ও কার্যকর ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত (BANBEIS, 2024)। বিশেষ করে গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগের দুর্বলতা, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং উপকরণাদির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার অভাব প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষণ-শিখনকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এছাড়া শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে ডিজিটাল শিক্ষণ-শিখন ও কনটেন্ট ব্যবহারের দক্ষতা সীমিত, ফলে বিদ্যমান প্রযুক্তি প্রধানত উপস্থাপনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয় এবং শিখনকে অর্থবহ ও অংশগ্রহণমূলক করার সম্ভাবনা কাজে লাগানো যায় না (World Bank, 2020)। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে অনলাইন ও ব্লেন্ডেড লার্নিংয়ের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হলেও মানসম্মত ডিজিটাল কনটেন্টের ঘাটতি এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক সমন্বিত নির্দেশনা ও সক্ষমতার অভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন ধরনের ডিজিটাল বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ইঙ্গিত করে যে, অবকাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রাসঙ্গিক কনটেন্ট এবং নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত না হলে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার মান উন্নয়নের পরিবর্তে বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও গভীর করতে পারে (OECD, 2021)। মাধ্যমিক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকর সংযোজনের জন্য একটি সমন্বিত ও বৈষম্য-সচেতন কৌশল গ্রহণ জরুরি।

২.৩ সুপারিশমালা

আশু সুপারিশ

১. **বিদ্যালয়ভিত্তিক দক্ষতা-স্তর নির্ধারণ ও নিরাময় সেশন চালু:** শিখন ঘাটতি পূরণে প্রতি শিক্ষার্থীর চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা-স্তর যাচাইয়ের জন্য সহজ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা স্তর নির্ধারণ করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান দক্ষতা দল অনুযায়ী করা প্রয়োজন। এজন্য দক্ষতা যাচাই পদ্ধতি এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষণ-শিখনের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা ও সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় নিরাময়মূলক শিক্ষা নিয়মিত শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রমের অংশ বিবেচনা করতে হবে।

২. **পাঠ্যবিষয় পর্যালোচনা ও ভিত্তিমূলক ক্ষেত্র অগ্রাধিকার নির্ধারণ:** নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বর্তমান পাঠ্যবিষয়সমূহের পর্যালোচনা করে ভাষা (বাংলা ও ইংরেজি), গণিত এবং বিজ্ঞানকে ভিত্তিমূলক দক্ষতা হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রযুক্তি ও কম্পিউটার দক্ষতা তৈরির উপায় হবে শ্রেণিকক্ষে এবং শিক্ষার্থীদের নিজের কাজে কম্পিউটার ব্যবহারের ও চর্চার সুযোগ করে দেওয়া। অন্যান্য বিষয়সমূহকে বাধ্যতামূলক মূল সিলেবাসের পরিবর্তে ঐচ্ছিক বা সহশিক্ষা কার্যক্রমভিত্তিক মডিউলে রূপান্তরিত হতে পারে। এভাবে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক চাপ হ্রাস করা সম্ভব হবে এবং ভিত্তিমূলক দক্ষতায় সময় বৃদ্ধি পাবে।

৩. **দশম শ্রেণি পর্যন্ত অবিভাজিত শিক্ষাক্রম:** নবম শ্রেণি থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বিভিন্ন ধারায় (বিজ্ঞান-মানবিক-ব্যবসায় শিক্ষায়) বিভাজিত করার সিদ্ধান্ত সুবিবেচিত হয়নি। এই বিভাজন একাদশ শ্রেণি থেকে হওয়া বাঞ্চনীয়।

৪. **বিদ্যালয়ভিত্তিক সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের গুরুত্ব:** মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময় নির্ধারণ করতে হবে। যেমন বিতর্ক, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ক্লাবভিত্তিক উদ্যোগ ও সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হতে পারে। এ জন্য শিক্ষকের দায়িত্ব বন্টনে এবং বিদ্যালয়ের বাজেটে অর্থ সংস্থান রাখতে হবে।

৫. **বিদ্যালয়ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সহায়তা:** বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে, যাতে তারা শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও শিখনজনিত মানসিক সমস্যার প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করতে পারেন। পাশাপাশি, মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়মিত আলোচনা ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা যেতে পারে।

মধ্যমেয়াদি সুপারিশ

৬. **বিদ্যালয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ:** বিদ্যালয়ে প্রযুক্তি সুবিধা (ইন্টারনেট সংযোগ এবং কম্পিউটার, প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ইত্যাদি) কার্যকর ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের জন্য তথ্য প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার দ্বারা শিক্ষণ-শিখন ফলপ্রসূ করার জন্য প্রশিক্ষণ আরও কার্যকর করতে হবে। প্রযুক্তি শুধু প্রদর্শন বা উপস্থাপন নয়, তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য অংশগ্রহণমূলক ও শিক্ষণ-সহায়ক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করতে হবে।

৭. **পাঠ্যক্রম, শিক্ষণপদ্ধতি ও দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়নে গুরুত্ব:** পাঠ্যক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণপদ্ধতিতে ভাষা, গণিত ও বিজ্ঞানের দক্ষতায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। অনুসন্ধানভিত্তিক, প্রয়োগমুখী ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ কৌশল সম্প্রসারণের পাশাপাশি ধারাবাহিক ও গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ শ্রেণিকক্ষে দৈনন্দিন কাজে পরিণত হতে হবে। শিক্ষকের প্রশিক্ষণে শিখন ঘাটতি নিরসনে কৌশল বাধ্যতামূলক উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮. **চাহিদাভিত্তিক পাঠদান (Differentiated Instruction):** শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাঠামোতে দক্ষতাভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা, দলভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং ধারাবাহিক শিখন মূল্যায়ন কৌশলকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক একাডেমিক সুপারভিশন ও ক্লাসরুম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চাহিদাভিত্তিক পাঠদান ও ফিডব্যাক নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নিরাময়মূলক সহায়তা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার নিয়মিত চর্চায় পরিণত হয়।

৯. **পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইতে দক্ষতা স্তরভিত্তিক শিখন নির্ধারণে গুরুত্ব:** পাঠ্যক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিষয়সংখ্যা যৌক্তিকীকরণ, শিখনস্তর উপযোগী বিষয়বস্তু বিন্যাস এবং মৌলিক দক্ষতাকেন্দ্রিক শিখনফল নির্ধারণ করতে হবে। পাঠ্যবই ও শিক্ষক নির্দেশিকায় অনুসন্ধানভিত্তিক, প্রয়োগধর্মী ও জীবনঘনিষ্ঠ কার্যক্রম সংযোজনের মাধ্যমে গভীর শিখন ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা বিকাশে গুরুত্ব দিতে হবে। যাতে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই ও শ্রেণিকক্ষ চর্চায় একযোগে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

১০. **সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম ও মূল্যায়ন:** সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমকে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি স্বীকৃত উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেখানে ক্লাব, প্রকল্পভিত্তিক কাজ ও সামাজিক সেবাজনিত কাজকে গুরুত্ব দিতে হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, দলগত কাজ, নেতৃত্ব ও সমস্যা সমাধান দক্ষতার বিকাশকে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশহিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

১১. **উপজেলা পর্যায়ে কাউন্সেলিং নেটওয়ার্ক:** প্রতি উপজেলায় পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলর এবং প্যারা-কাউন্সেলর নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং সেবা চালু করতে হবে।

বিদ্যালয়সমূহকে উপজেলাকেন্দ্রিক এই কাউন্সেলরদের সঙ্গে যুক্ত করে পরামর্শ, রেফারেল ও মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করা দরকার। এতে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ ও উদ্বেগের প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং সঠিক সমাধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এই বিষয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতামূলক উদ্যোগ নিতে হবে।

১২. **পাবলিক পরীক্ষা ও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন:** পাবলিক পরীক্ষা মূল দক্ষতার বিষয়সমূহে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ পাঠ ও বিজ্ঞানে) সীমিত থাকবে। এসব বিষয়ে প্রশ্ন দক্ষতাভিত্তিক ও প্রয়োগমুখী হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কম্পিউটার দক্ষতা অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু এজন্য পরীক্ষার চেয়ে চর্চা ও অভিজ্ঞতার সুযোগ বেশি প্রয়োজন। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন ও পাবলিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও ভূমিকা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রধানত হবে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক, অন্যদিকে পাবলিক পরীক্ষা হবে মূলত শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য। বিদ্যালয় মূল্যায়ন অনুসারে বার্ষিক রিপোর্ট কার্ড দেওয়া যেতে পারে। এতে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বিষয়ে অংশগ্রহণের মূল্যায়ন প্রতিফলিত হবে। পাবলিক পরীক্ষার ফল অনুযায়ী আলাদা বিষয়ভিত্তিক গ্রেডিং দেওয়া যাবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন ও পাবলিক পরীক্ষার মূল্যায়নের সংখ্যাগত মিশ্রণ সঙ্গত নয়। এভাবে পাবলিক পরীক্ষার সময় সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ওপর অতিরিক্ত চাপ এবং বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া কমানো যেতে পারে। তাছাড়া বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নে আরও মনোযোগ ও গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হবে।

১৩. **অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা ও বৃত্তি পরীক্ষা অপ্রয়োজনীয়:** অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত বহাল থাকা উচিত এবং জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা পুনপ্রবর্তনের প্রয়োজন নেই।

১৪. **মানসম্মত ডিজিটাল কনটেন্ট ও ব্লেন্ডেড লার্নিং:** উপযুক্ত কনটেন্ট ও মানসম্মত ডিজিটাল শিক্ষণ সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে স্কুলভিত্তিক ব্লেন্ডেড লার্নিং (শ্রেণিকক্ষে পাঠদান এবং অনলাইন শিখনের মিশ্রণ) সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ এবং এসবের রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে তথ্য প্রযুক্তি-নির্ভর শিখন বিষয় ও সামগ্রীর প্রাপ্যতা আছে। এগুলোকে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের কাছে সহজলভ্য করতে হবে। এজন্য শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫. **নমনীয় বিদ্যালয় ও বার্ষিক শিক্ষাপঞ্জি:** বিদ্যালয়ের শিক্ষায় সময়ের যথার্থ ব্যবহারের জন্য বার্ষিক শিক্ষাপঞ্জি পুনর্বিবেচিত হওয়া দরকার। বাংলাদেশের জলবায়ুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেপ্টেম্বর থেকে জুন বা কাছাকাছি সময়ে শিক্ষাবর্ষ নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং প্রধানত জুলাই-আগস্ট মাসে বার্ষিক গ্রীষ্মের ছুটি হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে বছরের পূর্ণ ছুটির তালিকাও পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন এবং অঞ্চলভেদে বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ বিবেচনায় যথার্থ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকতে হবে।

১৬. **শিক্ষাক্রম উন্নয়ন:** শিক্ষাক্রম পরিবর্তন আকস্মিক, এডহক, রাজনৈতিক প্রভাবদুষ্ট হওয়া সঙ্গত নয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পরিমার্জন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া হবে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং মূল্যায়নে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রন ও বিতরণের দায়িত্ব স্বতন্ত্র সংস্থার কাছে ন্যাস্ত হওয়া প্রয়োজন।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১৭. **সামগ্রিক বিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়ন:** মধ্যমেয়াদি সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে শিখন ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নীতি, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কাঠামোর সমন্বয় জোরদার করতে হবে যাতে পরবর্তী স্তরের শিক্ষা বাধাগ্রস্ত না হয়। জাতীয় পর্যায়ে ভিত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনকে শিক্ষার গুণগত মানের প্রধান সূচক হিসেবে গ্রহণ করে সম্পদ বরাদ্দ, শিক্ষক উন্নয়ন, শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ এবং শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে একীভূত কাঠামোর আওতায় আনতে হবে।

২.৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব

সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি ধাপভিত্তিক ও সমন্বিত বাস্তবায়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেখানে আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপসমূহের মধ্যে নীতিগত ও কার্যক্রমভিত্তিক সংযোগ নিশ্চিত থাকবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যকর শিখনসময় (ELT) মনিটরিং, দক্ষতা-স্তর নির্ধারণ, নিরাময় সেশন এবং SBA বাস্তবায়নের মতো স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপসমূহের জন্য স্পষ্ট দায়িত্ব বণ্টন ও সময়সীমা নির্ধারণ করে নির্দেশিকা জারি করা প্রয়োজন, যাতে বিদ্যালয় পর্যায়ে তা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা যায়।

মধ্যমেয়াদি পর্যায়ে পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কাঠামোর পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বিত টাস্কফোর্স গঠন করা প্রয়োজন, যেখানে পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, মূল্যায়ন সংস্থা এবং বিদ্যালয় প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

তথ্যসূত্র

BANBEIS. (2022). *Bangladesh education statistics 2022*. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics.

BANBEIS. (2024). *Bangladesh education statistics 2023.* Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics.

BRAC. (2018). *Assessment of student learning outcomes and stress factors*. BRAC Education Programme.

Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science, 24*(2), 97–140. https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791

Education Sector Plan 2020–2025. (2020). *Bangladesh Education Sector Plan 2020–2025 (endorsed)*. Global Partnership for Education & Government of Bangladesh.

Ministry of Education (MoE). (2020). *Inclusive education policy framework*. Government of Bangladesh.

Ministry of Education (MoE). (2023). *National curriculum framework 2023*. Government of Bangladesh.

Monitoring and Evaluation Wing (2015). *Learning Assessment of Secondary Institution*. Directorate of Secondary and Higher Education, Bangladesh. Ministry of Education.

OECD. (2017). *Education at a Glance*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD. (2021). *Education reports and global comparative data*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Sabarwal, S., Abu-Jawdeh, N. X., & Kapoor, R. (2021). Teacher beliefs: Why they matter and what they are. *The World Bank Research Observer*, *37*(1), 73–106. https://doi.org/10.1093/wbro/lkab008

Transparency International Bangladesh. (2019). *Education sector governance challenges in Bangladesh*. TIB.

UNICEF. (2021). *The state of the world's children 2021: On my mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health*. UNICEF.

UNICEF. (2021). *WASH in Schools: Monitoring package*. UNICEF.

UNICEF. (2022). *The state of the world's children 2021: On my mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health*. UNICEF.

World Bank. (2019). *Bangladesh education sector review: Seeding fertile ground—Education that works for Bangladesh*. World Bank Group.

World Bank. (2020). *Improving school infrastructure for better learning outcomes*. World Bank.

World Bank. (2023). *Learning Acceleration in Secondary Education Operation supports Bangladesh's Secondary Education Programme*. World Bank.

World Health Organization (WHO). (2021). *Guidelines on child development and learning environments*. World Health Organization.

ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ - ভাব (২০২২), *গ্রামীণ বাংলাদেশের মানসম্মত শিক্ষা: কল্পনা থেকে বাস্তবে রূপান্তর*। একুশ প্রিন্টার্স।

অধ্যায়

৩

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী

প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী হবেন শিক্ষার্থী ও সমাজের কাছে দায়বদ্ধ - সুপ্রতিষ্ঠিত হবে শিক্ষকের উচ্চ মর্যাদা।

৩.১ প্রেক্ষাপট

শিক্ষাব্যবস্থাকে মানব দেহের সাথে তুলনা করলে প্রাথমিক শিক্ষাকে পদযুগল, মাধ্যমিক শিক্ষাকে মেরুদন্ড এবং উচ্চ শিক্ষাকে মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে। একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের জন্য মধ্যম শ্রেণির জনশক্তিকে গড়ে তোলার কাজ করে মাধ্যমিক শিক্ষা (জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন: ২০০৩, পৃ: ৬৮)। বর্তমানে বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষা ধারায় সাত বছর মেয়াদি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। এ শিক্ষা তিনটি স্তরে বিভক্ত। সে স্তরগুলো নিম্ন মাধ্যমিক স্তর: ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি (তিন বছর), মাধ্যমিক স্তর: নবম-দশম শ্রেণি (দুই বছর) ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর: একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (দুই বছর)। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরটি ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তিনবছর মেয়াদি। এটি মাধ্যমিক শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রধানত বেসরকারি ব্যবস্থানায় পরিচালিত। ব্রিটিশ আমল থেকে বেসরকারি প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমলেও তা অব্যাহত থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশেও উন্নতির ধারা ও চ্যালেঞ্জের মিশ্রণ দেখা যাচ্ছে যেখানে ভর্তির হার বাড়লেও মানসম্মত শিক্ষা, ঝরে পড়া, অবকাঠামোর অভাব, ধারাবাহিক পর্যালোচনা না হওয়া ও বিচ্ছিন্নভাবে ঘন ঘন শিক্ষাক্রমের নানা পরিবর্তন বড়ো বাধা।

সারণি: ১ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (২০২৪)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠান		শিক্ষক		
		মোট	*মহিলা*	*মোট*	*মহিলা*	*% মহিলা*
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	প্রাইভেট	২৫৪৭	৫৩০	২৫৬৯৫	৯৬১০	৩৭.৪০
	মোট	**২৫৪৭**	**৫৩০**	**২৫৬৯৫**	**৯৬১০**	**৩৭.৪০**
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	প্রাইভেট	১৫৯৩৯	২৩৮৫	২১৯৪৮৪	৬৪৮২৮	২৯.৫৪
	পাবলিক	৬৩১	১৭৪	১৩৭৬৫	৪১১৬	২৯.৯০
	মোট	১৬৫৭০	২২৫৫৯	২৩৩২৪৯	৬৮৯৪৪	২৯.৫৬
উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ	প্রাইভেট	১৪৫১	২০৭	৩৩০৪৯	১৩৩৯৯	৪০.৫৪
	পাবলিক	৬৩	৮	১২৯৬	৫৩৯	৪১.৫৯
	মোট	১৫১৪	২১৫	৩৪৩৪৫	১৩৯৩৮	৪০.৫৮
সকল বিদ্যালয়	প্রাইভেট	১৯,৯৩৭	৩১২২	২৭৮,২২৮	৮৭,৮৩৭	৩৫.৮৩
	পাবলিক	৬৯৪	১৮২	১৫,০৬১	৪,৬৫৫	৩৫.৬৬
	মোট	২০,৬৩১	৩,৩০৪	২,৭৯,৫২৪	৯২,৪৯২	৩৫.৭৭

সূত্র: ব্যানবেইস, ২০২৪

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (SHED) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE) কর্তৃক পরিচালিত হয়। মাঠপর্যায়ে ৯টি আঞ্চলিক অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসার একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতি প্রণয়ন ও সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করে, অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে সেগুলো বাস্তবায়িত হয়। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারি কর্ম কমিশন PSC -এর মাধ্যমে এবং বেসরকারি শিক্ষকরা 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' (NTRCA) এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত 'স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি' (SMC) বা পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা প্রশাসনিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডসমূহ পরীক্ষা পরিচালনা ও শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করে।

৩.২ পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা একটি সন্ধিক্ষণে রয়েছে, যেখানে ভর্তির বিস্তার ঘটলেও শিক্ষার মান ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য, কাঠামোগত দুর্বলতা এবং নীতিগত পরিবর্তনের কারণে এই খাতটি চাপের মধ্যে থাকলেও, সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতা

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতা শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্বাস, নিরাপত্তা ও অনুপ্রেরণা তৈরি করে। তাদের আত্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি করে এবং একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করে, যা গভীর শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে অপরিহার্য। এটি কেবল জ্ঞান প্রদান নয়, বরং নৈতিকতা ও মানবিক বিকাশের মূল চাবিকাঠি। শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তাঁরা কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে পারেন। ভালো কাজের জন্য প্রণোদনা বা স্বীকৃতি প্রদান এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যালয়গুলোতে বৈষম্যহীন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি, যেখানে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সাথে ইতিবাচক আচরণ করবেন। এর জন্য শিক্ষাকর্মীদের কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করা এবং নিয়মিত মনিটরিং ও মেন্টরিং দরকার। এভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের আস্থা ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে, যা তাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করবে। এ প্রক্রিয়াটি আরও অর্থবহ করতে নিয়মিত বিরতিতে শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের ফলাফল এবং ক্লাসে উপস্থিতির ওপর ভিত্তি ধরে মূল্যায়ন সংস্কৃতি প্রচলন করা জরুরি। একই

সাথে ভালো কাজের জন্য প্রণোদনা বা স্বীকৃতি প্রদান এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষক উপস্থিতি, পাঠসংশ্লিষ্ট ও পাঠ-বহির্ভূত কাজে অংশগ্রহণ

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে কিন্তু বিদ্যালয় পর্যায়ে এসবের যথেষ্ট সুফল এখনও দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যালয়ের পাঠ-বহির্ভূত কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ তাদের সামগ্রিক বিকাশ, সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব গুণাবলী অর্জন এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তবে তা যথার্থ প্রয়োগ সব বিদ্যালয়ে দেখা যায় না। খেলাধুলা, বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্লাব এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু এগুলো বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। পাঠ-বহির্ভূত কাজ বা সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে বেশ কিছু বিষয় ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যেমন- শিক্ষার্থীদের গবেষণামূলক ও প্রকল্পভিত্তিক কাজে উৎসাহিত করা; সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও অন্যান্য সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেওয়া শিক্ষকদের স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা; বিদ্যালয়ের পাঠ-বহির্ভূত কাজের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে নিয়মিত মতবিনিময় সভা করা; পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও খেলাধুলা, বিতর্ক, স্কাউটিং-এর মতো কাজের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ ও সময় রাখা। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা, তাদের কাজের চাপ, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে পাঠ সংশ্লিষ্ট ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না এবং শিক্ষকরা তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অপ্রতুলতা ও শূন্যপদ

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর তীব্র অপ্রতুলতা এবং বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সংকট। হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতা, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে, ড্রপআউট বা ঝরে পড়ার হার বাড়াচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (pupil-teather ratio - PTR) অসম হওয়ায় মানসম্মত শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে এবং বিদ্যমান শিক্ষকরা তীব্র কাজের চাপ নিয়ে কর্ম পরিচালনা করছেন। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর তীব্র সংকট, মানসম্মত প্রশিক্ষণের অভাব এবং অপর্যাপ্ত পদোন্নতির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে এক জরিপ অনুযায়ী, অনেক স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রচুর সংখ্যক প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আর্থিক সুবিধা ও পদোন্নতির দাবিতে শিক্ষকদের আন্দোলনে নিয়মিত শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম ও পরীক্ষা ব্যাহত হচ্ছে, যা শিক্ষার মান কমিয়ে দিচ্ছে। এনটিআরসিএ সূত্রে জানা গেছে, সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট ৬৭ হাজার ২০৮ টি শূন্যপদ রয়েছে। এর মধ্যে স্কুল ও

কলেজে রয়েছে ২৯ হাজার ৫৭১টি পদ, মাদ্রাসায় ৩৬ হাজার ৮০৪টি এবং কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৮৩৩টি শূন্যপদ আছে (এনটিআরসিএ, ২০২৬)।

বাংলাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর তীব্র সংকট একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। দেশের অধিকাংশ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুমোদিত পদের বিপরীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। বিশেষ করে গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজির মতো আবশ্যিক বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অভাব সবচেয়ে বেশি। অনেক ক্ষেত্রে একজন শিক্ষককে একাধিক বিষয়ের ক্লাস নিতে হচ্ছে, যা শিক্ষার গুণগত মানকে ব্যাহত করছে। শিক্ষক সংকটের পাশাপাশি দাপ্তরিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অফিস সহকারী, লাইব্রেরিয়ান এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর (নৈশপ্রহরী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী) তীব্র সংকট রয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদেরই দাপ্তরিক চিঠিপত্র বা অফিসের কাজ করতে হয়, যার ফলে তারা ক্লাসে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। শহরাঞ্চলের তুলনায় মফস্বল বা দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে এই সংকট আরও প্রকট। অনেক শিক্ষক বদলি হয়ে শহরে চলে আসায় গ্রামীণ পর্যায়ের অনেক স্কুল শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ছে। এর জন্য শিক্ষক নিয়োগকারী সংস্থাকে আরও সক্রিয় করে নিয়মিত ও দ্রুততম সময়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও সুপারিশ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, যাতে কোনো পদ দীর্ঘ সময় খালি না থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব হলো স্ব স্ব বিদ্যালয়ের এমপিওভুক্ত শূন্যপদগুলো সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য (চাহিদা) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা। শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী অবসর গ্রহণের অন্তত ৬ মাস বা ১ বছর আগেই শূন্যপদ হিসেবে চিহ্নিত করে, সেই অনুযায়ী পরবর্তী নিয়োগের প্রস্তুতি নিতে হবে। শিক্ষক পেশাকে আরও আকর্ষণীয় করতে বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে মেধাবীরা এই পেশায় আকৃষ্ট হয়।

শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলি

বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলি কার্যক্রম সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকারি স্কুল ও কলেজে পিএসসি এবং বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের মাধ্যমে নিয়োগ হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য এনটিআরসিএ (NTRCA) নিবন্ধনধারী প্রার্থীদের মেধা তালিকা অনুযায়ী সুপারিশ করা হয়। সরকারি শিক্ষকদের বদলি ও পদায়ন অনলাইনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে এবং পদোন্নতি পিএসসির মাধ্যমে হয়। অন্যদিকে, বেসরকারি শিক্ষকদের নিয়োগ এনটিআরসিএ এর মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে এবং বদলির দাবি দীর্ঘদিনের হলেও বর্তমানে সীমিত আকারে চালু রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলি প্রক্রিয়া মূলত পিএসসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE)

কর্তৃক পরিচালিত হয়। নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাতালিকা প্রণয়ন, অনলাইন বদলি নীতিমালার প্রয়োগ এবং জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়ার বিধান আছে।

এমপিওভুক্ত 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা-২০২৬' সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশ করেছে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে হবে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। কোনো শিক্ষককে বদলির জন্য প্রভাবশালীদের দপ্তরে ধরনা দিতে হবে না বলে অনেকে মনে করেন। এই নীতিমালায় বলা হয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে প্রকাশ করবে। এসব শূন্য পদের বিপরীতে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন আহ্বান করা হবে। প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন গ্রহণ, বদলির আদেশ জারি এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

সাম্প্রতিক নীতিমালা বর্তমান সমস্যা সমাধানে কিছু ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। তবে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর স্বার্থে শিক্ষকদের পদে বদলির বিধান থাক উচিত কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। অন্যান্য সরকারি কর্মীদের মতো বদলির নিয়ম শিক্ষা পেশায় যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয় না। প্রচলিত বদলির নিয়ম মানা দুর্নীতি এবং তদবির বাণিজ্য সৃষ্টি করেছে। তাই অতি জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া শিক্ষকের বদলির নিয়ম রহিত করার কথা বিবেচনা করা উচিত।

শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্বাচন, নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলি

বাংলাদেশে শিক্ষা কর্মকর্তা (যেমন আঞ্চলিক জেলা, উপজেলা বা থানা শিক্ষা কর্মকর্তা) নিয়োগ ও নির্বাচন সাধারণত সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) - এর মাধ্যমে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের অধীনে বা প্রশাসনিক পদোন্নতির মাধ্যমে হয়ে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE) - এর অধীনে নিয়োগ ও বদলি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পিএসসি-র মাধ্যমে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে উত্তীর্ণদের প্রথমে বিভিন্ন কলেজে প্রভাষক বা সমমানের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় পর পর কর্মকর্তাদের বদলি করা হয়।

পরামর্শক কমিটির পর্যবেক্ষণে তিনটি বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়েছে:

- বিসিএস ক্যাডারের পরীক্ষায় কলেজ শিক্ষক ও মাঠের কর্মকর্তাদের জন্য পদপ্রার্থী নির্বাচিত হয়। কলেজ শিক্ষকের পদ অধিকতর আকর্ষণীয় মনে করা হয়। মাঠের শিক্ষা প্রশাসনের জন্য শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ (যেমন বি-এড বা এম-এড) প্রয়োজনীয় মনে করা হয় না। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেমন টিচার্স ট্রেইনিং কলেজ ও নায়েমের বিশেষজ্ঞ পদেও শিক্ষাবিজ্ঞান ডিগ্রি জরুরি মনে করা হয় না।

- মাধ্যমিকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ও দায়িত্বের পরিসরের তুলনায় আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনে যথেষ্ট সংখ্যক পদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এসব কর্মকর্তাদের যথেষ্ট পদোন্নতিরও সুযোগ নেই। উপজেলা সহকারী পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত অনেকে সেই পদ থেকেই অবসর গ্রহণ করেন।

- মাধ্যমিক শিক্ষা আঞ্চলিক প্রধানের পদবি উপপরিচালক। তিনি অধিদপ্তরের সাথে তাঁর অঞ্চলের জেলা উপজেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগের দায়িত্বে আছেন। এলাকার মাধ্যামিক শিক্ষার সামগ্রিক তত্ত্বাবধান তাঁর হাতে। অথচ এঁদের অনেকের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের অভাবে এবং জনবলের স্বল্পতায় এলাকার শিক্ষায় নেতৃত্বের ভূমিকা তাঁরা যথার্থ পালন করতে পারেন না। তাছাড়া পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনেক পদ শূন্য। একই ব্যক্তি একাধিক জেলা বা উপজেলার দায়িত্বে আছেন। এলাকার শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সমন্বয় ও নেতৃত্বের উদ্যোগ বা চর্চা দেখা যায় না।

পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা নির্ধারণ, যাচাই ও উন্নয়ন

পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা নির্ধারণ, যাচাই ও উন্নয়ন হলো একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া; যা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান ও আচরণের পরিবর্তন দ্বারা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। প্রতি পদের দায়িত্ব নির্ধারণ করে সফল কর্ম সম্পাদন ও কৃতীর (পারফরমেন্স) মানদণ্ড স্থির করা প্রয়োজন। প্রতি শিক্ষা কর্মীকে পেশাগত উন্নয়নের বার্ষিক ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করতে উৎসাহ দিতে হবে। পদোন্নতি ও পদায়নে কৃতিত্বের রেকর্ড ও সফল পেশাগত উন্নয়ন যাচাই ছাড়াও লিখিত পরীক্ষা যোগ করা যেতে পারে। এইসব বিষয়ে যথার্থ যাচাই ও স্বচ্ছ চর্চায় দুর্বলতা বিদ্যমান বলে পরামর্শক কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

শিক্ষকদের পেশাগত সহায়তা, মেন্টরিং ও পরিবীক্ষণ

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পাঠদানের মান উন্নয়ন এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পেশাগত সহায়তা, পরিবীক্ষণ ও মেন্টরিং অপরিহার্য। অভিজ্ঞ মেন্টরদের মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, নিয়মিত ফিডব্যাক এবং শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষণ পদ্ধতির ঘাটতিগুলো পূরণ করা যায়। কিন্তু এই ধরনের চর্চা বিদ্যালয়ে সচরাচর দেখা যায় না। বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিখন কৌশল, পাঠ পরিকল্পনা এবং আধুনিক শিক্ষাক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা হলে নবনিযুক্ত শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ হবে। শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়া হলে

তাঁরা নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। শিক্ষকদের নিজেদের পাঠদান মূল্যায়নে উৎসাহিত করা হলে তাঁদের নিজস্ব দক্ষতা ও ঘাটতি বুঝতে পারবেন। এই ধরনের উদ্যোগ অধিকাংশ বিদ্যালয়ে দেখা যায় না।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর পেশাগত উত্তরণ (career path)

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত উত্তরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা নিয়মিত প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে অর্জিত হয়। বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উত্তরণের পথ (ক্যারিয়ার পাথ) অতি সীমিত। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক (সহকারী শিক্ষক) হিসেবে শুরু হয়ে জ্যেষ্ঠ শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং প্রশাসনিক পদে (যেমন- শিক্ষা অফিসার) উন্নীত হওয়ার সুযোগ তাত্ত্বিকভাবে আছে। বাস্তবে এই প্রক্রিয়া কার্যকর নয়। অনেক শিক্ষক সহকারী শিক্ষক হিসেবে পেশা শুরু করে এই পদ থেকে অবসরে যান। শিক্ষাকর্মীরা প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা বিদ্যালয়ের অন্যান্য ব্যবস্থাপনা ও সহায়তা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে যেতে পারেন। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেও যাতে পদোন্নতি ও পদমর্যাদা পেতে পারেন সে সুযোগ বর্তমান ব্যবস্থায় নেই।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ তরুণদের পছন্দের পেশা নয়। অন্য কোনো কাজের সুযোগ না পেয়ে অনেকে শিক্ষকতা পেশায় আসেন। মেধাবী ও আদর্শবান তরুণদের আকৃষ্ট করে শিক্ষকতার পেশায় ধরে রাখার কথা অনেক সময় বলা হয় কিন্তু এজন্য কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই উদ্দেশ্যে অন্তত ১০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নিয়ে এগোনোর কথা ভাবতে হবে। অন্যান্য অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তী স্তরে ৪ বছরের কলেজ শিক্ষার অংশ হিসেবে শিক্ষাবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যালয় শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা তৈরির ব্যবস্থা বিদ্যমান।

২০১০ সালের শিক্ষানীতি খসড়া প্রকাশের পর দেশের বরেণ্য পাঁচ শিক্ষাবিদ (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকি, জামাল নজরুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান, কবির চৌধুরী ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী) এক যুক্ত বিবৃতিতে বিভিন্ন পরমর্শ দিয়েছিলেন। তারমধ্যে একটি ছিল-

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মেধাবী তরুণদের শিক্ষকতায় আনার জন্য কলেজের ডিগ্রি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চার বছরের শিক্ষক প্রস্তুতি কোর্স চালু এবং এদের নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষাসেবা কোর গঠন (আহমদ, ২০২৩ পৃ. ৩২১-৩২৪)

শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা, পারিতোষিক ও প্রণোদনা

বাংলাদেশে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও পারিতোষিক সন্তোষজনক নয়। প্রচলিত কথায় শিক্ষকের স্থান মা-বাবার সমতুল্য হলেও, শিক্ষকের বেতন, সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সক্ষমতায় তা প্রতীয়মান নয়। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বেতন পেলেও, বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সমতুল্য নয় যা শিক্ষক সমাজের মধ্যে বিভাজন ও বৈষম্য তৈরি করে। সকল শিক্ষকের জন্য পেনশন, চিকিৎসা সুবিধা ও নিয়মিত প্রণোদনা নিশ্চিত করা সংগত।

শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর সফল করতে হলে সমাজে শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্বকে অন্যসব সরকারি, বেসরকারি চাকুরি থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মর্যাদার জন্য ভিন্ন ও উচ্চতর বেতন ও পারিতোষিক কাঠামো বিবেচনা করা প্রয়োজন।

শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা

শিক্ষকের অধিকার, পেশাগত সুবিধা, কাজের পরিবেশ এবং বেতন কাঠামো নিয়ে শিক্ষক সংগঠন সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। তারা প্রধানত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের স্বার্থ, বেতন কাঠামো এবং পেশাগত মানোন্নয়নে নীতি নির্ধারণী আলোচনায় অংশগ্রহণ ও শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে রাষ্ট্র ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে সংলাপে যুক্ত হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের অনেক সংগঠন বিদ্যমান যেগুলো সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক ও বিভিন্ন ধরনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্ব করে। শুধুমাত্র শিক্ষকদের অধিকার রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই নয়, বরং মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করা হতে পারে এসব সংগঠনের আদর্শ ভূমিকা। বাস্তবে এগুলো অনেকসময় সংগঠনভুক্ত সদস্যদের স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়নের মতো করে কাজ করে। শিক্ষক সংগঠনগুলোর পেশাদার ও নৈতিক আচরণ নিশ্চিতকরণ রাজনৈতিক প্রভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় নিজেদের প্রয়োজনে এসব সংগঠনকে ব্যবহার করে। সততা, শিক্ষার্থীদের প্রতি সহমর্মিতা, নিরপেক্ষতা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে দায়বদ্ধ থাকা এই সংগঠনগুলো জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জ। এছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল শিক্ষাক্রম ও শিখন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া, শিক্ষার্থীর বৈচিত্রময় আচরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধরে রাখাও বড় বাধা হিসেবে দেখা দেয়। তবে শিক্ষার পরিবর্তন ও সংস্কারের চেষ্টায় শিক্ষকদের হতে হবে সহযাত্রী। শিক্ষককে প্রতিপক্ষ করে শিক্ষার সংস্কার সম্ভব নয়।

শিক্ষার্থীর নৈতিকতা মূল্যবোধ-শিক্ষকের ভূমিকা

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৮ প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ছিল "শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা"। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী এক জরিপে অংশগ্রহণকারী অর্ধেক সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষার্থী, দুই তৃতীয়াংশ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী, প্রায় তিন-চতুর্থাংশ উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থী মনে করে না যে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষকেরা নিজেদেরকে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। শিক্ষকদেরও অর্ধেক নিজেদেরকে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম মনে করেন না। প্রতিবেদনের সুপারিশে বলা হয় সহ-শিক্ষা কার্যক্রম, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ, অভিভাবক ও কমিউনিটি সাথে কাজ করা এবং সামাজিক শক্তির সঙ্গে একজোটে কাজ করা- এসব ক্ষেত্রে শিক্ষককে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। আর এজন্য তাদেরকে কীভাবে প্রস্তুত করা যায় তা বিবেচনা করতে হবে।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ডিগ্রিপ্রাপ্তদের মধ্যে যাদের শিক্ষকতা করার জন্য মানসিক ও জ্ঞানের দিক থেকে প্রস্তুতি নেই, তাদের শিক্ষক পদের জন্য নির্বাচন ভালো ফল বয়ে আনছে না। নতুন প্রজন্ম যারা বিদ্যালয়ে আছে তাদের নৈতিক মূল্যবোধ গঠন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সামগ্রিক পরিবেশে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

৩.৩ সুপারিশমালা

আশু সুপারিশ

১. **শূন্যপদ পূরণ:** স্বল্প সময়ের মধ্যে শূন্যপদ পূরণ করার জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রত্যন্ত বা দুর্গম অঞ্চলে, যেখানে স্থানীয়ভাবে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যায় না, সেখানে শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ভাতা বা প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. **শিক্ষক প্রস্তুতি:** নতুন যোগদানকারী শিক্ষকদের জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ, নিয়ম-নীতি এবং মূল্যবোধের সাথে মানিয়ে নিতে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম চালু করা প্রয়োজন। শিক্ষককে গবেষণার জন্য, পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য এবং বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের জন্য সহায়তা দিতে হবে।

৩. **শিক্ষকের জবাবদিহি:** প্রতি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেদের জন্য নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও জবাবদিহি প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবেন এবং তা

শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বদলি নিয়ে নানা দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ আছে। সরকার নানা উদ্যোগ নিচ্ছে যা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার জন্য কর্তৃপক্ষকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

৪. **শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা:** শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা, ন্যায়সংগত বেতন এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় সোচ্চার থাকা এবং সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করায় শিক্ষাকর্মীদের সংগঠন ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন। এই দায়িত্ব উভয় পক্ষের।

৫. **শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ও নৈতিক মূল্যবোধ:** প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্কে কীভাবে নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণ প্রদর্শিত হতে পারে সে সমন্ধে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এর মধ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সম্মিলিতভাবে আচরণবিধি তৈরি করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।

মধ্যমেয়াদি সুপারিশ

৬. **পেশাগত শিখন সমাজ:** শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, আঞ্চলিক-জেলা-উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগে এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এলাকাভিত্তিক ও প্রতি বিদ্যালয়ে পেশাগত শিখন সমাজ (Professional Learning Community-PLC) গড়ে তোলা।

৭. **শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত:** দ্রুত নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষক এর একটি যুক্তিসম্মত ও সঠিক অনুপাত নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনো শ্রেণিকক্ষে অগ্রহণযোগ্য মাত্রার শিক্ষার্থী না থাকে।

৮. **শিক্ষক বদলি নীতি:** শিক্ষকতা পেশায় বদলির নিয়ম সাধারণ সব সরকারি কর্মীদের মতো থাকা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর স্বার্থে প্রয়োজন কিনা তা বিবেচনা করা দরকার। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বদলির এই বিধান উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার দেশে দেখা যায় না।

৯. **শিক্ষাবিজ্ঞানে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার:** মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসনে এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পদের জন্য শিক্ষা বিষয় এম-এড বা বি-এড বা সমকক্ষ ডিগ্রি প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১০. **জনবল বৃদ্ধি ও পদোন্নতি:** মাঠ পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষায় শূন্যপদের আঞ্চলিক জেলা, উপজেলা স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং পদোন্নতির সুযোগ

তৈরি করা উচিৎ। কমিটির মতে মাঠ পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের জনবল অনতি বিলম্বে অন্তত দ্বিগুণ হওয়া উচিত। আঞ্চলিক পর্যায়ে শিক্ষা নেতৃত্বদানের দায়িত্বে নিযুক্ত আঞ্চলিক প্রধানের পদবি স্থায়ীভাবে 'পরিচালক' হওয়া সমীচীন। প্রতি স্তরে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উচ্চতর শূন্যপদ না থাকলে একই পদে অন্তত ১০ বছর কর্মরত থাকলে ব্যক্তিগতভাবে উচ্চতর গ্রেড ও মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

১১. **স্ব-মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা:** নিজের কাজ, দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা এবং শক্তির জায়গাগুলো তালিকাভুক্ত করে আত্ম-মূল্যায়ন সংস্কৃতি চালু করা প্রয়োজন। প্রতি শিক্ষাকর্মীকে বার্ষিক ও মধ্যমেয়াদি (৫ বছরের) নিজস্ব পেশাগত উন্নয়ান পরিকল্পনা তৈরিতে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও সহায়তা দিতে হবে।

১২. **প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন:** চাকুরিকালীন নিয়মিত প্রশিক্ষণ (ইন-সার্ভিস ট্রেনিং), সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে পাঠদান পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান হালনাগাদ করার সুযোগ আরও কার্যকরভাবে চালু করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ের সামগ্রিক নীতি ও পরিকল্পনার আলোকে অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। ডিজিটাল ক্লাসরুম পরিচালনা, কন্টেন্ট তৈরি এবং শিক্ষামূলক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩. **বিদ্যালয়ে কর্মরত থেকে পদোন্নতি:** বিদ্যালয় শিক্ষকদের শিক্ষকতায় কর্মরত থেকে পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করতে হবে। সহকারী শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে যোগদানের পর শিক্ষক, সিনিয়র শিক্ষক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে পদোন্নতির ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৪. **মূল্যবোধের চর্চা:** সহ-শিক্ষাকার্যক্রমের মাধ্যমে, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ ও অভিভাবক ও কমিউনিটির সাথে একত্রে কাজ করে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আত্মস্থ করা এবং তা চর্চার সুযোগ তৈরি করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্তুতিতে এবং তাদের কৃতীর মূল্যায়নে এই বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১৫. **শিক্ষকতা পেশার উচ্চতম মর্যাদা:** মানসম্মত সমতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও মর্যাদা নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে চার ধাপবিশিষ্ট দীর্ঘমেয়াদি কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- উচ্চ মাধ্যমিক-উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের চার বছরের ডিগ্রি কোর্সে আকৃষ্ট করা যাতে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রণোদনা দিয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের এই কোর্সে ভর্তি করতে হবে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ছাড়াও, মানসম্মত সুযোগ সুবিধা, শিক্ষক ও একাডেমিক প্রোগ্রাম নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে প্রতি জেলায় একটি বা দুটি করে সারা দেশে অন্তত ১০০টি উচ্চমানের ডিগ্রি কলেজে শিক্ষাবিজ্ঞান প্রোগ্রাম চালু করা যায়।

- আকর্ষণীয় বেতন, ভাতা, মর্যাদা ও পেশাগত উত্তরণের পথসহ একটি জাতীয় শিক্ষাসেবা বাহিনী (National Teaching Service Core) চালু করা যায়। নতুন ডিগ্রি কোর্স থেকে উত্তীর্ণরা শিক্ষা সেবা বাহিনীতে যোগ দিয়ে অন্তত পাঁচ বছর সরকারি নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকবে।

- শিক্ষকদের পদ মর্যাদা, পারিতোষিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষক তাঁর প্রস্তুতি, পেশাগত মান ও আচরণ দ্বারা তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ চরিত্র হিসেবে প্রতিভাত হবেন। আর এটাই হতে হবে শিক্ষকতা পেশার লক্ষ্য।

৩.৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব

বিদ্যালয় শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষকদের নিয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে আশু এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য নীতিগত ও অগ্রাধিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই বহুমাত্রিক ও সংবেদনশীল ক্ষেত্রে অংশীজনদের সংযুক্ত করে সুবিবেচিত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। প্রস্তাবিত শিক্ষা উন্নয়ন টাস্কফোর্স এ সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আশু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষকদের সংগঠনগুলো এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদি মৌলিক পরিবর্তনের যে সুপারিশ দেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে বিবেচনা এবং উদ্যোগের সূচনা সত্বর হওয়া প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

Campaign for Popular Education (CAMPE). (2019). *Education watch 2018-19: Secondary school teachers in Bangladesh in the light of SDG 4*. https://campebd.org/page/Generic/0/6/18

Ministry of Education. (2010). *National education policy 2010*. Government of the People's Republic of Bangladesh. https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/bangladesh_national_education_policy_2010.pdf

আহমদ, এম. (২০২৩)। *একুশ শতকে বাংলাদেশ: শিক্ষার রূপান্তর*। প্রথমা প্রকাশন।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন। (২০০৩)। জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন ২০০৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ [এনটিআরসিএ]। (২০২৬)। সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি (বিশেষ)। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। (২০২৬)। স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ) কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা (২০২৬)। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

অধ্যায়

৪

অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন

কোনো শিশু আর্থিক বা অন্য বৈষম্যের কারণে মানসম্মত বিদ্যালয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না।

৪.১ প্রেক্ষাপট

মাধ্যমিক শিক্ষা বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং টেকসই উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি অর্জিত হলেও মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসনের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। জাতীয় ও বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যবর্তী সংযোগস্থল এই স্তরটির দুর্বলতা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, বৈষম্যের ধরন ও চালিকাশক্তি, রাষ্ট্রীয় নীতি ও কর্মসূচির কার্যকারিতা এবং সমসাময়িক প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। দারিদ্র্য, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক পরিচয়, জেন্ডার বৈষম্য, তথ্যপ্রযুক্তিগত অসমতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশেষ চাহিদাজনিত প্রতিবন্ধকতাগুলোকে মাধ্যমিক শিক্ষায় বৈষম্যের প্রধান উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি রাষ্ট্রের নীতি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা উদ্যোগগুলোর সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাও আলোচনায় এসেছে।

ব্যানবেইসের ২০২৪ সালের শিক্ষা বিষয়ক পরিসংখ্যান ও বিবিএস পরিচালিত বাংলাদেশ মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) ২০২৫-এর প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেলেও ঝরে পড়ার হার এখনও বেশি। দারিদ্র্য, জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য, ভৌগোলিক অবস্থান – এসব বিষয়সমূহ সম্মিলিতভাবে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশ, ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং এই স্তর সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৪.১ অনুযায়ী সকল শিশুর জন্য ন্যায়সংগত ও মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি মাধ্যমিক শিক্ষায় বিদ্যমান বঞ্চনা ও বৈষম্য পর্যালোচনা করে আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবসম্মত করণীয় বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী ও বৈষম্যহীন করার অঙ্গীকার করে। ১৯৭৪ সালের কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্তর হিসেবে চিহ্নিত করে। তবে খুদা কমিশনেও মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন অধিকার বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি (Qudrat-e-Khuda Education Commission Report, 1974)। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে ধরে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সীমিত সেবা হিসেবে দেখা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তত অর্ধেক ব্যয় অভিভাবকেরা বহন করবেন বলা হয়েছে। সেই ধারা

এখনও অব্যাহত আছে। এখনও মাধ্যমিক স্তরে শিশুদের ৫০ শতাংশেরও বেশি শিক্ষা সম্পূর্ণ করে না। এটা দারিদ্র্য, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও ব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন। সর্বশেষ ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতেও মাধ্যমিক স্তর সর্বজনীন করার লক্ষ্য স্থির করা হয়নি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ -এর অভীষ্ট ৪ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। নীতিগতভাবে বৈষম্য নিরসনের স্বীকৃতি এলেও অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর কাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি এবং এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকারও দেখা যায়নি।

৪.২ পর্যবেক্ষণ

মাধ্যমিক শিক্ষায় বৈষম্যের ধরন ও ব্যাপ্তি

মাধ্যমিক শিক্ষায় বৈষম্য একটি বহুমাত্রিক ও কাঠামোগত সমস্যা। এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, জেন্ডারভিত্তিক, ব্যক্তি বৈশিষ্টজনিত ও ব্যবস্থাগত বিভিন্ন মাত্রায় দৃশ্যমান। দারিদ্র্য সবচেয়ে শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষা ব্যয় বহনে অক্ষম হওয়ায় ঝরে পড়ে। ভৌগোলিকভাবে চর, হাওর, চা বাগান এলাকা, পাহাড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যালয়ের স্বল্পতা, যোগাযোগ সমস্যা ও দুর্যোগঝুঁকি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ সীমিত করে।

বর্তমানে শিক্ষা একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে, কারণ শিক্ষার সুযোগ ও মান অনেকটাই নির্ধারিত হচ্ছে অভিভাবকের নানাবিধ শিক্ষা ব্যয় বহন করার সক্ষমতার ওপরে। সরকারি ও এমপিও বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই বিনামূল্যে দেওয়া হলেও বিভিন্ন ধরনের খরচের কারণে শিক্ষার ব্যয় বেড়ে যায়। স্কুলের ফি ছাড়াও শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং করতে হয়, গাইডবই কিনতে হয়, যাতায়াত, স্টেশনারি, পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। অনেক অভিভাবক ও শিক্ষার্থী মনে করেন যে শুধু স্কুলে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় ভালো ফল করা সম্ভব নয়। তাই তারা কোচিং ও গাইডবইয়ের ওপর নির্ভর করে। এসব খরচ মিলে দরিদ্র ও দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি পরিবারগুলোর জন্য শিক্ষা একটি বড় আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এসব পরিবারের অনেক শিশুই পড়াশোনা শেষ করতে পারে না বা অল্প বয়সেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়।

জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য নতুন রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে ৭৮.৫ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থী প্রায় ৫৫ শতাংশ। জেন্ডার সমতার দিক থেকে এখন ছেলেরা বৈষম্যের শিকার হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে মেয়েদের ভর্তির হার বেশি হলেও বাল্যবিবাহ, নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে

তাদের অনেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে না। দলিত, নৃগোষ্ঠী ও ভাষাগত সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার মুখোমুখি হয়। প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী অবকাঠামো, সহায়ক উপকরণ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক না থাকায় তারা কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ৭৮.৫ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৩ লাখের বেশি বেসরকারি বিদ্যালয়ে এবং প্রায় ৫ লাখ সরকারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। পাশাপাশি আপগ্রেডেড (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে প্রায় ৯২ হাজার শিক্ষার্থী। এ হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৯৪ শতাংশ শিক্ষার্থীই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়ছে, যা শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি দায়িত্বের সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০২৫ অনুযায়ী, প্রাথমিক থেকে নিম্নমাধ্যমিক এবং এরপর উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সব বিভাগেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সম্পন্ন করার হার কমে যাচ্ছে। সারাদেশে প্রায় ৮৪ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করলেও মাধ্যমিক গমনোপযোগী শিশুদের অর্ধেকেরও কম মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে। নিম্নআয়ের পরিবারের শিশুরা বিশেষ করে মেয়েরা, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকিতে বেশি থাকে। সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতাই এই পরিস্থিতির মূল কারণ।

নিম্নমাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি) এবং মাধ্যমিক (নবম ও দশম শ্রেণি) স্তরে শিক্ষা সম্পন্ন করার হারে বড় ধরনের পতন ঘটে। যেখানে প্রায় ৮৪ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে, সেখানে মাত্র ৬৯ শতাংশ নিম্নমাধ্যমিক এবং মাত্র ৪৪ শতাংশ মাধ্যমিক পর্ব সম্পন্ন করে। (MICS, 2025)

মাধ্যমিক শিক্ষায় ধনী-গরিব বৈষম্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দরিদ্র পরিবারের মাত্র ২১ শতাংশ শিশু মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে, যেখানে সচ্ছল পরিবারের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ৬৬ শতাংশ। শহর-গ্রামের মধ্যেও বিস্তর ব্যবধান রয়ে গেছে – শহরের ৪৯ শতাংশ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শেষ করলেও গ্রামে এই হার ৪২ শতাংশ। দেশের কিছু বিভাগ অন্যগুলোর তুলনায় বেশি খারাপ অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সিলেটে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরেই শিক্ষা সম্পন্ন করার হার সবচেয়ে কম। (MICS, 2025, p. 55)

মেয়েদের বিদ্যালয় ত্যাগের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে এখনও বাল্যবিবাহকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের নিরাপত্তার সমস্যা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা প্রকট। অনেক নিম্নআয়ের পরিবার শিক্ষার চেয়ে তাৎক্ষণিক পারিবারিক আয়কে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হয়। ফলে ছেলেদেরকে বিদ্যালয়ে রাখার পরিবর্তে কাজে পাঠানো হয়। ফলে মেয়েদের ৭৬ শতাংশ নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে কিন্তু ছেলেদের এই হার মাত্র ৬৩ শতাংশ।

সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ এবং উপবৃত্তির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। তবুও শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফিসহ আরও নানা খরচ

বহন করতে হয়। শর্তসাপেক্ষে প্রায় সকল শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাওয়ার কথা, কিন্তু নানা ব্যবস্থাপনা সমস্যার জন্য অনেক শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পায় না। শিক্ষার ব্যয় দেশের নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য বড় বোঝা এবং তাদের শিশুদের ঝরে পরার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠছে। ফলে শিক্ষায় অভিগম্যতা আর্থিক সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এডুকেশন ওয়াচ ২০২৩ - এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের শিশুদের জন্য পরিবারকে বছরে শিক্ষার্থী প্রতি আনুমানিক ২৭ হাজার টাকার বেশি ব্যয় করতে হয়ে। সিটি করপোরেশন, অন্য শহর এলাকা এবং গ্রামে এই ব্যয় ২০২২ সালে যথাক্রমে প্রায় ৩৬ হাজার, ৩০ হাজার এবং ২৩ হাজার টাকা ছিল (এডুকেশন ওয়াচ ২০২৩, পৃ. ৬০)। পরামর্শক কমিটির মাঠপর্যায়ের ১০টি বিদ্যালয় পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র কোচিং বা প্রাইভেট টিউশন বাবদ অষ্টম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীর পরিবার শহরে গড়ে প্রতিমাসে ১৩২৬ টাকা এবং গ্রামে ৭৯৪ টাকা ব্যয় করে। অর্থাৎ গ্রামের তুলনায় এ বাবদ শহরের শিক্ষার্থীর ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ।

অনেক পরিবারের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুরত্ব, শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় এবং সীমিত সংখ্যক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষার পথে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। এসব কারণে নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক পরিবারের শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশ ও টিকে থাকার ক্ষেত্রে বেশি বঞ্চনার শিকার হয়। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও গভীর করে তোলে। তাছাড়া অভিভাবকদের অসচেতনতা, ইভটিজিং বা মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা, মাদকাসক্তি ও রাজনৈতিক অপপ্রভাব শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ তৈরির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শহর ও গ্রামের বিদ্যালয়ের মধ্যে পাঠদানের মান, শিক্ষক দক্ষতা ও সহ-শিক্ষাকার্যক্রমে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। কোচিং ও নোট-গাইড নির্ভরতা দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় বৈষম্য নিরসন এবং সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা ব্যয়ের চাপ কমানো, সেবার গুণগত পার্থক্য হ্রাস এবং দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। শিক্ষায় বৈষম্য দূর না হলে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়।

শিক্ষায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের নানা উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষায় ডিজিটাল বিভাজন স্পষ্ট। ইন্টারনেট, ডিভাইস ও ডিজিটাল দক্ষতার অভাব বিশেষ করে ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে এবং গ্রামীণ ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষার বাইরে ঠেলে দেয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এই বৈষম্য আরও প্রকট হয় এবং বহুমাত্রিক বাধা সৃষ্টি করে।

জলবায়ু অভিঘাত সমস্যা দিন দিন ব্যাপকতর হচ্ছে। ইউনিসেফের শিশু জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০২০ অনুযায়ী ১৬৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৫তম অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের শিশুরা বিশ্বের সবচেয়ে বিপন্ন শিশুদের অন্তর্ভুক্ত। দেশে প্রায় ২ কোটি শিশু চরম জলবায়ু ঝুঁকির মুখে রয়েছে। শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই বিশ্বজুড়ে তীব্র আবহাওয়া-সংক্রান্ত দুর্যোগের কারণে শিশুদের শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এর মধ্যে

বাংলাদেশেই প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ বা ৮০ শতাংশ শিশুর শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়েছে (Learning Interrupted: Global Snapshot of Climate-Related School Disruptions in 2024, UNICEF)। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ – বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন তীব্রতর ঝুঁকি তৈরি করছে। ফলে বিদ্যালয় বিধ্বস্ত হচ্ছে, শিক্ষণ- শিখনসামগ্রী ও কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে শাস্তিমূলক পদায়ন ও তার প্রভাব

শিক্ষার বিভিন্ন সূচকে পিছিয়ে থাকা অঞ্চল যেমন- চরাঞ্চল, হাওর এলাকা, চা-বাগান অধ্যুষিত অঞ্চল এবং পার্বত্য এলাকাগুলো সাধারণত প্রশাসনিকভাবে একটি শাস্তিমূলক পদায়নের স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ এসব এলাকায় পদায়নকে অনেক ক্ষেত্রে পুরস্কার নয়, বরং এক ধরনের দণ্ড বা অনাকাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়। এই মানসিকতার ফলে দক্ষ, যোগ্য ও উদ্যমী শিক্ষা কর্মকর্তারা এসব অঞ্চলে কাজ করতে আগ্রহী হন না, কিংবা তাঁদের সেখানে দীর্ঘমেয়াদে নিয়োজিত রাখা সম্ভব হয় না। এর ফলস্বরূপ, এসব অঞ্চল অভিজ্ঞ ও কার্যকর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে। পরিকল্পিত তদারকি, সঠিক দিকনির্দেশনা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের অভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়ে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পরিবর্তে বিদ্যমান সমস্যাগুলো আরও গভীর হয়। যেমন- শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বৃদ্ধি, শিক্ষক সংকট, অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হ্রাস।

এ ধরনের প্রশাসনিক চর্চার ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষাগত বৈষম্য আরও প্রকট আকার ধারণ করে। এভাবে শাস্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে পদায়নের এই প্রবণতা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলোর শিক্ষা পরিস্থিতিকে ধীরে ধীরে আরও নাজুক ও সংকটাপন্ন করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে এ সকল পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের শিক্ষা পরিতিস্থিতির উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ প্রণোদনাসহ সৎ, যোগ্য ও উদ্যমী শিক্ষা কর্মকর্তাদের পদায়ন দেওয়া প্রয়োজন।

নীতি ও কর্মসূচিতে বৈষম্যের স্বীকৃতি এবং উদ্যোগ

শিক্ষা হোক মৌলিক অধিকার। শিক্ষা কি মৌলিক অধিকার? রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭ ধারায় রাষ্ট্র পরিচালনায়র মূলনীতি হিসেবে একটি অভিন্ন গণমূখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটিকে মৌলিক অধিকার বলা যায় না, কারণ এজন্য অধিকার দাবি করে মামলা করা যায় না। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারের তালিকায় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত নয়। মোটকথা হলো, সংবিধান অনুসারে শিক্ষা নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা বলে স্বীকৃত হলেও

এখন পর্যন্ত মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং একটি যথাযথ অধিকারভিত্তিক শিক্ষা আইন দীর্ঘদিনের দাবি।

সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ। নীতি ও কর্মসূচিতে বৈষম্যের স্বীকৃতি থাকলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কাঠামোগত সমস্যা রয়ে গেছে। অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য, প্রশাসনিক সক্ষমতার অভাব, পর্যাপ্ত তদারকি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি এসব উদ্যোগের কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত করছে।

অংশীজনের মতামতে উত্থাপিত বিষয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারবিষয়ক কনসালটেশন কমিটির মতবিনিময় সভায় গুণগত শিক্ষা ও শিখন নিশ্চিত করতে তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে – (১) অভিগম্যতা, (২) অন্তর্ভুক্তি এবং (৩) বৈষম্য নিরসন।

উপরে আলোচিত অনেক বিষয় দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের মতবিনিময় সভায় উল্লেখ করা হয়েছে। অভিগম্যতা বলতে শিক্ষার্থীর শিক্ষায় প্রবেশ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করাকে বোঝানো হয়েছে। আলোচনায় যে সকল প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ উঠে এসেছে তার মধ্যে আছে – প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যালয়ের স্বল্পতা, নিরাপদ যাতায়াতের অভাব, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প ও হুইলচেয়ার এবং শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা না থাকা, মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ যাতায়াত ও পৃথক টয়লেটের ঘাটতি, অভিভাবকদের অসচেতনতা, তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক শ্রেণিকক্ষের অভাব এবং দারিদ্র্য। এছাড়া বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ঘাটতি, ভাষাগতভাবে সহজ ও বোধগম্য পাঠ্যবইয়ের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অপর্যাপ্ততা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ঘাটতিও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। ধর্মীয় গোঁড়ামি, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, জন্মনিবন্ধন সনদ প্রাপ্তিতে জটিলতা এবং দুর্গম এলাকায় যাতায়াত সমস্যার কথাও উঠে আসে।

মতবিনিময়ে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়েছেন। স্বল্পমেয়াদি করণীয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

- উপবৃত্তির পরিমাণ ও আওতা বৃদ্ধি। ঢালাওভাবে সকলকে উপবৃত্তি না দিয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে উচ্চতর হারে আর্থিক সহায়তা দান এবং বিদ্যালয়ে স্বল্পমূল্যে মধ্যাহ্ন খাবার দেওয়ার কথা বলেন।
- দুর্গম এলাকায় আবাসিক ও ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয় স্থাপন। এলাকায় যোগ্য শিক্ষকের অভাবে অন্য এলাকা থেকে নিযুক্ত শিক্ষকের আবাসন সহায়তা ও অতিরিক্ত প্রণোদনার কথাও বলা হয়।
- ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেট সহায়তা প্রদান। শিক্ষকদের এক্ষেত্রে যথাযথ প্রস্তুতির কথা বলা হয়, যাতে তারা শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারেন এবং উৎসাহিত করতে পারেন।

মধ্যমেয়াদি পদক্ষেপ হিসাবে সুপারিশ করা হয়েছে:

- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা। শ্রেণিতে বিভিন্ন দক্ষতার শিক্ষার্থীদের পাঠদানের পদ্ধতি সকল শিক্ষকদের আয়ত্ত করা প্রয়োজন বলে মত দেওয়া হয়।
- অঞ্চল ও লক্ষ্যভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন। দরিদ্র ও প্রতিকূল পরিবেশ এলাকার জন্য অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। এলাকার শিক্ষার্থীর সংখ্যা বরাদ্দের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত।
- নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষাভিত্তিক সহায়ক শিক্ষা কার্যক্রম। স্থানীয় ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে সহকারী নিয়োগ দেওয়া যায়।

দীর্ঘমেয়াদি বিবেচ্য বিষয় ছিল:

- মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা। আর্থিক দৈন্যের কারণে কোনো শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- জলবায়ু সহনশীল শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে তোলা। জলবায়ু অভিঘাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা অবকাঠামোর জন্য এবং শিক্ষার্থীদের দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- শক্তিশালী মনিটরিং ও জবাবদিহি প্রবর্তন। শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারে আরও সক্রিয় হতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ দূর্নীতিমুক্ত হতে হবে।
- এসব ছাড়াও সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। এনজিওসমূহের সাথে অংশীদারিত্বে ঝুঁকিতে থাকা ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের পরে টিউটরিং এবং মেনটরিং প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে। বৃহৎ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোও কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় অবকাঠামো ও অন্যান্য উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৪.৩ সুপারিশমালা

আশু সুপারিশ

১. **দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তা:** দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার ব্যয় লাঘবের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। সকলের জন্য উপবৃত্তির পরিবর্তে দরিদ্র বলে বিবেচিত শিশুদের জন্য উচ্চতর হারে উপবৃত্তি দেওয়া যেতে পারে। দরিদ্র ও ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের থেকে পরীক্ষা, সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজ এবং নিরাময়মূলক শিক্ষার জন্য ফি নেওয়া বাধ্যতামূলক হবে না। এজন্য বিদ্যালয়কে সরকার নির্দিষ্ট অনুদান দিবে। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে নিরাময়

ক্লাস, অতিরিক্ত পাঠদান এবং প্রয়োজন মতো এনজিও সহযোগিতায় স্কুল-পরবর্তী টিউটরিং ও মেন্টরিং চালু করতে হবে। স্বল্পমূল্যে মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা হবে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

২. **ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পুনর্ভর্তি ও ধরে রাখার কর্মসূচি:** বিদ্যালয়, এসএমসি, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি, স্থানীয় সরকার ও সমাজের অংশগ্রহণে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী শনাক্ত, পুনর্ভর্তি এবং নিয়মিত ফলো-আপ চালু করতে হবে। তাদের অতিরিক্ত সহায়তাদানের জন্য বিদ্যালয় ও স্থানীয় শিক্ষা এনজিও মিলে সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৩. **দুর্গম এলাকায় শিক্ষক সংকট মোকাবিলায় দ্রুত নিয়োগ ও পদায়ন:** হাওর, চর, পাহাড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ঘাটতি পূরণে অস্থায়ী/চুক্তিভিত্তিক এবং স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগ ও পদায়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এলাকার বাইরে থেকে নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য আবাসন ও বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৪. **নিরাপদ ও সহিংসতামুক্ত বিদ্যালয় পরিবেশ:** ইভটিজিং (মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা), মাদক, বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন, বিদ্যালয় ও কমিউনিটির যৌথ নজরদারি ও তাৎক্ষণিক প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

৫. **পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্য নৃ-গোষ্ঠী এলাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা:** শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদগুলোর সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের লোকবল ও অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। আবাসিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থী সংখ্যা ও অবকাঠামো উন্নতির জন্য আশু প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী সরকার মাথাপিছু বরাদ্দ দিতে পারে।

৬. **বিশেষচাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্যোগ:** বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প, সহায়ক শিক্ষা উপকরণ, পরীক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনভিত্তিক সহায়তা দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে। প্রতি বিদ্যালয়ে এবং প্রতি উপজেলার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

মধ্যমেয়াদি সুপারিশ

৭. **প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকায় নতুন সরকারি ও আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন:** হাওর, চর, চাবাগান, পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বর্তমান শিক্ষাসেবার পরিস্থিতি যাচাই করে সরকারি ও প্রয়োজন অনুসারে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৮. **নারী শিক্ষক নিয়োগ ও ধরে রাখার জন্য প্রণোদনা:** গ্রামীণ ও সরকারি বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে আবাসন, নিরাপত্তা এবং দুর্গম এলাকার জন্য আর্থিক প্রণোদনা চালু করা যেতে পারে।

৯. **অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জীবনদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব:** বিশেষ চাহিদা, নৃগোষ্ঠী, জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও বহুভাষিক শিক্ষার বিষয়ে প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য বর্তমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যাচাই করে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে জীবনদক্ষতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, জলবায়ু সচেতনতা ও কর্মমুখী উপাদান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থী শিক্ষাক্রমেও এসব বিষয়ের শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে জোর দিতে হবে।

১০. **ডিজিটাল বৈষম্য নিরসনে সমতাভিত্তিক বিনিয়োগ:** গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ, স্মার্ট ডিভাইস, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির উপকরণ চালু রাখায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে শিখন কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ও চর্চা বাড়াতে হবে।

১১. **বৈষম্য-সচেতন মনিটরিং ও একাডেমিক তদারকি জোরদার:** বিদ্যালয় ও উপজেলা পর্যায়ে বৈষম্য নিরসন ও অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনায় অগ্রগতির সূচক নির্ধারণ করে নিয়মিত তদারকি এবং ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়ন চালু করতে হবে।

১২. **জলবায়ু ও দুর্যোগ-সহনশীল শিক্ষা অবকাঠামো ও জরুরি শিক্ষা ব্যবস্থা:** দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিদ্যালয় নির্মাণে জলবায়ু সহনশীল নকশা, নমনীয় শিক্ষাপঞ্জি, বিকল্প শিখন পদ্ধতি ও জরুরি শিক্ষা পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১৩. **বিদ্যালয় শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক ও আইনি স্বীকৃতি:** সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং পৃথক শিক্ষা অধিকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষাকে আদালতে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক করার জন্য সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় ধাপে ধাপে বিলুপ্ত করতে হবে। এ জন্য সরকারি শিক্ষা বিনিয়োগে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. **দেশব্যাপী শক্তিশালী বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহি কাঠামো:** এক্ষেত্রে মধ্যমেয়াদি উদ্যোগকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতায়ন, অঞ্চলভিত্তিক বাজেট ও নিয়মিত শিখন মূল্যায়নের মাধ্যমে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা একটি জটিল কিন্তু অপরিহার্য লক্ষ্য। এখানে বৈষম্য একক কোনো সমস্যার ফল নয়; বরং এটি দারিদ্র্য, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক কাঠামো, প্রযুক্তিগত অসমতা ও জলবায়ু ঝুঁকির সম্মিলিত ফল। প্রস্তাবিত আশু, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশমালাগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা, সমতা ও বৈষম্য নিরসনের ক্ষেত্রে একটি টেকসই ও কাঠামোগত পরিবর্তন সম্ভব হবে। সুপারিশগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত পরিকল্পনা, স্পষ্ট দায়িত্ব বণ্টন, পর্যাপ্ত বাজেট এবং দৃঢ় রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার।

বৈষম্য হ্রাস ও সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে সরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত ও সমাজের অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগ অপরিহার্য। সুপারিশমালা বাস্তবায়নের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নোক্ত কিছু বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় নীতি নির্ধারণীমূলক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্ব দিতে হবে।

২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়ত্ত্বাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. ডিজিটাল ও ভৌত কাঠামো উন্নয়নে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের নেতৃত্বে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৪. স্থানীয় পর্যায়ে সুপারিশ বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার, জেলা-উপজেলা প্রশাসন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি একযোগে কাজ করবে।

৫. এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত ও পিপিপি (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব) উদ্যোগ সক্রিয় করতে হবে।

৬. অভিভাবক, স্থানীয় সমাজ, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজকে শিক্ষা-বৈষম্য সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা, নজরদারি ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে একত্রে কাজ করার জন্যে উৎসাহিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র

Bangladesh Bureau of Statistics & UNICEF Bangladesh. (2025). *Bangladesh multiple indicator cluster survey 2025, survey findings report*. Bangladesh Bureau of Statistics. https://mics.unicef.org/surveys

Campaign for Popular Education. (2023). *Education watch 2023: School education in Bangladesh – Post-pandemic resilience and sustainability*. https://campebd.org/Files/30032024043348pmEducation_Watch_Report_2023_Full_English_for_Web.pdf

Ministry of Education. (1974). *Bangladesh Education Commission report* [Qudrat-e-Khuda Education Commission report]. Government of the People's Republic of Bangladesh.

Ministry of Education. (2010). *National education policy 2010*. Government of the People's Republic of Bangladesh. https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/bangladesh_national_education_policy_2010.pdf

UNICEF. (2024). *Learning interrupted: Global snapshot of climate-related school disruptions in 2024*. https://www.unicef.org/media/170626/file/Global-snapshot-climate-related-school-disruptions-2024.pdf

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981

অধ্যায়

৫

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য- শিক্ষার্থীবান্ধব বিদ্যালয় ও সফল শিক্ষার্থী।

৫.১ প্রেক্ষাপট

বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে যা ঘটে মূলত তা দিয়েই নির্ধারণ হয় শিক্ষার সকল সাফল্য। পাঠদান ও শেখার কাজটি সম্পন্ন হয় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ প্রচেষ্টায়। বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখনের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার সম্মিলিত দায়িত্ব বিদ্যালয় প্রধান ও শিক্ষকদের। মন্ত্রণালয় থেকে প্রত্যন্ত উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত সিদ্ধান্তদাতা ও কর্মকর্তাদের সব কাজের লক্ষ্য ও তার বিচারের মাপকাঠি হলো, কার্যকর বিদ্যালয় ও সফল শিক্ষার্থী।

সামগ্রিক নিয়ম-নীতি ও নির্দেশনার আলোকে বিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান ও শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে যেমন; তেমনই শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজের কাছেও।

দুই ধরনের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা: ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রধানত দুই ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান- সরকারি ও এমপিওভুক্ত। এছাড়া সম্পূর্ণ বেসরকারি এবং এমপিও অনুমোদন প্রত্যাশী অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিশ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় সাতশত সরকারি বিদ্যালয়। এগুলোর জনবল, আর্থিক ও শিক্ষা কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি সরকারের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের হাতে। এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা অন্তত নীতিগতভাবে সরকার ও বিদ্যালয়ের যৌথ নিয়ন্ত্রণে। তবে বাস্তবে বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে খর্ব হয়। (নিচে আলোচ্য)

কেন্দ্রীভূত প্রশাসন: বাংলাদেশের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র প্রশাসনের প্রভাব শিক্ষা ব্যবস্থায়ও দেখা যায়। দেশের বিশাল শিক্ষা আয়োজনের ব্যবস্থাপনাও অতি মাত্রায় কেন্দ্রায়িত। প্রত্যন্ত এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের কোনো এক শ্রেণিতে অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর জন্য শাখা খোলার অনুমোদন নিতে হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থির করে দেয় প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনবলের ছক ও সংখ্যা কী হবে।

বিদ্যালয় এক সামাজিক সত্ত্বা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজসহ প্রতি বিদ্যালয় এক সামাজিক সত্তা (social entity)। দেশে বিস্তৃত এসব প্রতিষ্ঠানের ভৌগলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ভিন্ন। শিশুর শিক্ষা মা-বাবা ও সমাজের কাছে বিশেষ আগ্রহ ও উদ্বেগের বিষয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব কার্যক্রমের জন্য বারাদ্দকৃত অর্থ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ও পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে নির্ধারিত বিধিবিধানের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়। নির্ধারিত নীতি-নিয়মের নমনীয় প্রয়োগের সুযোগ থাকা দরকার। এসব ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পর্যায়ে অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব প্রদানের বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

সরকার-সমাজ অংশীদারিত্ব: মাধ্যমিক শিক্ষা সেবার সামগ্রিক দায় সরকার গ্রহণ করেনি। তাই স্থানীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য এমপিও (মানথলি পে-অর্ডার) মারফত নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষকের মূল বেতন (ও আংশিক ভাতা) দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়, শিক্ষার্থী প্রদত্ত ফি ও স্থানীয় উদ্যোগে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগসহ বিদ্যালয়ের ব্যয় বহন করা হবে। এই ব্যবস্থাকে সরকার ও সমাজের (পাবলিক-প্রাইভেট/কমিউনিটি) সহযোগিতার একটি ভালো উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে এই সহযোগিতা বা অংশীদারিত্বের নিদর্শন অধিকাংশ বিদ্যালয়ে দেখা যায় না। প্রায় সকল এমপিওভুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষক জনবলের জন্য বহুলাংশে সরকারের উপর নির্ভরশীল। যেখানে বিদ্যালয় "অতিরিক্ত" বা "অতিথি শিক্ষক" নিয়োগ দেয়, এই শিক্ষকদেরকে "খণ্ডকালীন" পারিতোষিক দেওয়া হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন নন।

নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা: উপরন্তু, এমপিও মারফত সরকারি সহায়তার শর্ত অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষার বর্ষপঞ্জি, দৈনন্দিন পাঠের রুটিন (যেমন- বিদ্যালয়ে সব বিষয়ের জন্য ৪৫ মিনিটের পাঠ-পিরিয়ড) ইত্যাদি স্থির করে দেওয়া হয় উপর থেকে। মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও শিক্ষাবোর্ডের অভিন্ন নানা বিধি বিধানের বেড়াজালে দেশের বিদ্যালয় আবদ্ধ। স্থানীয় পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রয়োজনে বিদ্যালয় পর্যায়ে নমনীয়তার সুযোগ রাখা হয়নি। পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের কার্যকর প্রয়োগের উপায় ও সুযোগ প্রয়োজন।

ভবিষ্যতের ভাবনা: বর্তমানের স্বল্পসংখ্যক সরকারি বিদ্যালয় ও ৯৭ শতাংশ এমপিওভুক্ত বা বেসরকারি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাসেবার ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নের নানা দুর্বলতার সমাধান প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রসার বা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিভাজন কীভাবে হবে, তা বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মান ও ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক বলা যায় না। প্রাথমিক স্তরে জাতীয়করণের সুফল শিক্ষার্থীর অর্জনে এবং বৈষম্য নিরসনে প্রত্যাশিত মাত্রায় দেখা যাচ্ছে না। এসব প্রশ্ন বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রসারের ও ব্যবস্থাপনার ধরন স্থির করতে হবে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা: শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণকারী ও সহায়ক সংস্থাদের কার্যকারিতার সঙ্গে সফল ও কার্যকর বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিভিন্নভাবে যুক্ত। বিভিন্ন অধ্যায়ে এসব বিষয় সংক্রান্ত আলোচনার আলোকে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বর্তমান অধ্যায়ের পর্যালোচনা বিবেচনা করতে হবে।

৫.২ পর্যবেক্ষণ

কার্যকর বিদ্যালয় ও সফল শিক্ষার্থী সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষত বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। সামগ্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা (সিস্টেম) ব্যবস্থাপনার নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কথা। সরকারি ও বেসরকারি এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার ধরন ও সমস্যা এক নয়। যেহেতু সরকারি তত্ত্বাবধানে ৯৭ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত বা বেসরকারি, এগুলোর দুর্বলতা বা সমস্যায় বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য বিষয়:

- বিদ্যালয় পর্যায়ে দায়িত্বের পরিধি ও জবাবদিহি।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজের পরিধি ও সক্ষমতা
- প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা ও নেতৃত্ব

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার কার্যপরিধি এবং সক্ষমতা ও দায়িত্ব বন্টন বিদ্যালয়ের কার্যকলাপের ধরন ও লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। এসব প্রধান কার্যকলাপের মধ্যে আছে শিক্ষণ-শিখন ও সহ-শিক্ষাকার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, ভৌত ও আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা।

বিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব ও জবাবদিহি

প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে, সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি সব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে কেন্দ্রায়িত। শিক্ষক জনবল, শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম, সহ-শিক্ষাকার্যক্রম, অবকাঠামো, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় বিধি-বিধান ও নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব, বিশেষত কিছু স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষেত্রে, তা আরও সংকুচিত করা হয়েছে। যেমন- শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের নির্বাচন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-র হাতে ন্যস্ত হয়েছে। এটাকে অবশ্য যথার্থ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা, স্কুল ব্যবস্থাপক কমিটিতে রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি ও দায়বদ্ধতার ঘাটতির কারণে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব সংকীর্ণ হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় বিধিবিধান ও তত্ত্বাবধানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। তবে এর এক বিরূপ প্রভাব হচ্ছে যে পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষার্থী ও শিক্ষণ-শিখনের স্বার্থে বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকরা নিজেদের বিবেচনায় ও উদ্যোগে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী হন না। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি গঠন

ও কার্যপরিধি পুনর্বিবেচনা, প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অনুসরণের সঙ্গে ফল বা লক্ষ্য অর্জনে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজতে হবে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি

স্থানীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হলেও অভিভাবক ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে গঠিত ব্যবস্থাপক কমিটির ইতিহাস পুরোনো। এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ে এ ধারা চালু রেখে সরকার ও সমাজের সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয় স্বাধীন বাংলাদেশে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির অভিজ্ঞতা মোটেই সুখপ্রদ নয়। এর প্রধান কারণ দুষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব বলে চিহ্নিত। নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের স্থানীয় পর্যায়ে আধিপত্য ও দুর্নীতির ব্যাপকতা এজন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। আইন করে সংসদ সদস্যদের ব্যবস্থাপক কমিটির প্রধানের পদ গ্রহণ সীমিত করার চেষ্টা কার্যকর হয়নি। রাজনৈতিক প্রভাববলয় থেকে ব্যবস্থাপক কমিটিগুলোকে বের করা যায়নি। সম্প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্দেশে সকল বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি বাতিল করে উচ্চতর পদের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের কমিটি প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু আদালত এই নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। বর্তমানে জেলা ও উপজেলা প্রশাসকের হাতে এ দায়িত্ব অস্থায়ীভাবে ন্যস্ত করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অপপ্রভাব সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হবে মনে করার কারণ নেই। এ সমস্যা মোকাবেলায় তিন ধরনের পদক্ষেপ বিবেচিত হতে পারে- ব্যবস্থাপক কমিটি গঠনে শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগীদের প্রাধান্য দিতে হবে, কমিটি ও কমিটি প্রধানের কার্যপরিধি পুনর্বিবেচনা করে দুর্নীতির সুযোগ সীমিত করতে হবে এবং প্রধান শিক্ষকের মর্যাদা, দায়িত্ব ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি দিয়ে যোগ্য লোককে এ পদে নিয়োগ দিতে হবে।

প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব।

আগেই বলা হয়েছে বিদ্যালয় এক সামাজিক সত্তা যেখানে লক্ষ্য অর্জনে সফল হওয়ার জন্য সকল অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব এই নেতৃত্বদানের সকলকে সুসংহত (team-building) করার লক্ষ্য অর্জনের কাজে অনুপ্রাণিত করার। অথচ প্রায় সাতশত সরকারি বিদ্যালয়ের অধিকাংশেই প্রধান শিক্ষক নেই। দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্ত বা অস্থায়ী হিসেবে এই পদে দায়িত্ব পালন করছেন। বেসরকারি বা এমপিওভুক্ত স্কুলেরও এক বড় অংশে প্রধান শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত বা অস্থায়ী। সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক বা আইনি জটিলতায় ২০১৮ সালে সরকারের দায়িত্বে নেওয়া স্কুলগুলোতে প্রধান শিক্ষকের পদই সৃষ্টি করা হয়নি। অন্যগুলোতেও একই কারণে কোনো প্রধান শিক্ষক অবসরে যাওয়ার পর নতুন পদায়ন বা নিয়োগ হয়নি।

বিদ্যালয় পরিচালনায় এমন বিচ্যুতির প্রতিবিধানে কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। যোগ্য ও নেতৃত্বগুণসম্পন্ন প্রধান শিক্ষক যেমন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বসম্পন্ন হতে উৎসাহিত করতে পারেন, তেমনি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটিকেও তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে আগ্রহী করতে পারেন। বর্তমান কমিটির আর্থিক ও অন্যান্য সিদ্ধান্তে অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা কমিয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রদান শিক্ষককে সেসবের কিছু বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষা ও শিক্ষার্থীবান্ধব বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য শিক্ষা ও শিক্ষার্থীবান্ধব বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা। সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার নীতি ও বিধিবিধানের বিদ্যালয় স্তরে প্রয়োগে স্থানীয় পরিস্থিতি, পরিবেশ ও প্রয়োজন বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নমনীয়তার সুযোগ থাকতে হবে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার হতে পারে প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপক কমিটি ও শিক্ষক মন্ডলীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। এভাবে শিক্ষণ-শিখন ও সহ-শিক্ষাকার্যক্রম যথার্থভাবে সম্পন্ন হতে পারে। বিদ্যালয়ের উদ্যোগে নিরাময়মূলক পাঠদান ও স্কুলের আয়োজনে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত পাঠদান হতে পারে। বিদ্যালয় ও শ্রেণিক্ষকে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীবান্ধব করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অন্যান্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। অধ্যায় ২-এ শিক্ষক শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অনেকগুলোই বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের কাজটি হতে হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর ও প্রধান শিক্ষকের সমবেত প্রচেষ্টায়। তেমনি বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, শ্রেণিকক্ষ, খেলার মাঠ, বিশুদ্ধ পানি ও শৌচাগার ইত্যাদির পর্যাপ্ততা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বোপরি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, ভবন, শ্রেণিকক্ষ ও শৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা ও সামগ্রিকভাবে একটা সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখা শিশুর শিক্ষা অভিজ্ঞতার এক প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে মনোযোগের অভাব ও ঘাটতি স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়।

অধ্যায় ৩ এ বর্ণিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যথেষ্ট প্রয়োগ ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা ও সুযোগ সৃষ্টি ও নতুন শিক্ষকদের মেনটরিং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার অংশ হতে হবে।

অধ্যায় ৫ এ আলোচিত সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ, প্রাথমিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ও বিদ্যালয়ের নিজস্ব উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের উদ্যোগ বিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষককে নিতে হবে।

অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার এক জরুরি উপাদান হওয়া উচিত। বিদ্যালয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাৎসরিক বাজেট ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে অভিভাবকদের জানানো বিদ্যালয় কমিউনিটি সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে। স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশ

দুর্নীতি রোধের জন্য সহায়ক। শিশুর শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য অভিভাবকের সঙ্গে একক যোগাযোগের নিয়মিত সুযোগ থাকা দরকার।

৫.৩ সুপারিশমালা

আশু সুপারিশ

১. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি:

বেসরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও দায়িত্বের পরিধি উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন প্রয়োজন।

ক) কমিটি প্রধানের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। এর ব্যতিক্রম হতে পারে যদি এলাকায় সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে পাওয়া না যায়।

খ) নির্বাচিত জন প্রতিনিধি (সংসদ সদস্য বা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি) কমিটিতে সভাপতি হতে পারবেন না।

গ) কমিটির কার্যপরিধিতে পরিবর্তন আনতে হবে। কমিটি বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেট উন্নয়ন পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাপনাজনিত বড় সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেবে। অনুমোদিত বাজেট ও পরিকল্পনা অনুসারে এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়ের জন্য কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে। অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা ব্যয় প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরে হবে। আর্থিক ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য ব্যবস্থাপনাজনিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে ও স্বাক্ষরে সম্পন্ন হবে।

উপর্যুক্ত সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি সংক্রান্ত বিধি সংশোধন করতে হবে।

২. প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ ও যোগ্যতা:

ক) সরকারি ও এমপিওভুক্ত সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে।

খ) প্রধান শিক্ষকের নিয়োগের সিদ্ধান্তে শিক্ষণ-শিখন অভিজ্ঞতা ছাড়াও নেতৃত্বগুণ ও প্রশাসনিক যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

৩. বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখন উন্নয়নঃ

ক) প্রতি বিদ্যালয়ে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং এলাকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকদের বা অন্য বিশেষ সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা ও শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জনের মাত্রা যাচাই করতে হবে। এটি যাচাইয়ের ভিত্তিতে পরবর্তী এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত শিক্ষণ-শিখনের মান উন্নয়নের জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে।

খ) শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের নির্দেশিকায় বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বরাদ্দ পাঠ-সময় অনুযায়ী বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদানের পিরিয়ড বিন্যস্ত করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্য সকল বিষয়ের জন্য নির্ধারিত অভিন্ন ৪৫ মিনিটের পাঠদান পিরিয়ডে আবদ্ধ না থেকে একটি বিষয়ের জন্য এক সপ্তাহের মোট সময় ঠিক রেখে দিনের পাঠদান পিরিয়ড দীর্ঘতর করা যেতে পারে।

গ) পিছিয়ে থাকা শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের মধ্যে অতিরিক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এজন্য অভিভাবকদের থেকে প্রয়োজনে সীমিত ফি নেওয়া যেতে পারে এবং এ কাজে নিয়োজিত শিক্ষকদেরকে অতিরিক্ত পারিতোষিক দেওয়া যেতে পারে।

ঘ) সহ-শিক্ষাকার্যক্রমকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এটিকে বিদ্যালয় শিক্ষার অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখতে হবে। সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও শিল্পকলার কাজে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। নৈতিকতা, সহনশীলতা ও মূল্যবোধ চর্চার উপায় হতে পারে বিভিন্ন সহ-শিক্ষাকার্যক্রম। এজন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সময় নির্ধারণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ) শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিদ্যালয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতি শিক্ষককে নিজের পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করে পরিকল্পনা তৈরি করতে উৎসাহিত করতে হবে। নবনিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্যে মেন্টরিংয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেলা, আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। এজন্য উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।

চ) বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সহপাঠীদের সঙ্গে উপযুক্ত আচরণ ও আদান-প্রদান, পড়াশোনা সংক্রান্ত বা অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কাউন্সেলিং ও গাইডেন্সের দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

মধ্যময়োদি সুপারিশ

৪. বিদ্যালয় পর্যায়ে ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা: শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক ও অধিকতর বিকেন্দ্রায়নের আলোকে বিদ্যালয় স্তরে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্কের মূল ভিত্তি হবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতায় অর্জন কতখানি হলো সেটি। বর্তমানে বিধি বিধান ও নির্দেশনা কতখানি পালিত হলো তাতেই গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা দুর্নীতি ও দায় এড়ানোর সুযোগ তৈরি করে বিধি-কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা থেকে সরে গিয়ে ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে (অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য) বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. কমিউনিটির কাছে দায়বদ্ধতা: সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়কে কমিউনিটির কাছে দায়বদ্ধ হতে হবে। সে লক্ষ্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করা জরুরি। শিক্ষা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিটি বিদ্যালয় নাগরিক সেবা সনদের মাধ্যমে শিক্ষায় জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো যেতে পারে। স্থানীয় শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

৬. জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে স্বশাসিত বিদ্যালয়: ভবিষ্যতে মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বের পরিসর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং শাসন ও ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে বিকেন্দ্রায়িত হবে বলে অনুমান করা যায়। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। এসব পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি প্রতিষ্ঠান অনেকটা স্বায়ত্বশাসিত সত্তা হিসেবে পরিচালিত হবে। বিদ্যালয় তার অভিভাবক ও স্থানীয় কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। শিক্ষা ও শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত জাতীয় নীতির আলোকে পাঠদান ও শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যক্রম জনবল ও আর্থিক বিষয়ে বিদ্যালয় অধিকতর দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী হবে।

৫.৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব

এই প্রতিবেদনের সুপারিশমালার ব্যাপারে সরকারের সামগ্রিক সিদ্ধান্তের আলোকে সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের উপায় ও প্রক্রিয়া বিবেচনা করতে হবে। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানের এক্ষেত্রে ভূমিকা কী হবে তা বিবেচনা করতে হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে বিশেষভাবে শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ড, এনটিআরসিএ এবং আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভূমিকা থাকবে।

অধ্যায়

৬

মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক শাসন ও ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা প্রশাসনের লক্ষ্য হবে প্রতি শিশুর জন্য নিজ এলাকায় সহজগম্য ও মানসম্মত বিদ্যালয়।

৬.১ প্রেক্ষাপট

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রধান দুটি দিক- বিদ্যালয় পর্যায় ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা আলোচিত হয়েছে অধ্যায় ৬ - এ। এই অধ্যায়ে সামগ্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয় পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। ইউনেস্কোর এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে শিক্ষা শাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে বলা হয়েছে:

> শিক্ষাশাসন সম্বন্ধে ঐকমত্য তৈরির ক্ষেত্রে অন্তরায়ের মূলে আছে বিরাজমান আর্থসামাজিক বিভাজন, ক্ষমতার বিন্যাস এবং রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এসবের ফলে তিন সমান্তরাল শিক্ষা ধারার সহাবস্থান - স্থানীয় ভাষায় সাধারণ শিক্ষা, ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা এবং ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় (UNESCO, EFA Bangladesh National Review 2015)।

এই তিন ধারা এখনও বিদ্যমান এবং এর প্রভাব মাধ্যমিক শিক্ষায়ও দেখা যায়। আমাদের আলোচনার বিষয় প্রধানত বাংলা মাধ্যমের সরকার পরিচালিত বা সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা- ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত।

সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন পর্যালোচনা ও গবেষণার ভিত্তিতে সামগ্রিক শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগত কিছু দুর্বলতার কথা বলা যায়, যা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়পনায়ও বিদ্যমান। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার তিনটি একক বৈশিষ্ট্য:

- প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষা দুটি ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন। যার উদাহরণ পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে না।
- চার কোটি শিক্ষার্থী, দুই লাখের অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্তত পনেরো লাখ শিক্ষক- শিক্ষার এই বিশাল আয়োজনের ব্যবস্থাপনা ও শাসন অতি কেন্দ্রায়িত, যার তুলনা অন্য কোথাও দেখা যায় না।
- বাংলাদেশের শিক্ষার জন্য সরকারি বাজেটের ও জাতীয় উৎপাদনের আনুপাতিক বরাদ্দ পৃথিবীতে সম্ভবত সর্বনিম্ন।

শিক্ষা ব্যবস্থার এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মাধ্যমিক শিক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব রাখে।

মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব

প্রাথমিক শিক্ষার সমতূল্য মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের কোনো অঙ্গীকার নেই। সমগ্র শিক্ষাখাতের জন্য কোনো খাত পরিকল্পনা নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন সেবা হিসেবে এর প্রসারের কোনো রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা নেই। ঔপনিবেশিক আমলে চালু হওয়া স্থানীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কিছু সরকারি মঞ্জুরি (grants-in-aid) দেওয়ার ধারাই প্রসারিত আকারে এখনও চলছে। এটি এমপিও (monthly pay-order) নামে পরিচিত।

সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও এই স্তরের শিক্ষা অভিগম্যতা বৃদ্ধির কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রধান দুটি পদক্ষেপ হলো শিক্ষার্থী উপবৃত্তি ও বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ। ১৯৮২ সাল থেকে কন্যাশিশুদের জন্য উপবৃত্তি চালু হয়। ক্রমে তা সকল শিশুর জন্য প্রসারিত হয়। কিন্তু অনেকাংশে ব্যবস্থাপনা সমস্যার জন্য এবং বাজেটের সীমাবদ্ধতায় শিশুদের এক বড় অংশ এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। পাঠ্যবই প্রস্তুত করা ও বিতরণের ব্যবস্থাপনায় সমস্যা দেখা যায় (অধ্যায় ৫ এ আলোচিত)।

মাধ্যমিক শিক্ষার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নির্ধারণ, এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তৈরি এবং এই বর্ধিত দায়িত্ব যথার্থ পালনের জন্য ব্যবস্থাপনা ও শাসনে কী পরিবর্তন দরকার তা বিবেচনা করতে হবে।

ব্যবস্থাপনা সংস্কারের উদ্যোগ

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য ২০১৮ সালে চালু করা উপখাত কার্যক্রমে (Secondary Education Development Program-SEDP) শাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অর্জিতব্য ফল বর্ণিত হয় এভাবে - কার্যকর বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং প্রধান নীতিসংক্রান্ত প্রশ্নের দ্রুত সমাধান করে শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধি। এই সব প্রধান অর্জিতব্য ফলের অংশ হিসেবে পাঁচটি লক্ষ্য নির্ধারিত হয় - শক্তিশালী বিকেন্দ্রায়ন, যথার্থ ব্যবস্থাপনা তথ্যসংগ্রহ, শিক্ষক ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহি, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নত ও সমন্বিত খাত পরিকল্পনা এবং বেগবান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, এডুকেশন-সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম নিবিড় পরিবীক্ষণ ২০২০; আহমদ, একুশ শতকে বাংলাদেশ: শিক্ষার রূপান্তর, পৃ ৩০৭-৩০৯, প্রথমা, ২০২৩)।

২০২০ সালের নিবিড় পরিবীক্ষণে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যসূচি চালু থাকার কথা বলা হয়েছে এবং এগুলো থেকে ভালো ফল পাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পাবলিক পরীক্ষার ফল এবং বিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা সমন্ধে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধারণা থেকে এসব ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে বলে মেনে নেওয়া যায় না। বর্তমান কমিটির সরেজমিনে বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ বিভিন্ন অংশীজনের মতবিনিময় থেকে হতাশাজনক চিত্রই উঠে এসেছে। অন্যান্য অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে।

গত তিন দশকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে (যদিও এসবের ব্যয়ের সিংহভাগ সরকার বহন করে)। মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে এসব কার্যক্রমের মধ্যে আছে- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SESIP), সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড একসেস এনহানসমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP), টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (TQI), সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (SESP) এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (SEDP)| শিক্ষার মান, সমতাভিত্তিক সুযোগ, অন্তর্ভুক্তি ও ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এসব কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়।

পর্যবেক্ষকদের মতে এসব উদ্যোগ ছিল অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন, খন্ডিত ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরহিত - সমস্যার উপসর্গকে লক্ষ্য করে, মুল সমস্যা এড়িয়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের শুধু প্রশিক্ষণ কোর্সে নিয়ে আসলে ফল পাওয়া যায় না। যদি তাঁদের প্রয়োজনীয় মৌলিক যোগ্যতা না থাকে, আন্তরিকতা ও সততাসহ কাজ করার মানসিকতা না থাকে এবং তাঁদের দায়িত্ব পালনের পরিবেশ না থাকে। এই সব সমস্যা পরামশর্ক কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সহায়ক প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ করেছে। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে জনস্বার্থ ও শিক্ষার্থী স্বার্থ রক্ষা করার যে দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ও তৎপরতা দরকার তা অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এজন্য সুশাসন ও সুব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার যথার্থ মনোভঙ্গি নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তদাতারা এগোননি। সমস্যা উপলব্ধি করে, সুদূরপ্রসারী চিন্তা এবং জনকল্যাণ ও ন্যায়বোধের আদর্শ ধারণ করে অংশীজনদের অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দেখা যায়নি।

সফল ব্যবস্থাপনার জন্য যথার্থ সাংগঠনিক কাঠামো, যোগ্যকর্মী, উচ্চতম স্তরে উপযুক্ত নেতৃত্ব, এবং সামগ্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণায় বহুলাংশে একমত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশে এসব বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও কাজের এবং শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংক্রান্ত আলোচনা (অধ্যায় ৪ ও ৫) এই অধ্যায়ের সুপারিশের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

সাম্প্রতিক মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প লার্নিং একসেলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (LAISE) ২০২৩ থেকে ২০২৮ সাল মেয়াদের। এই প্রকল্পের তিনটি ফলাফল ক্ষেত্র হচ্ছে দ্রুত শিখন অগ্রগতি, প্রযুক্তির মাধ্যমে শিখন ক্ষতিপূরণ এবং বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা। শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত শিখন সহায়তার লক্ষ্যে স্বল্পব্যয়ের প্রযুক্তি উপকরণ দেওয়া হবে এবং ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের

আর্থিক সহায়তা ও কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। এসব পদক্ষেপকে সরকারের সামগ্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

লেইস প্রকল্পে শিক্ষার্থীর শিখন ফলে নিশানা করা হয়েছে। পিছিয়ে পড়ায় বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদেরকে লক্ষ্য করে নির্ধারিত কার্যকলাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় এই কার্যকলাপ সফল হতে পারে যখন বিদ্যালয়ে সামগ্রিক পরিবেশ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদান ঠিক থাকে এবং শিক্ষক ও অন্য শিক্ষাকর্মীরা আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করেন। এই সব শর্ত পূরণ না হলে প্রকল্পের কাজগুলো বিচ্ছিন্ন, খন্ডিত ও অফলপ্রসু পদক্ষেপে পরিণত হতে পারে।

৬.২ পর্যবেক্ষণ

প্রধান অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় ও সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার শাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছু পর্যালোচনা এখানে তুলে ধরা হলো। বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার চরিত্র ও সমস্যা সংক্রান্ত কিছু প্রধান বিষয়ের অবতারণা এখানে করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসারিত দায়িত্ব ও বিদ্যালয় শিক্ষাকে আরও বেশি সমতাভিত্তিক ও একুশ শতকের জন্য প্রাসঙ্গিক করার লক্ষ্যে শাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় রূপান্তরের কথাও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন-কাঠামোর চূড়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত এই বিভাগের প্রধান সরকারের সচিব। মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্বাহী এবং নিয়ন্ত্রণকারী স্বত্তা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) এবং সরকারি-বেসরকারি ডিগ্রি কলেজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অধিদপ্তরের। অধিদপ্তরের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা শাখা ভিন্ন অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হওয়ার প্রস্তাব আলোচিত হচ্ছে। মাঠপর্যায়ে অধিদপ্তরের মাধ্যমিক শিক্ষা শাখার কর্মকর্তা ও দপ্তর আছে - নয়টি আঞ্চলিক দপ্তর (এর প্রধান ডেপুটি ডিরেক্টর), ৬৪টি জেলা মাধ্যমিক দপ্তর (জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নেতৃত্বে) এবং প্রায় ৪৯৫টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর (উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নেতৃত্বে)। এইসব দপ্তর অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরের। প্রতিটিতে আছেন তিন থেকে চার কর্মমকর্তা। আমাদের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে অধিকাংশ দপ্তরে অনেক শূন্যপদ রয়েছে এবং দপ্তর প্রধানের দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা একই কর্মকর্তা একাধিক দপ্তরের দায়িত্বে। দেশের বিশ সহস্রাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যার তুলনায় অনুমোদিত পদ যথেষ্ট নয়। এগুলোর মধ্যেও অনেক শূন্যপদ থাকায়

মাঠপর্যায়ে আঞ্চলিক দপ্তর থেকে উপজেলা পর্যন্ত কর্মকর্তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা ও দায়িত্বকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলা যায় না।

মাথাভারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

মাথাভারি (top-down) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া শিক্ষাসহ সকল সরকারি কার্যকলাপে প্রচলিত সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। সব সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার চেষ্টা এই সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

নীতিগতভাবে মন্ত্রণালয়ের কাজ নীতি-নির্ধারণ, সার্বিক পরিকল্পনা, সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রধান জনস্বার্থ বিষয়ের বিবেচনা। অধিদপ্তর তার মাঠ পর্যায়ের শাখার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার নির্বাহী দায়িত্ব পালন করার কথা। শিক্ষার প্রকৃত কাজটি হয় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তাই অধিদপ্তর ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব বিদ্যালয়ের কাজ কার্যকরভাবে চলার জন্য সহায়তা করা। বাস্তবে মন্ত্রণালয় তার কাজ নীতি নির্ধারণ ও সামগ্রিক তত্ত্বধানে সীমিত না রেখে অনেক নির্বাহী সিদ্ধান্তে যুক্ত হয়, যা অধিদপ্তরে সম্পন্ন হতে পারে। অন্যদিকে মাঠপর্যায়ে যে সব সিদ্ধান্ত হতে পারে তা অধিদপ্তরের হাতে রেখে দেওয়া হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিধিবদ্ধ কার্যপরিধির বাইরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সম্মতি খোঁজে। প্রচলিত রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগের সংস্কৃতি এই আচরণকে উৎসাহিত করে।

মূল প্রশাসনিক নির্বাহী কাঠামো ছাড়াও আছে বিভিন্ন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান। যেমন- আঞ্চলিক শিক্ষাবোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ইত্যাদি (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য)। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি আইনদ্বারা স্বশাসিত বলে বর্ণিত হলেও এ সবের অনেক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় মন্ত্রণালয়ে। কার্যপরিকল্পনা ও সামগ্রিক আর্থিক অনুমোদনের পরও পরিচালনাগত সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মতির অপেক্ষায় থেমে থাকে। বিদ্যমান মাথাভারি ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। সবরকম সিদ্ধান্ত ও কাজের বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা এক বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অতি ব্যস্ততায় ও কাজের চাপে থাকেন, ফলে তাঁদের আসল কাজ - সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, নীতি পর্যালোচনা ও নির্ধারণ ব্যাহত হয়। উচ্চতর কর্মকর্তাদের অতি ব্যস্ততার সুফল বিদ্যালয় পর্যায়ে দেখা যায় না। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে দূরবর্তী এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজন যথার্থ বিবেচিত হয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক পরিণতি সম্ভবত ওপর থেকে আসা সিদ্ধান্তের দায় বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তারা নেন না। আন্তরিক ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগুলোকে সফল করার সংকল্প বাস্তবায়নকারী শিক্ষাকর্মীদের থাকে না। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহির অভাব এসব কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনবল দুর্বলতা

জনবলের অপ্রতুলতা, ঠিক কাজে ঠিক লোকের পদায়ন না হওয়া, এবং নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সঙ্গে কর্তব্য পালনের পরিবেশ না থাকা ও সফল কাজের জন্য শর্তপূরণ না হওয়া আলোচিত হয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অধ্যায়ে (অধ্যায় ৩)। কমিটির মতবিনিময় ও সরেজমিনে পরিদর্শন থেকে ওঠে আসা কিছু কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণের দায়িত্বে থাকা উচ্চতম পদগুলোতে বর্তমান জনপ্রশাসন বিধানে শিক্ষাবিদদের পদায়নের সুযোগ নেই অথবা সীমিত। ঔপনিবেশিক আমলে প্রচলিত ধারা এখনও বিদ্যমান। বরং সেই সময়ে ইনডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস এবং মন্ত্রণালয়ে উচ্চ মর্যাদার শিক্ষা উপদেষ্টা নিয়োগের যে প্রচলন ছিল তাও এখন লোপ পেয়েছে। দক্ষিণপূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার শিক্ষায় উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষা প্রশাসন প্রধানত শিক্ষাবিদদের হাতে ন্যস্ত। এ বিষয়ে নীতি পরিবর্তন ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বিবেচনার দাবি রাখে।

অধিদপ্তর ও সহায়ক প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষা ক্যাডারের লোকেরা নিয়োজিত হলেও বর্তমান কাঠামোতে কলেজের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রশাসনের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্তরা এখানে সুযোগ পান না। অভিযোগ শোনা যায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনে নিযুক্ত কলেজ শিক্ষকরা মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা সমাধানে আগ্রহ দেখান না বা সেই সক্ষমতায় তাঁদের ঘাটতি রয়েছে।

একই সমস্যা আরও তীব্রভাবে বিদ্যমান মাধ্যমিক শিক্ষার সহায়তায় ও নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহে। যেমন- শিক্ষাবোর্ড, শিক্ষক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও এনটিআরসিএ-তে। সর্বত্র এখন চালু আছে ডেপুটেশন সংস্কৃতি। শিক্ষা ক্যাডারের উচ্চতর পদের অর্থাৎ মূলত কলেজ শিক্ষকদের যে কাউকে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়; যদিও তারা আদতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন। এই ব্যক্তিরা নতুন পদে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আগেই বদলি হয়ে অন্য পদে চলে যেতে পারেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগ্রহ ও প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত ব্যক্তিদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে দীর্ঘকাল বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে থাকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকে পদোন্নতি ও উচ্চতর মর্যাদা পাওয়ার সুযোগ থাকা দরকার। বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এই পদক্ষেপ জরুরি।

প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহে বিভিন্ন রকম দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই সব কার্যসূচির কারিকুলাম ও লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একাডেমিক কোর্স বা প্রশিক্ষণের বিষয় বিবেচনা করে নিয়োগ বা পদায়ন হয় না। প্রধান ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নায়েমেও এই সমস্যা বিদ্যমান। একদিকে অপ্রতুল জনবল, অন্যদিকে বিষয় অনুযায়ী শিক্ষকের অভাব। পেশাগত শিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান ও কার্যকারিতা এ কারণে ব্যাহত হচ্ছে (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য)।

মাঠপর্যায়ের সমস্যা

মাঠপর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন অর্থাৎ অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় বিদ্যালয়ের ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট সংখ্যক পদ এখন নেই। তাঁদের বিদ্যালয়-তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষা-পরামর্শক হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য যথেষ্ট পেশাগত প্রস্তুতি নেই। মাঠ পর্যায়ে তাঁদের পদোন্নতি ও পদায়নের যথেষ্ট সুযোগ নেই। সহকারী উপজেলা সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ পেয়ে এই পদ থেকে অনেকে অবসরে যান। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে এ ধরনের স্বীকৃতি ও প্রণোদনার অভাব কোনোভাবেই সহায়ক হতে পারে না (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য)।

ব্যবস্থাপনা সমন্বয়

অতি কেন্দ্রায়িত ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতিতে বিদ্যমান ব্যবস্থার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বা বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এসবের জন্য পরিপত্র বা নির্দেশ জারি করে বিদ্যালয়ে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করতে বলা হয়। ওপর থেকে আসা এইসব কাজের নির্দেশ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যসূচিতে কী প্রভাব ফেলে বা এর একটা আরেকটার সঙ্গে সামঞ্জসপূর্ণ কিনা তা যথেষ্ট বিবেচনা করা হয় না।

শিক্ষাবোর্ড থেকে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এই সব পরীক্ষার কারণে বছরে অন্তত দুই মাস বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যসূচি ব্যাহত হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে অথবা নিয়মিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দুর্বলতা নানাভাবে প্রকাশ পায়। বিদ্যালয়ের ও শিক্ষাকর্মীদের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকার বিবেচনার ও পরিকল্পনার যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই। প্রশিক্ষণের প্রয়োজন যাচাই, প্রার্থী নির্বাচন, সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনার এবং বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের ফলাফল নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এলাকা অনুযায়ী বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত সহযোগিতার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বা চর্চা দেখা যায় না। কারিকুলাম ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংস্কারে বিদ্যালয়ের পরিবেশ,

শিক্ষকদের সক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রস্তুতির ব্যাপারে সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার অভাব দেখা গেছে। এই কারণে সংস্কার উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সর্বস্তরে প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন জনবলের অভাব, সহযোগিতা ও সমন্বিত উদ্যোগ সহকারে কাজ করার সংস্কৃতির অভাব, এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্তগ্রহণে অনীহা ও ঊর্ধ্বতন স্তরের সম্মতির অপেক্ষায় থাকার প্রবণতা, ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি তৈরি না হওয়া - এসব কারণে প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার চর্চা গড়ে উঠেনি। এই জন্য প্রতিষ্ঠানে ও কর্মকর্তাদের মধ্যে অনুকূল মানসিকতা গড়ে উঠেনি।

দীর্ঘদিনের অভ্যাসপ্রসূত আচরণ ও মানসিকতার পরিবর্তন সহজে হয় না। পরিবর্তন বা রূপান্তরের জন্য বিশেষ কৌশল গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান শিক্ষা শাসন কাঠামোর মধ্যে অঞ্চল পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা দপ্তর, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, এলাকার সরকারি ও মানসম্মত বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইনস্টিটিউটকে যুক্ত করে প্রতি আঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হবে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এলাকায় বিদ্যালয়ের মান যাচাই ও উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর এই উদ্যোগকে নীতিগত সমর্থন দিয়ে ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে উৎসাহিত করতে পারে। কার্যসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন প্রধানত আঞ্চলিক উদ্যোগের অংশীদারদের হাতে রাখতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষার সম্ভাব্য ব্যাপকতর পরিবর্তনের আলোকে নতুন রূপান্তরের রূপকল্প থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

অবকাঠামো ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রতি প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত সম্পদ, অবকাঠামো ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয় স্তরে আরও দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। আঞ্চলিক উন্নয়ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ ব্যাপারে সহায়তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট নিজেদের পরিকল্পনা ও ডিজাইনের আলোকে বিদ্যালয়কে নিজস্ব অবকাঠামো পরিকল্পনাতে যুক্ত হতে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সরকার ও স্থানীয় সমাজের সহযোগিতায় হতে পারে। ম্যাচিং গ্রান্ট (matching grant) ফরমুলা কাজে লাগানো যেতে পারে, অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে অবকাঠামোর জন্য অর্থ সংগৃহীত হলে সরকার সমপরিমাণ বা আরও বেশি পরিপুরক অর্থ সাহায্য দিতে পারে।

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ভাণ্ডার ও উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার

বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে পূর্ণাঙ্গ, ধারাবাহিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যের ঘাটতি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বোর্ড ও দপ্তর থেকে সংগৃহীত তথ্য অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ কিংবা পরস্পরবিরোধী হওয়ায় কার্যকর নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যাহত হয়। নিয়মিত হালনাগাদ তথ্যের অভাব, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দুর্বল কাঠামো, সীমিত ডিজিটালাইজেশন এবং দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি এই সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর ফলে শিক্ষার গুণগত মান মূল্যায়ন, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার নিরূপণ, শিক্ষক চাহিদা নির্ধারণ, শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ ও সম্পদের কার্যকর বণ্টন যথাযথভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত, নির্ভরযোগ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা তথ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। নীতিনির্ধারণকে আরও কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক করতে জাতীয় ব্যবস্থার সঙ্গে পদ্ধতিগত শিক্ষা তথ্য সংযুক্ত করতে হবে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য জনসাধারণের জন্য প্রমাণভিত্তিকভাবে উন্মুক্ত রাখতে হবে। এতে গভীর বিশ্লেষণ, জাতীয় পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা প্রক্রিয়া শক্তিশালী হবে এবং শিক্ষার অগ্রগতির সূচক অনুসরণ করে নীতিগত অগ্রাধিকার নির্ধারণ সহজ হবে। একই সঙ্গে শিক্ষা থিঙ্কট্যাঙ্ক, শিক্ষক ইউনিয়ন ও নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলোর জন্য শিক্ষা তথ্যের নিয়মিত ও উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষা বিষয়ে সিধান্ত গ্রহণে তথ্যভিত্তিক জনসম্পৃক্ততা জোরদার হয়। এই সব ক্ষেত্রে ব্যানবেইস -এর বিশেষ ভূমিকা আছে (অধ্যায় ৫, দ্রষ্টব্য)।

শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং খাত পরিকল্পনা

বর্তমানে শিক্ষার জন্য কোনো খাতভিত্তিক পরিকল্পনা নেই এবং এর অংশ হিসেবে মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ উপখাত পরিকল্পনাও নেই। যথার্থ ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংস্কারের স্বরূপ ও লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা উপখাত পরিকল্পনা বাঞ্ছনীয় (যা সামগ্রিক শিক্ষাখাত পরিকল্পনার অংশ হবে)। গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন (GPE) ও ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ২০২০ সালে বাংলাদেশে এক শিক্ষা খাত পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। দুই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মতিতে এক কর্মদল নিয়োগ দিয়ে শিক্ষাখাত বিশ্লেষণ ও এক শিক্ষাখাত পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রীর স্বাক্ষরে এই খসড়া খাত পরিকল্পনা জিপিইর কাছে পাঠানো হয়েছিল, যা এখনও জিপিইর ওয়েবসাইটে আছে (Educaiton Sector Plan 2020-25, Bangladesh.globalpartnership.org)| এই খসড়া পরিকল্পনা সরকার ও শিক্ষাকর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত করে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেয়নি। শিক্ষাসংস্কারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতার ও নেতৃত্বের দুর্বলতার এটি আরেক উদাহরণ।

খসড়া শিক্ষাখাত পরিকল্পনা সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রধান ফলাফল এবং ফলপ্রাপ্তির জন্য কর্মতালিকা এবং অন্তর্বর্তী ফল বর্ণিত হয়েছে। প্রধান ছয়টি নির্দিষ্ট ফলাফলের মধ্যে ছিল-

১. কার্যকর ও বিকেন্দ্রায়িত শিক্ষা শাসন- জেলা, উপজেলা ও ক্রমে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রশাসনিক, আর্থিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও সক্ষমতার সম্প্রসারণ।
২. প্রতি উপখাতে পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করা এবং এজন্য সমন্বয়, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের দক্ষতাবৃদ্ধি।
৩. সরকারি অর্থায়নের পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণ- মান, সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।
৪. প্রধান নীতিগত উদ্দেশ্যে অগ্রধিকারভিত্তিক নীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া চালু করা।
৫. সংগঠন ও ব্যক্তি পর্যায়ে নেতৃত্ব, কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়নে মনোযোগ।
৬. শিক্ষাশাসন ও ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি (GPE 2020, Education Sector Plan, Bangladesh Ch. 5) ।

শিক্ষাখাত পরিকল্পনা এ পর্যন্ত তৈরি করে চালু না হওয়ায় এজন্য সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনা থেকে বলা যায়, শিক্ষাখাত পরিকল্পনা ও উপখাতভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বিতভাবে সামগ্রিক লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা ও বাস্তবায়ন এখনো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক (আহমদ, একুশ শতকে বাংলাদেশ: শিক্ষার রূপান্তর, ২০২৩, পৃ: ৩১৬-৩১৭)।

সহায়ক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের আলোকে পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় ৭ - এ সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সে আলোচনায় কয়েকটি প্রধান সমস্যা উঠে এসেছে, যা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এইসব কিছু বিষয় ওপরে আলোচিত হয়েছে। নিচে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কিছু সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলো।

খণ্ডিত, সমন্বয়হীন এবং অতি কেন্দ্রায়িত ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কাজ করছে। একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে আরেকটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় দুর্বল। উদাহরণস্বরূপ: এনসিটিবি শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ করলেও শিক্ষাক্রম বিস্তরণ, বাস্তবায়ন এবং পরীক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এর সমন্বয়ে অভাব দেখা যায়। এমনকি এনসিটিবি'র প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের সমন্বয় দুর্বল। একইভাবে শিক্ষক প্রস্তুতির

জন্য নিয়োজিত টিটিসির মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক, জেলা বা উপজেলা অফিসগুলোর সাথে, যারা মনিটরিং-এর কাজ করে থাকেন, তেমন কার্যকর সংযোগ নেই। এরকম সমন্বয়হীনতা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই রয়েছে (অধ্যায় ৭ দ্রষ্টব্য)। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা উন্নয়ন কাজগুলোও সমন্বিত সেক্টর ও সাব-সেক্টর পরিকল্পনার আওতায় না হয়ে খণ্ডিতভাবে নানা প্রজেক্টের আওতায় হচ্ছে; ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না হয়ে খণ্ডিতভাবে হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে অফিস আদেশ বা নোটিশ আকারে সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বা কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে, যা প্রায়ই মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায় না।

শিক্ষাখাতভিত্তিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উপখাতভিত্তিক পরিকল্পনা করে তার আলোকে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমকে ঢেলে সাজাতে হবে। বিচ্ছিন্ন এবং খন্ডিত উদ্যোগের বদলে সামগ্রিক শিক্ষাখাতকেন্দ্রিক পরিকল্পনার আলোকে কোন প্রতিষ্ঠানের কী ভূমিকা হবে, প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে কীভাবে তথ্যের আদান-প্রদান, সমন্বয় এবং যৌথ পরিকল্পনা করবে তার রূপরেখা বা কাঠামো তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয় সেল বা ইউনিট তৈরি করা যেতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোর প্রাসঙ্গিকতা, মান এবং গতি বাড়ানোর জন্য বিকেন্দ্রায়নের দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলো এলাকাভিত্তিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন তদারকিতে ভূমিকা রাখতে পারে। প্রয়োজনে বিকেন্দ্রায়নের একটি মডেল তৈরি করে স্বল্প বা মধ্যমেয়াদে তার পাইলটিং করা যেতে পারে। পরবর্তীতে পাইলটিং-এর ফলাফলের ভিত্তিতে মডেলটি পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে দেশব্যাপী প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শিখন উন্নয়নের পরিবর্তে মনোযোগের কেন্দ্র প্রশাসনিক এবং রুটিন কাজ

প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব কার্যক্ষেত্র অনুযায়ী প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনাগত এবং রুটিন কাজে মনোযোগ দেয়। কিন্তু এই কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীর শিখন-উন্নয়নের সংযোগ ঘটানোতে মনোযোগ কম। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা বোর্ডগুলো পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত অনেক তথ্য পেয়ে থাকে; কিন্তু এই ফলগুলো নিয়ে গবেষণা, অঞ্চলভিত্তিক শিখন ঘাটতি নির্ণয় এবং শিখন উন্নয়নের পরিকল্পনার কাজে লাগানো হয় না। অনুরূপভাবে টিটিসিগুলো যে প্রশিক্ষণ দেয়, শ্রেণিকক্ষে তার বাস্তবায়ন কীভাবে হবে এবং এ লক্ষ্যে টিটিসি এবং মাধ্যমিক শিক্ষার আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা অফিস, শিক্ষাবোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান কীভাবে একসাথে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে উদ্যোগ নেই। জেলা এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কাজেও শিক্ষণ-শিখন সংক্রান্ত মনিটরিং এবং মেন্টরিং-এর চেয়ে প্রশাসনিক বা রুটিন পরিদর্শনের দিকটি অনেকাংশে গুরুত্ব পায়। বিষয়টি অনেকটা দৃষ্টিহীনের হাতি দেখার মতো। প্রতিষ্ঠানগুলো যে যার মতো কাজ করছে; কিন্তু কীভাবে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর শিখনকে কেন্দ্রে রেখে নিজেদের কার্যক্রমকে সাজানো যায়, সেই দিকটি অনেকটাই অনুপস্থিত।

প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষায়িত কাজের ধরন এবং বহুমাত্রিকতা যাই হোক না কেন, এদের কাজ এবং মনোযোগের কেন্দ্রে থাকবে সব শিক্ষার্থীর সমতাভিত্তিক এবং মানসম্মত শিখনকে নিশ্চিত করা। প্রশাসনিক এবং রুটিন কাজের ভিড়ে যেন শিক্ষার্থীর শিখনের দিকটি থেকে মনোযোগ সরে না যায় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে মানসম্মত শিখনের সংযোগ স্থাপন করা দরকার। সামগ্রিক শিক্ষাখাত এবং মাধ্যমিক উপখাতভিত্তিক পরিকল্পনার আলোকে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের 'থিওরি অফ চেইঞ্জ' বা 'লজিক মডেল' তৈরি করে এর সব কার্যক্রম কীভাবে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করবে তার সুস্পষ্ট ম্যাপিং থাকতে হবে। যেমন- শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য কীভাবে এলাকাভিত্তিক শিখন মানোন্নয়নের কাজে লাগানো হবে সে বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন জরুরি। একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার জেলা এবং উপজেলা অফিসগুলোর মনিটরিং কার্যক্রম কীভাবে শ্রেণিকক্ষে শিখন নিশ্চিত করবে সে বিষয়ক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং তার জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকতে হবে। পাশাপাশি শিখন উন্নয়নের পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো একসাথে কাজ করার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। এই কাজগুলো নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে বিদ্যমান বিধি-বিধান, জনবল কাঠামো বা প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন পুনর্নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আর্থিক এবং অন্যান্য রিসোর্স প্রদান করতে হবে।

পর্যাপ্ত এবং বিশেষায়িত জনবলের অভাব

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজনমাফিক জনবলের অভাব রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষায়িত প্রকৃতির হলেও বিদ্যমান জনবলের প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের একটি প্রধান কাজ হলেও কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে একাডেমিক প্রস্তুতি এবং অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রেষণের মাধ্যমে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে; তাঁরা তাদের নিজেদের বিষয়ে দক্ষ হলেও প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বিশেষায়িত কাজে একাডেমিক প্রস্তুতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন না। উদাহরণস্বরূপ: এনসিটিবি-তে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবোর্ডে মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, নায়েমে প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, ব্যানবেইসে শিক্ষা তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য বিশেষজ্ঞ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের যে সব কর্মকর্তা মনিটরিং করেন তাঁদের অনেকের পেডাগজি বিষয়ে একাডেমিক প্রস্তুতি নেই।

প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবলের ঘাটতি নির্ণয় করে আশু জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে। একইসাথে বর্তমানে প্রেষণে থাকা পেশাজীবীদের জন্য আশু প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তবে যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষায়িত প্রকৃতির, মধ্যমেয়াদে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ডেপুটেশন বা প্রেষণে নিয়োগের বদলে পেডাগজি বা শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে একাডেমিক ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৪টি সরকারি টিটিসি-তে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে চার বছরের সম্মান ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। এসব ডিগ্রিধারী ব্যক্তিগণ বিষয়ভিত্তিক (যেমন: ভাষা শিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি) পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষণ-শিখন, পরিমাপ ও মূল্যায়ন, শিক্ষাক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষানীতি, প্রশাসন ও নেতৃত্ব, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করে থাকে। এসব বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা যেমন- এমএড, এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানও করা হয় (উদাহরণস্বরূপ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে)।

অদক্ষতা এবং দুর্নীতি

মাঠ পর্যায়ের মতবিনিময় সভায় প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্যালোচনায় দেখা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানের কাজের বিষয়ে অদক্ষতা, দীর্ঘসূত্রিতা এবং হয়রানির অভিযোগ রয়েছে। বদলি, পদোন্নতি, এমপিওভুক্তি, অডিট, বিদ্যালয় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা, পাঠদান অনুমতি ও স্বীকৃতি নবায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, অবসর ও কল্যাণ সুবিধাসহ প্রায় অধিকাংশ কাজ এবং সেবার ক্ষেত্রেই দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগগুলো কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত (টিআইবি, ২০২১)।

ভবিষ্যতের ভাবনা

সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা, অর্থ ও জনবল ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান অপরিহার্য। এভাবে প্রতি এলাকায় সকল শিশুর জন্য গ্রহণযোগ্য মানের মাধ্যমিক বিদ্যালয় অভিগম্য করা সম্ভব হবে। স্থানীয় প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য এলাকাভিত্তিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে, যা সামগ্রিক প্রশাসন কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ‘জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ’ হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বলা যায়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণের একমাত্র উপায় সব প্রতিষ্ঠান ও কর্মীর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা নয়। এই বন্দোবস্তের প্রত্যাশিত সুফল প্রাথমিক শিক্ষায় পাওয়া যায়নি। এর বিকল্প হতে পারে বিদ্যালয়ের অধিকতর স্থানীয় দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা এবং স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং জন অংশগ্রহণ শক্তিশালী হবে। তবে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মর্যাদা, বেতন ও পেশাগত মান বজায় রাখার জন্য সরকার সারাদেশে সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৬.৩ সুপারিশমালা

বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে অধ্যায় ৫-এ সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে সামগ্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় প্রধান সংস্কারের বিষয়ে করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, বিভিন্ন স্তরে জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও সিস্টেমের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন সহায়ক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ও ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্য সাধন, ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা - এসব বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে সামগ্রিক শিক্ষার রূপান্তরের আলোকে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা ও শাসনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়ের কথা বলা হয়েছে।

আশু সুপারিশ

১. কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা:

ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান নীতিনির্ধারণী ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের উদ্দেশ্যে নির্বাহী কাজের দায়িত্ব যথাসম্ভব অধিদপ্তর ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরে অনতিবিলম্বে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এজন্য সদিচ্ছাসহ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

খ) মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ভিন্ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে কার্যকর হওয়া উচিত। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে এই অধিদপ্তরের। এই অধিদপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকবে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে।

২. জনবল ও সক্ষমতা:

ক) আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বর্তমান শূন্যপদে স্থায়ী পদায়ন দিয়ে পূরণ করার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) সরকারি ও এমপিওভূক্ত সকল বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের ও স্থায়ী পদায়নের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) বিশেষায়িত ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানের জন্য জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ এবং বিদ্যালয় স্তরে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব পূরণে আশুকরণীয় বিষয়ে (অধ্যায় তিন ও পাঁচে লিপিবদ্ধ) বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে অতি সত্বর উদ্যোগ নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং সংস্কার বাস্তবায়নে দ্রুত অগ্রগতির জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের নেতৃত্বে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়ে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন টাস্কফোর্স গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

ঘ) মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতমপদসমূহে পেশাগতভাবে শিক্ষায় অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে উচ্চপদে প্রশাসন ও শিক্ষা ক্যাডারের মিশ্রণ হওয়া দরকার। উপখাতভিত্তিক উপদেষ্টা হিসেবে শিক্ষাবিদদের যুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এজন্য সমান্তরাল (lateral entry) নিয়োগের ব্যবস্থা থাকতে পারে।

মধ্যমেয়াদি সুপারিশ

৩. বিকেন্দ্রায়ন: বিকেন্দ্রায়ন ও মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব হস্তান্তরের সূচনা যা স্বল্প মেয়াদে হবে তা মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রসারের প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করতে হবে। বিকেন্দ্রায়িত ও জবাবদিহি ব্যবস্থাপনা সুসংহত করার জন্য জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনাগত ও নির্বাহী দায়িত্ব যথাসম্ভব আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা স্তরে হস্তান্তরের (delegation) উদ্যোগ নিতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরে জনবল ও সক্ষমতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনতিবিলম্বে শুরু করতে হবে।

৪. শিক্ষা জনবল ব্যবস্থাপনা: মাধ্যমিক শিক্ষার সম্ভাব্য প্রসারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে শিক্ষা জনবল বৃদ্ধি পাবে এবং এর ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যতীত অধিদপ্তরসহ সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় ও বিভিন্ন বিশেষায়িত ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানের কর্মীর যোগ্যতা নির্ধারণ, যোগ্যতার প্রত্যয়ন, ও নিয়োগ-পদায়ন-পদোন্নতির সুপারিশ একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা সার্ভিস কমিশনের হাতে ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ ও এনটিআরসিএ-র কাজ প্রস্তাবিত শিক্ষা সার্ভিস কমিশন করবে। আইন দ্বারা এই স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব, কর্মপরিধি ও গঠন নির্ধারিত হবে।

৫. শিক্ষাবিজ্ঞানে ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার: বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৪টি সরকারি টিটিসি-তে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে চার বছরের সম্মান এবং এক বছরের এমএড ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অফ এডুকেশন (সম্মান) এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এমএড ডিগ্রিধারীদের প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগগুলো স্থায়ী হতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ক্যারিয়ার অগ্রগতিপথ থাকতে হবে যাতে নিয়োগপ্রাপ্ত পেশাজীবীগণ এসব প্রতিষ্ঠানে অবদান রাখতে পারেন।

৬. অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন উদ্যোগ: মাধ্যমিক শিক্ষার আঞ্চলিক উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ও পরিপূরক হিসেবে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাপকতর বিকেন্দ্রায়নের উদ্দেশ্যে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। মধ্যমেয়াদে অন্তত: ১০টি জেলায় এই পাইলট শুরু করা যেতে পারে যা দীর্ঘমেয়াদে সারাদেশে বাস্তবায়ন করা যায়। এলাকাভিত্তিক প্রয়োজন ও পরিস্থিতি যাচাই করে প্রত্যেক শিশুর জন্য সহজে অভিগম্য

নির্দিষ্ট মানবিশিষ্ট বিদ্যালয় এবং এসবের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক, অবকাঠামো ও অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করা হবে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ-ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য।

৭. সামগ্রিক শিক্ষাখাত পরিকল্পনা: মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা অযৌক্তিক। মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত উপখাত উন্নয়ন সামগ্রিক শিক্ষাখাত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিবেচনা করে শিক্ষাখাত পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। শিক্ষাখাত পরিকল্পনার আওতায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক ব্যবস্থা হিসেবে এবং শিশুর অধিকার হিসেবে একই মন্ত্রণালয়ের এক্তিয়ারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

৮. অদক্ষতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ: অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্তরে তত্ত্বাবধান, নজরদারি ও জবাবদিহির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অভিযোগ দ্রুত ও সহজে দাখিলের জন্য একটি হটলাইনসহ অন্যান্য কার্যকর প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে বদলি বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে অভিযোগসমূহ যথানিয়মে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দায়ী ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

৯. উন্নত বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা: আশু ও মধ্যমেয়াদি বিভিন্ন সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যসূচির অগ্রগতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এগুলোকে সুসংহত করতে হবে। এগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এগুলোকে সারাদেশে বিস্তৃত করতে হবে। লক্ষ্য হবে শহর ও গ্রামের প্রতি এলাকায় উন্নত মানের বিদ্যালয় থাকবে ও প্রতি শিশু হবে এক সফল শিক্ষার্থী। দারিদ্র্য বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বা শিশুর বিশেষ প্রয়োজনজনিত কারণে কোনো শিশু গ্রহণযোগ্য মানের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না।

১০. মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব: সর্বজনীন মানসম্মত ও সমতাভিত্তিক মাধ্যমিক শিক্ষার সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। বেসরকারি শিক্ষা সেবা থাকবে, কিন্তু সে সুযোগ যারা গ্রহণ করবে না, তারাসহ সকল শিশুর জন্য রাষ্ট্র হবে শেষ অবলম্বন (provider of last resort)। এজন্য বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থাপনার নীতিতে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক শিক্ষা সেবার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে এবং সমগ্র বিদ্যালয় শিক্ষা একই মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

১১. স্থায়ী শিক্ষা কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা টাস্কফোর্স: মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন টাস্কফোর্স স্থায়ী সত্তায় পরিণত হবে। সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সামগ্রিক শিক্ষা উন্নয়নের পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনার জন্য স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠিত হলে মাধ্যমিক শিক্ষা টাস্কফোর্স বিদ্যালয় শিক্ষা উপখাত-সম্পৃক্ত বিষয়ে কমিশনের অঙ্গ হিসেবে কাজ করবে (২০২০ সালের খসড়া শিক্ষা খাত পরিকল্পনায় এরকম সুপারিশ করা হয়েছে)।

৬.৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব

মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের বিভিন্ন সুপারিশ বিবেচনা করে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা, পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা, ও তা বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক সত্তা গঠন করা প্রয়োজন। ওপরে সরাসরি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দায়ী এক মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন টাস্কফোর্স বা কর্মদল নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের নেতৃত্বে এই কর্মদলে থাকতে হবে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ ও সহকারী জনবল। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে কর্মদল কাজ করবে।

তথ্যসূত্র

Ministry of Education. (2020). *Education sector plan (ESP) for Bangladesh fiscal years 2020/21–2024/25*. Government of the People's Republic of Bangladesh. https://www.globalpartnership.org/node/document/download?file=document/file/2020-12-Bangladesh-ESP.pdf

Ministry of Primary and Mass Education. (2014). *EFA 2015 national review: Bangladesh*. UNESCO Digital Library. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230507

Transparency International Bangladesh. (2021). *Secondary education in Bangladesh: Challenges of good governance and ways forward (Executive summary)*. https://ti-bangladesh.org/images/2021/report/DSHE_Study_English_ES.pdf

আহমদ, এম. (২০২৩)। *একুশ শতকে বাংলাদেশ: শিক্ষার রূপান্তর*। প্রথমা প্রকাশন।

অধ্যায়

৭

সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান

শিক্ষাপ্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রক ও সহায়ক সংস্থার কৃতীর মানদন্ড - কার্যকর বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ এবং সফল শিক্ষার্থী।

৭.১ প্রেক্ষাপট

মাধ্যমিক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনায়, উন্নয়নে, তত্ত্বাবধানে ও লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নায়েম, ব্যানবেইস, টিটিসি, এনটিআরসিএ, বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড এবং শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট।

এই প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত বিশেষায়িত প্রকৃতির এবং এদের নিজস্ব কার্যক্ষেত্র ও জনবল রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রস্তুতি, শিক্ষণ-শিখনের মনিটরিং, শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন, আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষক কল্যাণ ইত্যাদি নানাবিধ কাজে নিয়োজিত। যেমন- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নীতিনির্ধারণী কাজ; মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর প্রধানত বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ইত্যাদি কাজ করে থাকে। টিটিসি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রস্তুতির কাজে নিয়োজিত। নায়েম শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা ছাড়াও নেতৃত্বগুণ এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রদান করা ছাড়াও বিদ্যালয়ের অনুমতি, রেজিস্ট্রেশন, শাখা অনুমোদন, সনদ সংশোধন, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন- ইত্যাদি নানাবিধ কাজ করে।। বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট মূল্যায়ন পদ্ধতি আধুনিক ও যুগোপোযোগী করার জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণমূলক কাজ করছে। এনসিটিবি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন; ব্যানবেইস শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ; এনটিআরসিএ বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্বে নিয়োজিত। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর বিদ্যালয়ের ইন্সপেকশন, অডিট ও তদন্ত করে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজ শিক্ষা সংক্রান্ত অবকাঠামো বিনির্মাণ। বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারি অবসর সুবিধা বোর্ড এবং শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বেসরকারি শিক্ষকদের অবসরজনিত এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের কাজে নিয়োজিত। এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনোটি শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করে; আবার কোনোটি সামগ্রিক বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে কাজ করে (যেমন- এনসিটিবি, ব্যানবেইস ইত্যাদি)।

তবে এসব প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কাজের ক্ষেত্র থাকলেও তাদের সামগ্রিক লক্ষ্য হলো মাধমিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখনের যেই কাজটি হয়, সেটিকে সহায়তা করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে যার যার কার্যক্ষেত্র থেকে দায়িত্ব পালন করাই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল কাজ। তবে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো পারস্পরিক সুসমন্বিতভাবে কাজ করছে কিনা সেটি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবল

কাঠামো, কর্মীদের বিশেষায়িত পেশাগত দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ইত্যাদির পর্যাপ্ততা এবং মান যথেষ্ট নয়। অদক্ষতা এবং দুর্নীতির অভিযোগও ব্যাপক। প্রতিষ্ঠাগুলো শিক্ষার উন্নয়নে রূপান্তরমূলক ভূমিকা পালনের বদলে প্রধানত রুটিন কাজ ও প্রক্রিয়াগত বিষয়ের উপর জোর দিয়ে স্থিতাবস্থা (status quo) বজায় রাখছে। অতি কেন্দ্রায়িত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো গতানুগতিক ও অসৃজনশীল চরিত্র ধারণ করেছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি, প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল কাঠামো, এবং দায়িত্ব, কর্তব্য বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া আছে। এই অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা এবং সীমাদ্ধতার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সবশেষে এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করে কিছু সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

৭.২ পর্যবেক্ষণ

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ (Secondary and Higher Education Division - SHED) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী, প্রশাসনিক ও তদারকি বিভাগ, যা দেশের মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, উন্নয়ন, পরিচালনা ও মানোন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে।

শিক্ষা প্রশাসনের সাথে সাধারণ প্রশাসনের পার্থক্য বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তির স্থায়িত্ব এবং নীতি ও সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা থাকা বাঞ্চনীয়। শিক্ষা যেহেতু শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করে যেখানে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ধারাবাহিকতা ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন, শিক্ষা প্রশাসনেও তাই যারা কাজ করবেন তাদের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষায়ণ, দীর্ঘ সময় ধরে মন্ত্রণালয়ে সেবা প্রদান করা প্রয়োজন। বর্তমান আমালাতান্ত্রিক কাঠামোতে সাধারণ প্রশাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ স্বল্প সময়ের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আসেন। দেখা যায়, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, চ্যালেঞ্জ এবং বাস্তবতা বুঝে উঠতে উঠতেই তারা বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যান। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নীতি ও সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। বিভাগের কাজের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর শিখন-উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি ও সিদ্ধান্তের চেয়ে রুটিন ও প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো জোর পায়।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের মনোযোগ প্রধানত প্রশাসনিক এবং পরিচালনাগত কার্যক্রমের দিকে কেন্দ্রীভূত থাকায়, যথাযথ নীতিনির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদানের কাজটি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি, বিদ্যমান জনবল কাঠামো মাধ্যমিক শিক্ষার নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনার চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের শিক্ষা বিষয়ে পেশাগত প্রস্তুতি এবং অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে। ফলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী আলোচনায় যথাযথ বিশ্লেষণমূলক অবদান রাখার ক্ষেত্রে নেতিবাচকভাবে প্রভাব পড়ছে। এছাড়া, কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রভাবে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী পর্যায়ের বাস্তব চ্যালেঞ্জ, স্থানিক বৈচিত্র্য এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনা যাচ্ছে না; ফলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্ব, পুনরাবৃত্তি এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০১৫-এ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে সব শিশুর জন্য অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক, এবং মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ সুস্পষ্ট ও পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি মূলত খণ্ডিত প্রকল্পভিত্তিক এবং পরিচালনামূলক কাজের দিকে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, দীর্ঘমেয়াদি নীতিনির্ধারণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে কৌশলগত পরিকল্পনার অনুপস্থিতি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতীতে ও বর্তমান সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও, এগুলো কোনো সামগ্রিক শিক্ষাখাত বা মাধ্যমিক উপখাতভিত্তিক পরিকল্পনার আলোকে সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত নয় (অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য)।

শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত মামলাজনিত দীর্ঘসূত্রিতা বিদ্যমান, যা শিক্ষার্থীদের শিখন পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এর ফলে অনেক বিদ্যালয়ে যথাসময়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না এবং শিখন অর্জন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও ঘাটতি আছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার নানা পর্যায়ের কর্মকর্তা, সরকারের নানা পর্যায় এবং বিশেষ করে বিচার বিভাগ এবং এটর্নি জেনারেলের অফিসের সাথে এডভোকেসি দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন; বর্তমানে এ বিষয়ক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ঘাটতি রয়েছে। পর্যালোচনায় আরও দেখা গেছে, শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পদোন্নতি, বদলিসহ নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে; যা মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী এবং তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রতি আস্থার অভাব ঘটছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (Directorate of Secondary and Higher Education - DSHE), সংক্ষেপে মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রধান বাস্তবায়নকারী ও তদারকি সংস্থা।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি, সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিষ্ঠান হলেও মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও মাঠ পর্যায়ের অংশীজনদের কাছ থেকে জানা যায়, এর কার্যক্রমে বিদ্যালয় শিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষা অবহেলিত; প্রধান মনোযোগ কলেজ শিক্ষায়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্থায়ী জনবলের বাইরের বাকি জনবল মূলত সরকারি কলেজ থেকে প্রেষণে আসেন; মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের পদায়নের উদাহরণ নেই বললেই চলে। এর ফলে অধিদপ্তরের কাজে মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগের অভাব দেখা যায়।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের মতো অধিদপ্তরের কার্যপ্রণালীও অতি মাত্রায় কেন্দ্রীভূত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায়ই মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল। ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার সমস্যা ও বাস্তবতা অনুযায়ী বিকেন্দ্রায়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে।

জনবলের অপর্যাপ্ততা এবং তাদের বিশেষায়িত দক্ষতার অভাব অধিদপ্তরের আরেকটি সীমাবদ্ধতা। আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা সব পর্যায়ে জনবলের অভাব রয়েছে। বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তার অনেক পদ খালি রয়েছে যা মাধ্যমিক শিক্ষার মনিটরিং ও সুপারভিশন কাজকে বাধাগ্রস্ত করছে। ভারপ্রাপ্ত বা অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে কোনো রকমে এসব কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে যা মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অন্তরায়। পরামর্শক কমিটি মাঠ পর্যায়ে যেসব জেলা এবং উপজেলা পরিদর্শন করেছে, তার প্রতিটিতেই এসব পদে অনেক শূন্যতা দেখা গেছে। এছাড়া অধিদপ্তরের জনবলের অনেকেরই বিশেষত কেন্দ্রীয় পর্যায়ে, শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষায়িত ডিগ্রি না থাকার ফলে শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মনিটরিং ও সুপারভিশনের কাজের মান রক্ষা হচ্ছে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, টিটিসি- ইত্যাদির সমন্বয়হীনতার কারণে একটি সুসমন্বিত ও দক্ষ সার্ভিস ডেলিভারি প্রদান সম্ভব হয়ে উঠছে না। এক প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্য প্রতিষ্ঠানের কাজে ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় না থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে উঠছে। এছাড়া বদলি, অবসর সুবিধাসহ নানাক্ষেত্রে কর্মীদের হয়রানি ও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়। পরামর্শক কমিটির পক্ষে এই অভিযোগগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি; তবে এই বিষয়টি যথেষ্ট মনোযোগের দাবি রাখে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী একটি স্বায়ত্তশাসিত ও স্ব-নিয়ন্ত্রক সংস্থা। শিক্ষা বোর্ডসমূহ মূলত পাবলিক পরিক্ষার আয়োজন করে এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তের অনুমোদনকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত বোর্ডগুলো ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার কারণে আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে গতিশীলতা ও মান বজায় রাখতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে; সেই সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপর অতিনির্ভরশীলতায় বোর্ডগুলোর স্বায়ত্তশাসনও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। অর্ডিন্যান্সে স্বায়ত্বশাসনের কথা থাকলেও এজন্য কোনো বিধিমালা তৈরি না হওয়ায় এবং কার্যপরিধি ও দায়িত্ব বণ্টন ইত্যাদি সুস্পষ্ট না হওয়ায় বোর্ডের যথার্থ দায়িত্বপালন ব্যাহত হচ্ছে।

বোর্ডগুলোকে বহুমুখী দায়িত্ব পালন করতে হয়; এছাড়াও শিক্ষার্থী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবার কারণেও বোর্ডগুলো কাজের চাপ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে অনুযায়ী জনবল কাঠামো হালনাগাদ না হওয়ায় কাজ সম্পাদনে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ: বরিশাল বোর্ডে অনুমোদিত জনবল ১৩৮, কিন্তু এর বর্তমানে কর্মরত মাত্র ৮০ জন। এছাড়াও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন ও ফলাফলভিত্তিক গবেষণার মতো বিশেষায়িত কাজে দক্ষ জনবলের তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে। সাংগঠনিকভাবে স্থায়ী কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থান দুর্নীতিকে উৎসাহিত করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়, যা দপ্তরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকে হুমকির মুখে ফেলছে। প্রেষণে নিয়োগকৃতদের সংশ্লিষ্ট দক্ষতা না থাকায় প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ ও নামমাত্র সম্মানীর কারণে যোগ্য পরীক্ষকরা কাজে উৎসাহ হারান, যা প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন কাজের মানকে ব্যাহত করছে।

বোর্ডগুলোর মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB), বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) ও স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের অভাব কার্যকর বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করে। পর্যাপ্ত কেন্দ্র না থাকায় স্কুলগুলোতে পরীক্ষাকেন্দ্র পড়ে যার ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ অটোমেশন বা ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু না হওয়ার কারণে দুর্নীর্তির সুযোগ তৈরি হচ্ছে ও প্রশাসনিক কাজে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কম্পিউটার সেলের সরঞ্জামাদি জরাজীর্ণ থাকা নির্ভুল ফলাফল প্রক্রিয়াকরণে বাধা সৃষ্টি করছে। বোর্ডগুলো তাদের নিজস্ব অধিক্ষেত্রের আঞ্চলিক শিক্ষা উন্নয়নেও কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সরকারি বিধি-বিধানের অনুসরণ, অর্থের সদ্ব্যবহার এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় থাকা প্রায় ৩৭,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অডিট, পরিদর্শন ও তদন্ত করার ক্ষেত্রে বর্তমানে জনবল সংকট বিরাজমান। বর্তমান জনবল এই বিশাল পরিসরের দায়িত্বের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এমনকি বিদ্যমান অনুমোদিত জনবলের বিপরীতেও শূন্যপদ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধিদপ্তরে ২০ জন অডিটর থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ১২ জন। অর্থ্যাৎ ৪০% অডিটরের পদ শূন্য রয়েছে। যারা অবসরে যাচ্ছেন, সেই শূন্যপদগুলোতে নিয়মিত নতুন নিয়োগ না হওয়ায় এই সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি বিশেষায়িত কাজের জন্য দক্ষ জনশক্তির তীব্র অভাব রয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম নিয়ে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগও রয়েছে। এছাড়া, একাডেমিক পরিদর্শনের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষা অফিসগুলোর সাথে ডিআইএ-এর সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়; যেখানে মাঠপর্যায়ে যোগাযোগ কেবল পরিদর্শনের বিষয়টি জানানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) ও ডিআইএ-এর মধ্যে কার্যকর তথ্য বিনিময় ও সমন্বিত কর্মপ্রক্রিয়ার ঘাটতি থাকায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সনদ যাচাই ও এমপিও সংক্রান্ত অনিয়ম তদন্তে অধিদপ্তরকে বিপুল সময় ও জনবল ব্যয় করতে হচ্ছে। এমপিও প্রদানের প্রক্রিয়াটি প্রশ্নবিদ্ধ এবং জাল সার্টিফিকেটের সমস্যা এতটাই প্রকট যে, গত এক বছরেই প্রায় ১১৭৬টি জাল সনদ শনাক্ত হয়েছে; এমনকি নিয়োগ ও এমপিওভুক্ত হওয়ার ১৫-১৬ বছর পরও সনদ জাল শনাক্ত হওয়ার মতো উদ্বেগজনক ঘটনাও ঘটছে। এই জালিয়াতি তদন্তে অধিদপ্তরের কর্মসময়ের একটি বিশাল অংশ ব্যয় হওয়ায় তাদের অডিট কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সর্বোপরি, একটি সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সফটওয়্যার সংক্রান্ত ও কারিগরি সীমাবদ্ধতাগুলো প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট ও ট্যাক্সের টাকা পেমেন্টসহ সার্বিক স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, উন্নয়ন ও সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (National Curriculum and Textbook Board - NCTB)।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরিমার্জন ও সরবরাহের জন্য আইনগতভাবে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কার্যক্রমে একাধিক কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও সক্ষমতা-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা দেখতে

পাওয়া যায়। ফলে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বর্তমানে এনসিটিবির কার্যক্রমের একটি বড় অংশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বিশেষ করে বছরের দ্বিতীয়ার্ধে এই কাজে প্রতিষ্ঠানটির অধিকাংশ সময় ও শ্রম দিতে হয়। তাই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের ধারাবাহিক উন্নয়ন, গবেষণাভিত্তিক পরিমার্জন এবং মান যাচাই কার্যক্রম পর্যাপ্ত গুরুত্ব ও সময় পায় না। যদিও শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি চলমান ও গতিশীল প্রক্রিয়া, বাস্তবে তা প্রকল্পভিত্তিক ও খণ্ডিত উদ্যোগে সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে।

এনসিটিবির দক্ষ ও বিশেষায়িত মানবসম্পদের ঘাটতি এর কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নের মতো জটিল ও কারিগরি কাজে নিয়োজিত পদগুলোতে মূলত সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রেষণের মাধ্যমে পদায়ন করা হয়। এদের অধিকাংশেরই শিক্ষাক্রম তৈরি কিংবা পাঠ্যপুস্তক লেখা ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। এমনকি নিয়োগ-পরবর্তী ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। ২০১৮ সালের এনসিটিবি আইনে নতুন চারটি উইং স্থাপন এবং কলেবর ও জনবল বৃদ্ধির জন্য মানবসম্পদ পুনর্গঠন ও বিশেষায়িত নিয়োগ কাঠামো প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হলেও, তা এখনও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এনসিটিবির অনুমোদিত ও বর্তমান জনবল কাঠামোতে মোট ৩১১টি পদের মধ্যে অনেকগুলো পদই শূন্য।

শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা, পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক চলমান প্রক্রিয়া হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এনসিটিবির বর্তমান কার্যক্রমে এর প্রতিফলন দেখা যায় না। এনসিটিবি কর্তৃক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব একটি অন্যতম বাধা হিসেবে দেখা দেয়। অধিকাংশ সময়ে পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়ার আগেই নতুন বা সংশোধিত শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই ধরনের ঘন ঘন ও আকস্মিক পরিবর্তন শিক্ষাক্রম ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতাকে ক্ষুণ্ন করে।

এনসিটিবি-র দেশের শিক্ষা উন্নয়নে একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় এনসিটিবির যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, মূল্যায়ন পদ্ধতি কিংবা শিক্ষার্থীদের শিখন ফলাফল নিয়ে নিয়মিত ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার পরিসর অত্যন্ত সীমিত। ফলে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন বা নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে বিভিন্ন চাপ ও দাবির মুখে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

এনসিটিবির ভেতরে বিভিন্ন উইংয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব একটি সমন্বিত ও ধারাবাহিক শিক্ষাক্রম কাঠামো তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করছে। একই সঙ্গে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা যেমন- শিক্ষক প্রশিক্ষণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান, মাঠপর্যায়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় ও সক্ষমতা উন্নয়ন

উদ্যোগ সীমিত। এর ফলে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যন্ত পুরো চক্রটি একটি সমন্বিত ব্যবস্থার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে।

বাজেট স্বল্পতা এনসিটিবির কার্যক্রমের গুণগত মান উন্নয়নে একটি মৌলিক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণে বিপুল অর্থ ব্যয় হওয়ায় গবেষণা, প্রশিক্ষণ, মান যাচাই ও উদ্ভাবনী উদ্যোগে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। সার্বিকভাবে, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও এনসিটিবি এখনও একটি গবেষণাভিত্তিক, বিশেষায়িত ও সমন্বিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সংস্থায় রূপ নিতে পারেনি। মানবসম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হ্রাস, অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদারকরণ এবং পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা ছাড়া এই সংস্থার মাধ্যমে টেকসই ও মানসম্মত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সম্ভব নয়।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (National Academy for Educational Management - NAEM) বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বগুণ এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিষ্ঠিত।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (NAEM) বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বগুণ এবং ব্যবস্থাপনাগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত একটি প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে নায়েমের কার্যক্রমে একাধিক কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যাপ্ত আঞ্চলিক অফিস বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকায় বর্তমানে নায়েমের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূলত কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হয়। এর ফলে মাঠপর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী সময়োপযোগী ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় না। ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়মিত ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ সুবিধার বাইরে থেকে যান, যা জাতীয় পর্যায়ে সমান সক্ষমতা উন্নয়ন নিশ্চিতকরণকে ব্যাহত করে।

বাজেট স্বল্পতা নায়েমের জন্য আরেকটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। প্রতিষ্ঠানটির নিয়মিত রাজস্ব বাজেট তুলনামূলকভাবে সীমিত এবং অনেক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রকল্পভিত্তিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে প্রকল্প শেষ হলে অনেক প্রশিক্ষণ, গবেষণা বা সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও টেকসই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে না। এই প্রকল্পনির্ভরতা সেবা প্রদানে ধারাবাহিকতা ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বিঘ্ন ঘটায়।

নায়েমের মূল ম্যান্ডেটের মধ্যে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গবেষণা, মনিটরিং, মেন্টরিং ও মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বাস্তবে এই ক্ষেত্রগুলোতে নায়েমের কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে দুর্বল। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফলভিত্তিক ফিডব্যাক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ডাটাবেজের ঘাটতি রয়েছে। নায়েমের পাশাপাশি একই লক্ষ্যদলকে উদ্দেশ্য করে মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কে কখন কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, কোন দক্ষতায় ঘাটতি রয়েছে বা কোন স্তরের কর্মকর্তার জন্য কোন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন - এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সমন্বিতভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। এর ফলে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনভিত্তিক না হয়ে সুযোগভিত্তিক ও এ্যাডহক হয়ে ওঠে।

মানবসম্পদের ক্ষেত্রেও নায়েমের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীর তুলনায় প্রশিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং একাডেমিক ব্যবস্থাপনার মতো বিশেষায়িত কাজের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল নেই। ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনেক সময় বিষয় ও তথ্যভিত্তিক হয়ে যায়; আধুনিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও ফলাফলভিত্তিক কাঠামোর অভাবে প্রত্যাশিত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়, বা অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থার সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে নায়েমের কার্যকর সমন্বয়ের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাঠামো গড়ে ওঠেনি। এই সমন্বয়ের অভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পুনরাবৃত্তি, বিষয়গত অসামঞ্জস্য, বিশেষজ্ঞ মানব সম্পদের অপচয় এবং সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। নায়েম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হলেও আঞ্চলিক কাঠামোর অভাব, বাজেট সীমাবদ্ধতা, গবেষণা ও মূল্যায়নে দুর্বলতা, বিশেষায়িত মানবসম্পদের ঘাটতি এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাবে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক সক্ষমতা উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে কার্যকরভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। এই সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, আর্থিক ও মানবসম্পদ বিনিয়োগ এবং সমন্বিত প্রশিক্ষণ কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও তথ্যের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এর মূল লক্ষ্য সমন্বিত শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং দেশব্যাপী আইসিটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে তথ্যনির্ভর শিক্ষা পরিকল্পনা ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সহায়তা করা।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS)-এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জাতীয় ডাটাবেইস নির্মাণ এবং নিয়মিত হালনাগাদের জন্য জনবল থাকা সত্ত্বেও, প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত তথ্য উৎস হিসেবে প্রত্যাশিত সক্ষমতা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ব্যানবেইস কর্তৃক সংগৃহীত ডাটার গুণগত মান, বিশেষত ডাটার গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ডাটা সময়মতো হালনাগাদ না হওয়া, তথ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তে এই ডাটার সীমিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এতে শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দ ও নীতিগত সংস্কারেও ব্যানবেইস কর্তৃক সংগৃহীত ডাটার প্রভাব যথেষ্ট থাকে না। একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও খাতভিত্তিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণধর্মী ও পূর্বাভাসভিত্তিক ডাটা সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

ব্যানবেইস -এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো বিশেষায়িত মানবসম্পদের অভাব। পরিসংখ্যানবিদ, ডাটা অ্যানালিস্ট ও ডাটা সায়েন্সভিত্তিক দক্ষ জনবল পর্যাপ্ত না থাকায় সংগৃহীত ডাটা গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও নীতিনির্ধারণোপযোগীভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। তদুপরি, মাঠপর্যায়ে ডাটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পভিত্তিক ও স্বল্পমেয়াদি জনবল ব্যবহৃত হওয়ায় ডাটা সংগ্রহের ধারাবাহিকতা ও মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ব্যানবেইস -এর সঙ্গে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS), বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) এবং বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড (BISE) এবং সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহের সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা দেখা যায়। সমন্বিত তথ্য কাঠামোর অভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আদান-প্রদান হয় না। আবার অনেক সময় একই ধরনের তথ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। তাতে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং একটি একীভূত জাতীয় শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথেও বাধার তৈরি হয়। ব্যানবেইস মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য আইসিটি ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে থাকে। তবে এক্ষেত্রেও টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বা নায়েমের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টতা দেখা যায় না।

পর্যাপ্ত ও টেকসই অর্থায়নের অভাব ব্যানবেইস -এর কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, অপর্যাপ্ত অর্থায়নের কারণে ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS) কার্যক্রমের স্থবিরতা। এতে শিক্ষা তথ্যের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও রিয়েল-টাইম ডাটা ব্যবহারের সম্ভাবনাকে ব্যাহত হয়।

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (টিটিসি) বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহ (TTC) শিক্ষক উন্নয়নের কোনো সমন্বিত জাতীয় পরিকল্পনা ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বি.এড. (সম্মান), বি.এড. এবং এম.এড. বাদে বাকি অধিকাংশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রকল্পনির্ভর হওয়ায় অর্থায়ন শেষ হলে সেগুলোর স্থায়িত্ব থাকছে না। প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো এনাম কমিশনের 'ইন্টারমিডিয়েট প্যাটার্ন'-এর কাঠামো অনুসরণ করায় উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের উপযোগী বিশেষায়িত বিভাগ ও পেশাদার জনবলের ঘাটতি রয়ে গেছে। পাশাপাশি অপ্রতুল সাংগঠনিক কাঠামো, অনিয়মিত শিক্ষক নিয়োগ ও সীমিত পদোন্নতির সুযোগ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে দুর্বল করছে। সরকারি টিটিসি এবং বেসরকারি টিটিসি ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড. কার্যসূচির মানের সমতা রক্ষার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য টিটিসিতে বি.এড. ডিগ্রি লাভ তুলনামূলকভাবে সহজ হওয়ায় সরকারি টিটিসিগুলো শিক্ষার্থী স্বল্পতায় ভুগছে। চার বছর মেয়াদি বি.এড প্রোগ্রামে বিজ্ঞান শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার মতো বিষয়ভিত্তিক বিভাগ নেই। অনেক শিক্ষকের মানসম্মত শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক ডিগ্রি ও পর্যাপ্ত পেশাগত অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। সায়েন্স ল্যাব ও আইসিটি সুবিধা দুর্বল এবং বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল হওয়ায় প্রশিক্ষণের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। টিটিসির সঙ্গে পূর্বে সংযুক্ত ল্যাব স্কুলগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় টিচিং প্র্যাকটিস, মনিটরিং ও মেন্টরিং কার্যক্রম কার্যত দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি, LAISE প্রশিক্ষণে বিষয়বস্তুর চাপ অতিরিক্ত এবং হাতে-কলমে অনুশীলনের সুযোগ সীমিত; উপরন্তু সেশনভিত্তিক সম্মানী ব্যবস্থার কারণে শিক্ষকদের এই প্রশিক্ষণে আগ্রহ তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে উঠছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নিয়মিত বি.এড. প্রোগ্রামের ক্লাস যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে। এক বছর মেয়াদি বি.এড. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সঙ্গে শিক্ষকদের প্রেষণ (deputation) প্রক্রিয়ার অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছুটি এবং পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রিতা জটিলতা সৃষ্টি করছে। চার বছর মেয়াদি বি.এড. প্রোগ্রামের সাথে শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ক্যারিয়ার অগ্রগতিপথের না থাকায় শিক্ষার্থীদের ঝোঁক মূলত একটি সম্মান ডিগ্রি অর্জন ও আবাসন সুবিধাকেন্দ্রিক; শিক্ষকতাকে বা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পেশাকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণের বিষয়টি গৌণ হয়ে পরেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য টিটিসি বি.এড., এম.এড, লেইস-সহ যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তার প্রতিফলন বিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে না। প্রশিক্ষণ যদি শিক্ষার্থীর শিখনমানের উন্নয়নে কাজেই না লাগে, তাহলে এই বিপুল প্রশিক্ষণ কর্মযজ্ঞের কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে যথার্থ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে টিটিসিগুলোর বিশেষ সম্পর্ক নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বিমুখী নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে কারিকুলাম উন্নয়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় টানাপোড়েন সৃষ্টি হচ্ছে।

টিটিসিসমূহের মধ্যে শিক্ষার উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ গড়ে উঠছে না এবং মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority - NTRCA) ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য হলো দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগ্য ও মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ, নিবন্ধন, পরীক্ষা গ্রহণ, প্রত্যয়ন প্রদান এবং শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ সুপারিশের মাধ্যমে দেশের শিক্ষক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব ও কাজের পরিধির তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কাঠামোগত প্রস্তুতি পর্যাপ্ত নয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এনটিআরসিএ-এর কাজের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় বিশেষায়িত মানবসম্পদ বৃদ্ধি পায়নি। শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ, পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ, নিবন্ধন ও নিয়োগ সুপারিশের এই বিস্তৃত ও জটিল কর্মযজ্ঞ পরিচালনার জন্য বিদ্যমান জনবল অপর্যাপ্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে প্রশাসনিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটছে।

বর্তমানে এনটিআরসিএ কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার গুণগত মান নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। স্বল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং মৌখিক পরীক্ষা আয়োজনের ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ ও দীর্ঘসূত্রিতা বড় চ্যালেঞ্জ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এমসিকিইউ এবং মৌখিক পরীক্ষাভিত্তিক নতুন প্রস্তাবিত নিয়োগ পদ্ধতিটিকে ঘিরেও প্রশ্ন রয়েছে। এসব প্রশ্নপত্র তৈরি ও ব্যবহারের জন্য যথার্থ ট্রায়াল ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আংশিকভাবে যাচাই হলেও শিক্ষকের পেডাগজিক্যাল দক্ষতা, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা, শিক্ষাদানে আগ্রহ ও মানসিক প্রস্তুতি এবং নৈতিকতা ও তাদের বাস্তব শিক্ষাদান দক্ষতা প্রদর্শনের কোনো কাঠামোগত মূল্যায়ন নেই। আসলে বর্তমানে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ছাড়া শিক্ষকতার যোগ্যতা যাচাইয়ের কোনো ব্যবস্থা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নাই। এর ফলে একজন প্রার্থী শিক্ষক হিসেবে বাস্তবে কতটা উপযোগী তা নিরূপণ করা কঠিন।

প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর দিক থেকেও এনটিআরসিএ উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি। স্থায়ী অফিস অবকাঠামোর অভাব, অপর্যাপ্ত আইটি সুবিধা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে কার্যকর ডেটা শেয়ারিং

ফ্রেমওয়ার্ক না থাকায় শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি ডিজিটাল ও সমন্বিত রূপ নিতে পারছে না। ফলে তথ্য যাচাই, শূন্যপদ ব্যবস্থাপনা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অদক্ষতা ও বিলম্ব সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৫৫ ধরে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, যা মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এবং এই অনুপাতও কার্যকরভাবে বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

চার বছর মেয়াদি বি.এড. (সম্মান) ডিগ্রিধারীদের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রত্যাশিত স্বীকৃতি ও প্রধান্য না পাওয়া দুঃখজনক। দীর্ঘমেয়াদি পেশাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চার বছর মেয়াদি বিএড সম্মান ডিগ্রিধারীরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মূল্যায়িত না হওয়ায় শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আকর্ষণ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া, স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর নিবন্ধন প্রক্রিয়ার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের চেষ্টা, রিট মামলা মোকাবেলাসহ নানা কারণে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা এনটিআরসিএ-এর একটি বড় দুর্বলতা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি থেকে সুপারিশ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শূন্যপদ দীর্ঘদিন পূরণ হয় না, যা সরাসরি শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এনটিআরসিএ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংস্থা হলেও বিশেষায়িত মানবসম্পদের অভাব, নিয়োগ পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, প্রযুক্তিনির্ভর সমন্বয়ের ঘাটতি এবং দীর্ঘসূত্রিতাজনিত সমস্যার কারণে এটি বেসরকারি খাতে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে না।

বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট

বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (Bangladesh Examination Development Unit - BEDU) ২০০৪ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (SESIP) আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে আধুনিক ও দক্ষতাভিত্তিক করার ক্ষেত্রে সময়োপযোগী উদ্যোগ হলেও, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম সেসিপ এর আওতায় একটি প্রকল্পভিত্তিক অস্থায়ী কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিইডিইউ এখনও নিজস্ব বাজেট ও স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। সেসিপ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রেক্ষাপটে ইউনিটটির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে বিইডিইউ রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং নিজস্ব বাজেট না থাকায় এর গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও নীতিগত সহায়তামূলক কার্যক্রম পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। সেসিপ কর্তৃক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করা হলেও অর্থায়নের অভাবে বিইডিইউ -র কার্যক্রম দিনকে দিন সংকুচিত হয়ে আসছে।

প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত জনবল ১৭ জন হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে মাত্র ১০ জন কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন, যা ইউনিটটিকে মারাত্মকভাবে জনবল সংকটের মধ্যে ফেলছে। একই সঙ্গে বিশেষজ্ঞ মানবসম্পদের ঘাটতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। পরীক্ষা ও মূল্যায়নের মতো বিশেষায়িত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল দীর্ঘমেয়াদে নিয়োগের সুযোগ না থাকায় বিইডিইউ-এর গবেষণাভিত্তিক কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিতমানে পরিচালিত হচ্ছে না।

কার্যক্রমের দিক থেকে সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর সাথে বিইডিইউ-র সমন্বয়ের যথেষ্ট ঘাটতি আছে। শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিটিবি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ও মূল্যায়ন-বিষয়ক বিভাগগুলোর সঙ্গে কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার একটি সমন্বিত ও মানসম্মত কাঠামো এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। এর ফলে সারা দেশে বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মানে অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে যা শিক্ষার্থীদের পরবর্তী স্তরের শিক্ষা গ্রহণের পথকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিইডিইউ তার লক্ষ্য ও কার্যপরিধির দিক থেকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হলেও, অস্থায়ী প্রকল্প কাঠামো, স্বায়ত্তশাসনের অভাব, জনবল ও বিশেষজ্ঞ ঘাটতি, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের দুর্বলতা এর কার্যকারিতাকে সীমিত করে রেখেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯২ সালে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রস্তুতিতে কাজ করছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে শিক্ষকতা পেশার উৎকর্ষ সাধনে বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহের বি.এড কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় একাডেমিক নেতৃত্ব, মাননিয়ন্ত্রণ ও গুণগত নিশ্চয়তা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না; একাডেমিক তদারকি, নিয়মিত পরিদর্শন, মেন্টরিং এবং টিচিং প্র্যাকটিস (TP) পর্যবেক্ষণ দুর্বল হওয়ায় প্রতিষ্ঠানভেদে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানে ব্যাপক বৈষম্য তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে হালনাগাদ না হওয়া বি.এড শিক্ষাক্রম বর্তমান শিক্ষাবিজ্ঞান, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, আইসিটি ও ভবিষ্যৎ দক্ষতার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বর্তমানে এই শিক্ষাক্রম পরিমার্জন চলছে, তবে এই প্রক্রিয়ায় বেসরকারি টিটিসি ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (BOU)-এর অংশগ্রহণ ছিল না বা যথেষ্ট নয় বলে জানা গেছে। পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ ও সেশন ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি টিটিসি-র অনুষদ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সুস্পষ্ট কার্যক্রম নেই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও একাডেমিকদের মধ্যেও বি.এড কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক (Pedagogical) সক্ষমতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপরন্তু, একাডেমিক ক্যালেন্ডার,

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ও প্রশিক্ষণসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, টিটিসি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)-এর মধ্যে কার্যকর প্রশাসনিক ও একাডেমিক সমন্বয়ের অভাব শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে সমস্যাসঙ্কুল করে তুলছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (স্কুল অফ এডুকেশন)

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (Bangladesh Open University - BOU)-এর ছয়টি স্কুলের মধ্যে একটি হলো স্কুল অফ এডুকেশন। ১৯৯২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্কুল অফ এডুকেশন শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালযের বি.এড প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং এদের আশি শতাংশের অধিক এক বছরের মধ্যে ডিগ্রি সম্পন্ন করে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (BOU)-এর স্কুল অফ এডুকেশন, ওপেন ও ডিস্ট্যান্স লার্নিং (ODL) পদ্ধতির মাধ্যমে সারা দেশে শিক্ষাবিজ্ঞানে পেশাদারি দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সম্প্রসারণে ভূমিকা পালন করছে। তবে এই কার্যসূচির একাডেমিক মান, বাস্তবায়ন সক্ষমতা এবং মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দেখা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বি.এড প্রোগ্রামে অস্বাভাবিক স্বল্প সময়ে (বিশেষত এক বছরের মধ্যে) ডিগ্রি সম্পন্ন হওয়ার উচ্চহার ডিগ্রির মান ও একাডেমিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করছে। স্বাভাবিকভাবেই, শিক্ষক শিক্ষার মতো একটি পেশাভিত্তিক ও দক্ষতানির্ভর ক্ষেত্রে দূরশিক্ষণ মাধ্যমে এত দ্রুত ডিগ্রি সম্পন্ন হওয়ার প্রবণতা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিখনের গভীরতা যথাযথভাবে নিশ্চিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্নের জন্ম দেয়।

দূরশিক্ষণের পাশাপাশি বি.এড. শিক্ষা কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো স্টাডি সেন্টারভিত্তিক ফেস-টু-ফেস সেশন এবং টিউটোরিয়াল কার্যক্রম, যা স্টাডি সেন্টারভিত্তিক টিউটরদের দ্বারা পরিচালনা ও মূল্যায়ন করা হয়। তবে এসব সেশনের তদারকি ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা বিদ্যমান। স্টাডি সেন্টারগুলোতে নিয়মিত মনিটরিংয়ের অভাবে নির্ধারিত ক্লাস, টিচিং প্র্যাকটিস এবং শিক্ষার্থী সম্পৃক্ততা অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পরিচালিত হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, স্টাডি সেন্টারভিত্তিক টিউটরদের গুণগত মান, পেশাগত সক্ষমতা এবং নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। বাউবির বি.এড. ও এম.এড. প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ফেস-টু-ফেস শ্রেণি কার্যক্রমের সময় যথেষ্ট নয় বলে পরিলক্ষিত হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই টিউটরদের পেডাগজিক্যাল দক্ষতা, মূল্যায়ন সক্ষমতা এবং দূরশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকায় শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গে টিউটরদের কার্যক্রম তদারকির জন্য কার্যকর ও মানসম্মত মনিটরিং কাঠামোর অভাব লক্ষ করা যায়। টিচিং প্র্যাক্টিসের অংশ হিসেবে মাইক্রোটিচিং ও সিমুলেশনের ক্ষেত্রেও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় দুর্বলতা রয়েছে।

বি.এড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম, সহায়ক বই-পুস্তক এবং শিক্ষণ উপকরণসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই যুগোপযোগী নয়। তা পরিমার্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাব, যা পাঠ্যসামগ্রী উন্নয়ন, ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত এবং শিক্ষক-টিউটর প্রশিক্ষণে বিনিয়োগকে সীমিত করে রেখেছে। তদুপরি, অনলাইন ও ডিস্ট্যান্ট লার্নিং পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতার অভাব ও ফলাফল প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ রয়েছে। বি.এড প্রোগ্রাম শিক্ষক শিক্ষায় প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও, ডিগ্রির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, স্টাডি সেন্টার ও টিউটর মনিটরিং, শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার যথার্থ মূল্যায়ন, শিক্ষণ উপকরণের মান এবং আর্থিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)-এর মূল লক্ষ্য সকল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠদান উপযোগী আধুনিক, মানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (EED) প্রকৌশল পরিকল্পনা ও নকশা ব্যবস্থাপনা অতিমাত্রায় কেন্দ্রনির্ভর হওয়ায় এলাকাভিত্তিক ম্যাপিং, ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী নকশা প্রণয়নে কাঙ্ক্ষিত মান ও উপযোগিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। অবকাঠামো পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবহারকারীদের (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী) মতামত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় নির্মিত অবকাঠামো অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়ছে। নির্মাণকাজ বাস্তবায়নে ঠিকাদার নির্বাচন ও তদারকিতে দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ রয়েছে; যার ফলে নিম্নমানের নির্মাণকাজ, অসম বণ্টন এবং বৈষম্যমূলক অবকাঠামো উন্নয়ন একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। শিশু-বান্ধব নকশা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা অবকাঠামো এবং দেশীয় বা আঞ্চলিক স্থাপত্যশৈলী (vernacular architecture) বিকাশে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত উইং না থাকায় কারিগরি উৎকর্ষ সীমিত থেকে যাচ্ছে। উপরন্তু, বিপুল সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প তদারকির তুলনায় প্রকৌশলী ও মাঠপর্যায়ের জনবল সংকট প্রকট এবং নির্মিত অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের জন্য পর্যাপ্ত ও পৃথক বাজেট বরাদ্দ না থাকায় অবকাঠামোর স্থায়িত্ব ও ব্যবহারযোগ্যতা দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারি অবসর সুবিধা বোর্ড ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে নিয়োজিত। 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট' এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করার একটি বিশেষ সংস্থা।

অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান সেবাপ্রদান প্রক্রিয়ায় তীব্র দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার ফলে বর্তমানে কল্যাণ ট্রাস্টে ৪৪,০০০ এবং অবসর বোর্ডে ৭৫,০০০ আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। একজন শিক্ষক অবসরের পর আবেদন করলে সেই অর্থ পেতে অবসর বোর্ড থেকে প্রায় ৪ বছর এবং কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ৩ বছর সময় লেগে যাচ্ছে। এছাড়া এনআইডি (NID) ও শিক্ষক তালিকাভুক্তি তথ্যে অসঙ্গতি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় থাকার মতো কারিগরি জটিলতা শিক্ষকদের ভোগান্তি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ নির্ধারিত সময়ে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও বাজেটের তীব্র ঘাটতি যেমন রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির অভিযোগও বিদ্যমান। বর্তমান ব্যবস্থায় একই শিক্ষককে 'অবসর সুবিধা' ও 'কল্যাণ সুবিধা' পাওয়ার জন্য দুটি পৃথক সংস্থার কাছে আলাদা আবেদন করতে হয়, যা সেবা প্রক্রিয়াকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জটিল, দীর্ঘসূত্রতা-প্রবণ ও ব্যয়বহুল করে তুলছে। 'অবসর' এবং 'কল্যাণ' সুবিধার জন্য দুটি পৃথক সংস্থা থাকার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই বলে প্রতীয়মান হয়, যা মূলত সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে আরও জটিল করে তুলছে।

৭.৩ সুপারিশমালা

আশু সুপারিশ

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ

১. সেক্টর-ভিত্তিক পরিকল্পনা ও স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা: খণ্ডিত প্রকল্পভিত্তিক উদ্যোগের পরিবর্তে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতে একটি সামগ্রিক সেক্টর-ভিত্তিক পরিকল্পনা (sector-wide plan) প্রণয়ন অপরিহার্য। শিক্ষার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাধীন ও স্থায়ী কমিশন, সেক্টর পরিকল্পনা এবং SHED-এর নেতৃত্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য সাব-সেক্টর পরিকল্পনার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. নীতিনির্ধারণী সক্ষমতা জোরদারে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ -এর প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদ পুনর্গঠন: মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগকে একটি নীতিনির্ধারণী ও কৌশলগত নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য প্রথমত এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও মানবসম্পদ কাঠামো পুনর্গঠন করা জরুরি। আশু করণীয় হিসেবে বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোয় শিক্ষা বিষয়ক নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তার জন্য ল্যাটারাল এন্ট্রির মাধ্যমে অভিজ্ঞ শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। এই শিক্ষা উপদেষ্টামণ্ডলী শিক্ষা পরিকল্পনা, শিক্ষকনীতি, মূল্যায়ন ও সংস্কার উদ্যোগে সরাসরি অবদান রাখার মাধ্যম মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজের বাইরে এসে প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়নে ভূমিকা রাখবেন।

৩. শিক্ষাসংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ বিচারিক ব্যবস্থা ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়: এ সমস্যা সমাধানে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের সাথে বিচার বিভাগ ও অ্যাটোর্নি জেনারেলের অফিসের সমন্বয়ের মাধ্যমে সুপারিশ ও আলাপ-আলোচনার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি শিক্ষা সংক্রান্ত মামলার জন্য একটি পৃথক বিচারিক শাখা বা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় কিনা তা বিবেচনায় নিয়ে যথাসম্ভব অল্পসময়ে শিক্ষাসংক্রান্ত মামলাসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

৪. মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকার প্রদান: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যকারিতা জোরদার করতে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যপ্তি বিবেচনা করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য একটি পৃথক ও শক্তিশালী অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা প্রক্রিয়াধীন। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের অভিজ্ঞ শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

৫. আইন ও বিধিমালা আধুনিকায়ন: শিক্ষা বোর্ডগুলোকে পরিচালনার জন্য ১৯৬১ সালের পুরানো অধ্যাদেশ পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে একটি সমন্বিত, আধুনিক ও সময়োপযোগী আইনি কাঠামো দ্রুত চূড়ান্ত ও কার্যকর করা জরুরি। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন' দ্রুত পর্যালোচনা শেষে চূড়ান্ত করে কার্যকর করতে হবে। একই সঙ্গে এই আইনের আলোকে স্পষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে বোর্ডগুলোর দায়িত্ব, ক্ষমতা ও জবাবদিহি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপর নির্ভরশীলতার প্রয়োজন না হয়।

৬. জনবল কাঠামোর বিশেষায়ন, আধুনিকায়ন ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ: বর্তমানে বিভিন্ন বোর্ডে ভিন্ন ভিন্ন অর্গানোগ্রাম থাকায় সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে, তাই সকল বোর্ডের জন্য একটি অভিন্ন ও

চাহিদাভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করে শিক্ষার্থী সংখ্যা ও প্রযুক্তিগত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্রুত শূন্যপদ পূরণ করা প্রয়োজন। বোর্ডের গোপনীয় ও সংবেদনশীল কার্যক্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আউটসোর্সিং বা দৈনিকভিত্তিতে জনবল নিয়োগ বন্ধ করে স্থায়ী ও যাচাইকৃত কর্মী নিয়োগ করতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বা ফলাফল বিশ্লেষণের মতো বিশেষায়িত কাজে শিক্ষাবিজ্ঞান, শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন বিষয়ে একাডেমিক দক্ষতাসম্পন্ন পেশাজীবী ও স্থায়ী গবেষক নিয়োগসহ কর্মকর্তাদের নিয়মিত সক্ষমতা উন্নয়নে জোর দিতে হবে। একই সঙ্গে প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি কমাতে এবং বোর্ডগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে স্থায়ী কর্মীদের আন্তঃবোর্ড বদলির নীতিমালা গ্রহণ করা জরুরি।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

৭. জনবল বৃদ্ধি ও বিশেষায়িত নিয়োগ: দায়িত্ব অনুযায়ী বিদ্যমান জনবল অত্যন্ত অপ্রতুল হওয়ায় দ্রুত পর্যাপ্ত সংখ্যক স্থায়ী জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। অডিট কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও গভীরতা নিশ্চিত করতে আর্থিক নিরীক্ষা, শিক্ষা প্রশাসন এবং তদন্ত কাজে অভিজ্ঞ বিশেষায়িত জনশক্তি নিয়োগ দিতে হবে। অডিটরদের জন্য ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, সরকারি বিধিমালা ও প্রাসঙ্গিক আইনের ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনতে আইটি-তে দক্ষ জনশক্তি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

৮. অভিযোগ তদন্তে নিরপেক্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: ডিআইএ-এর কার্যক্রম বিষয়ক নিয়ে অভিযোগ গ্রহণ, যাচাই ও নিষ্পত্তির জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ কমিটি বা স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক তদন্ত কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি করে বদলি বা একতরফা ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ ও কঠোর পর্যালোচনার মাধ্যমে দ্রুত তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

৯. সমন্বিত একাডেমিক পরিদর্শন, সনদ যাচাই ও এমপিও সংক্রান্ত অনিয়ম ব্যবস্থাপনা: এনটিআরসিএ (NTRCA) কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সনদ যাচাইয়ের দায়িত্ব ও এমপিও সংক্রান্ত অনিয়ম তদন্তের জন্য এনটিআরসিএ ও ডিআইএ-এর মধ্যে কার্যকর তথ্য বিনিময় ও দায়িত্ব বণ্টন প্রয়োজন। নিয়োগ ও এমপিও ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল ভেরিফিকেশন ও প্রি-অডিট ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, যাতে অনিয়ম আগেই শনাক্ত হয়। ডিআইএ-কে সাধারণ একাডেমিক পরিদর্শনে যুক্ত করার প্রয়োজন নেই। জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসগুলোর সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান ও দায়িত্বের পুনঃবণ্টন নিশ্চিত করে একটি সমন্বিত তদারকি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

১০. আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অটোমেশন: প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট, ট্যাক্স পেমেন্টসহ সার্বিক আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ও সমন্বিত ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রবর্তন করতে হবে।

একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেইস ও আইবাস (iBAS++) সিস্টেমের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।

নায়েম

১১. বিশেষায়িত মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ফলাফলভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা: প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব এবং প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে কর্মরত প্রশিক্ষকদের জন্য নিয়মিত পেশাগত উন্নয়ন ও আধুনিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চালু করা প্রয়োজন।

ব্যানবেইস

১২. প্রকল্প-নির্ভরতা হ্রাস ও স্থায়ী জনবল কাঠামো: ডেটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রকল্প-ভিত্তিক ও স্বল্পমেয়াদি জনবলের পরিবর্তে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্থায়ী জনবল নিয়োগে জোর দিতে হবে। পরিসংখ্যানবিদ, ডেটা অ্যানালিস্ট এবং ডেটা সায়েন্টিস্টদের স্থায়ী পদে নিয়োগ দিতে হবে। একই সঙ্গে বিদ্যমান কর্মকর্তাদের জন্য স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি তথ্য প্রযুক্তি, ডেটা সায়েন্স ও অ্যানালিটিক্স প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে, যাতে সংগৃহীত ডেটা নীতিনির্ধারণোপযোগী বিশ্লেষণে রূপান্তর করা যায়।

১৩. টেকসই অর্থায়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ডেটা ব্যবস্থাপনা: ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS) পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। বার্ষিক শিক্ষা জরিপসহ সকল প্রধান ডাটা সংগ্রহ কার্যক্রমে মোবাইল অ্যাপভিত্তিক ডিজিটাল টুলস ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা দরকার এবং AI-ভিত্তিক অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে ডেটা ভ্যালিডেশন ব্যবস্থা চালু করা উচিত। মাঠপর্যায়ে তথ্যের তাৎক্ষণিক যাচাই নিশ্চিত করতে ডিজিটাল টুলস-সমর্থিত দ্রুত প্রতিক্রিয়া টিম (rapid response team) গঠন করা প্রয়োজন। সংগৃহীত তথ্য শুধু রেকর্ড আকারে না থেকে শিক্ষার্থীর শিখনমানের উন্নয়নে কাজে লাগানোর জন্য তথ্য সহজলভ্য করা প্রয়োজন; বিদ্যালয়, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহারে মনোযোগ দিতে হবে।

টিটিসি

১৪. প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে টিটিসির অংশগ্রহণ: প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য টিটিসি, নায়েম, এনসিটিবি, শিক্ষাবোর্ড এবং মাউশি-সহ সব প্রতিষ্ঠানের একসঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, শ্রেণিকক্ষে শিখন মান উন্নত হচ্ছে কিনা, সেটি তদারকি ও নিশ্চিত করার জন্য টিটিসি মেন্টরিং এবং সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এনটিআরসিএ

১৫. দক্ষতা ও পেশাগত উপযুক্ততা যাচাইয়ে শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ পরীক্ষার সংস্কার: এনটিআরসি-র শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ পরীক্ষার কাঠামোয় মৌলিক সংস্কার আনা প্রয়োজন, যাতে একজন প্রার্থীর বিষয়জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষকতা পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, আগ্রহ ও মানসিক প্রস্তুতিও যাচাই করা যায়। এজন্য এমসিকিউ ও মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদানে আগ্রহ ও পেশাগত নৈতিকতা যাচাইয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন, শিক্ষণ কৌশলভিত্তিক মূল্যায়ন এবং সীমিত পরিসরে হলেও শিক্ষাদান প্রদর্শন পদ্ধতি সংযোজন করা যেতে পারে। পাশাপাশি, চার বছর মেয়াদি বি.এড. (সম্মান) ডিগ্রিধারীদের স্কুল ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ স্বীকৃতি ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করলে শিক্ষকতা পেশায় মেধাবী ও প্রশিক্ষিত তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়বে।

১৬. প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়: এনটিআরসিএ-এর কার্যক্রমকে দ্রুত, স্বচ্ছ ও সমন্বিত করতে প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ডেটা শেয়ারিং কাঠামো জোরদার করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট

১৭. স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ: বিইডিইউ-কে একটি স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে 'জাতীয় মূল্যায়ন ও পরীক্ষা কেন্দ্র (National Assessment and Examination Centre)' রূপে প্রতিষ্ঠা করে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, যাতে নিয়মিত বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও নীতিগত সহায়তামূলক কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. অংশগ্রহণমূলক ও সময়োপযোগী বি.এড শিক্ষাক্রম সংস্কার: বর্তমান বি.এড শিক্ষাক্রমকে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, আইসিটি ও ভবিষ্যৎ দক্ষতাভিত্তিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে নিয়মিত পরিমার্জন করা জরুরি। এই কারিকুলাম সংস্কার প্রক্রিয়ায় বেসরকারি টিটিসি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (BOU), আইইআর এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্ত করলে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষায় সমন্বয় ও মালিকানাবোধ তৈরি হবে।

১৯. একাডেমিক নেতৃত্ব ও মাননিয়ন্ত্রণ কাঠামো শক্তিশালীকরণ: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি টিটিসি-গুলোর জন্য একটি শক্তিশালী একাডেমিক তদারকি ও মাননিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন, যার আওতায় নিয়মিত পরিদর্শন, ক্লাস অবজারভেশন, টিচিং প্র্যাকটিস (TP) মনিটরিং এবং মেন্টরিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বেসরকারি টিটিসি-র অনুষদ সদস্যদের জন্য শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক

(pedagogical) দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি।

২০. পরীক্ষা, ফলাফল ও একাডেমিক ক্যালেন্ডারে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ: বি.এড পরীক্ষার সময়সূচি, ফলাফল প্রকাশ এবং সেশন ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট ও বাধ্যতামূলক সময়সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যাতে দীর্ঘ সেশনজট ও অনিশ্চয়তা দূর হয়। একই সঙ্গে ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে অনুমোদিত ও অধিভুক্ত টিটিসিগুলোর হালনাগাদ তালিকা এবং বি.এড-এর জন্য পৃথক ও যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা উচিত।

২১. প্রশাসনিক সক্ষমতা উন্নয়ন এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও একাডেমিকদের জন্য শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, টিটিসি এবং মাউশি (DSHE)-এর মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় কাঠামো গড়ে তুললে একাডেমিক ক্যালেন্ডার, প্রেষণ (deputation), ভর্তি ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে বিদ্যমান অসামঞ্জস্য দূর হবে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (স্কুল অফ এডুকেশন)

২২. দূরশিক্ষণ দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একাডেমিক কাঠামো ও শিক্ষার্থী সম্পৃক্ততা জোরদার: বি.এড প্রোগ্রামে অস্বাভাবিক দ্রুত সময়ে (এক বছরের মধ্যে) ডিগ্রি সম্পন্ন হওয়ার উচ্চ হার নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তা পর্যালোচনার জন্য প্রোগ্রামের একাডেমিক কাঠামো, শিক্ষার্থী সম্পৃক্ততা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির একটি সমন্বিত পর্যালোচনা প্রয়োজন। দূরশিক্ষণের মূল দর্শন হিসেবে Self-Directed Learning কার্যকর করতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়মিত একাডেমিক যোগাযোগ, নির্ধারিত ফিডব্যাক ব্যবস্থা, অনলাইন একাডেমিক সাপোর্ট এবং কাঠামোবদ্ধ অ্যাসাইনমেন্ট ও রিফ্লেকটিভ টাস্ক শক্তিশালী করা যেতে পারে।

২৩. শিক্ষাক্রম, শিক্ষণ উপকরণ, একাডেমিক রিসোর্স ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি: বি.এড কার্যক্রমের মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক শিক্ষণ উপকরণসমূহের উন্নয়নের জন্য এবং প্রশিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অন্যান্য মানসম্মত শিক্ষা সংক্রান্ত ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমটি নিয়মিত পর্যালোচনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে এবং এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য ই-বুকসহ সকল একাডেমিক রিসোর্স পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে হবে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

২৪. ঠিকাদার নির্বাচন ও তদারকিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি: নির্মাণকাজের মানোন্নয়নে ঠিকাদার নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। নির্মাণাধীন কাজের মান তদারকির জন্য থার্ড-পার্টি অডিট বা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে

মাঠপর্যায়ে প্রকৌশল তদারকি জোরদার এবং সামাজিক নিরীক্ষা চালু করলে নিম্নমানের কাজ, বৈষম্যমূলক অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্পদের অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

২৫. প্রাতিষ্ঠানিক একীভূতকরণ ও সেবা প্রক্রিয়ার সরলীকরণ: বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টকে একটি একীভূত সত্তায় রূপান্তর করা প্রয়োজন, যাতে অবসরের পর একজন শিক্ষক একক আবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন।

২৬. পেন্ডিং আবেদন নিষ্পত্তিতে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা, বাজেট ও জনবল: অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ, অস্থায়ী টাস্কফোর্স গঠন এবং পৃথক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেন্ডিং আবেদনগুলোর নিষ্পত্তি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

২৭. ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন ও স্বয়ংক্রিয় অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা জোরদারকরণ: আবেদন নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ বিলম্ব, অর্থ ছাড়ে অনিশ্চয়তা এবং দুর্নীতির সুযোগ কমাতে দ্রুত আইবাস (iBAS++) সিস্টেমের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরি।

২৮. স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কাঠামো জোরদারকরণ: সেবাপ্রদানের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির অভিযোগ মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। নিরপেক্ষ তদন্ত, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

মধ্যমেয়াদি সুপারিশ

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ

২৯. মাধ্যমিক শিক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ: সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে SHED-কে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এর ধারাবাহিকতায় প্রাথমিকভাবে কয়েকটি উপজেলা বেছে নিয়ে পাইলট আকারে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে, যেখানে নির্দিষ্ট নীতিগত সীমার মধ্যে আঞ্চলিক বা মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহকে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হবে। পাইলটিং-এর ফলাফল মূল্যায়ন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পর দেশব্যাপী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে (অধ্যায় ৭ দ্রষ্টব্য)।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

৩০. পেশাদার, শিক্ষা বিষয়ে দক্ষ ও স্থায়ী মানবসম্পদ কাঠামো নিশ্চিতকরণ: মাউশির মানবসম্পদ সংকট সমস্যাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে। বিশেষ করে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজারসহ সংশ্লিষ্ট পদগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্থায়ী জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে প্রেষণে নিয়োগের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ পদায়নের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক সক্ষমতা জোরদার করা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় চার বছর মেয়াদি সম্মান ডিগ্রীধারী এবং শিক্ষা-বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মাউশির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ, যেমন, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রযোজ্য সকল পদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডেপুটেশনের চর্চা নিরুৎসাহিত করে একটি পেশাদার শিক্ষা প্রশাসন ক্যাডার বা স্থায়ী নিয়োগ কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে (অধ্যায় ৭ দ্রষ্টব্য)।

৩১. মাউশির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদারে কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন: মাউশির কাজের ক্ষেত্রাধীন বিষয়গুলোতে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগগুলো গুরুত্বসহকারে দ্রুত ও যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর জন্য পৃথক হটলাইন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, শুদ্ধাচারের জন্য পুরস্কার এবং দুর্নীতির প্রমাণিত অভিযোগের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপমুক্তভাবে এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত ও নিষ্পত্তি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিসহ নিশ্চিত করতে হবে (নিচে দেখুন)।

৩২. মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যকর আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা: কার্যকরভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা সেবা প্রদানের জন্য মাউশির সাথে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষ করে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষা বোর্ডসমূহ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত পরিকল্পনা ও উদ্যোগ বাস্তবায়নে অধিদপ্তর সমর্থন দিবে ও উৎসাহিত করবে (অধ্যায় ৭ দ্রষ্টব্য)।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

৩৩. গবেষণা ও গুণগত মানোন্নয়ন সেল গঠন: প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে পাঠদান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মান নিশ্চিত করতে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ও গুণগত মানোন্নয়ন সেল গঠন করা প্রয়োজন। এই সেল ধারাবাহিকভাবে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রশ্নপত্রের মান, মূল্যায়নের নির্ভরযোগ্যতা এবং শিক্ষার্থীদের শিখনফল সম্পর্কে প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ প্রদান করবে।

৩৪. আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও আঞ্চলিক শিক্ষা পরিকল্পনা: বোর্ডগুলোর মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়নে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে কার্যকর আন্ত-বোর্ড সমন্বয় কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB), বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটসমূহ (IERs), সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহ (TTCs) এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে বোর্ডগুলোর সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা প্রয়োজন (অধ্যায় ৭ দ্রষ্টব্য)।

৩৫. প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন ও পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন: পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ, ই-টেন্ডারিং ও প্রশাসনিক কাজে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল অটোমেশন চালু করা জরুরি। কম্পিউটার সেলের জরাজীর্ণ সরঞ্জামাদি দ্রুত প্রতিস্থাপন করা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের ব্যবস্থা করা দরকার।

এনসিটিবি

৩৬. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে এনসিটিবি- এর মূল কার্যাবলির পুনঃসংজ্ঞায়ন ও গবেষণাভিত্তিক রূপান্তর: এনসিটিবির দায়িত্বকে মূলত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, নিয়মিত পর্যালোচনা ও গবেষণার দিকে পুনর্নির্দেশ করা জরুরি। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ কার্যক্রম একটি পৃথক বিশেষায়িত সংস্থার কাছে ন্যস্ত করতে হবে। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীদের শিখনফল নিয়ে নিয়মিত, প্রাতিষ্ঠানিক ও দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট ও দক্ষ গবেষক নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনে পৃথক গবেষণা সেল তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটসমূহ এবং শিক্ষাক্রম বিষয়ে অভিজ্ঞ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যৌথ গবেষণা ও প্রমাণভিত্তিক জ্ঞান উৎপাদনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

৩৭. বিশেষায়িত ও পেশাদার মানবসম্পদ কাঠামো গঠনের মাধ্যমে এনসিটিবি -এর কারিগরি সক্ষমতা জোরদার: শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নের মতো কারিগরি ও জটিল কাজে প্রেষণের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়ার পরিবর্তে উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাবিদ, শিক্ষা মূল্যায়ন ও শিক্ষণ-শিখন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে বিদ্যমান জনবলকে দীর্ঘমেয়াদি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষম করে তুলতে হবে। ২০১৮ সালের এনসিটিবি আইনে প্রস্তাবিত নতুন উইংসমূহ দ্রুত কার্যকর করে বিশেষায়িত জনবল নিয়োগ ও শূন্য পদ পূরণের মাধ্যমে একটি স্থায়ী ও দক্ষ পেশাদার কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৩৮. প্রমাণভিত্তিক শিক্ষাক্রম সংস্কার ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হ্রাসে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা: এনসিটিবির প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমাতে শক্ত রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও নীতিগত ঐকমত্য জরুরি। শিক্ষাক্রম সংশোধনকে একটি প্রমাণভিত্তিক, সময়াবদ্ধ

ও ধাপে ধাপে সম্পন্ন প্রক্রিয়া হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে এনসিটিবির পেশাদার মতামত ও গবেষণালব্ধ ফলাফল সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূল ভূমিকা পালন করবে।

৩৯. শিক্ষাক্রমের উল্লম্ব ও আনুভূমিক (vertical and horizontal) সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদারকরণ: এনসিটিবির অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করা প্রয়োজন। বোর্ডের বিভিন্ন উইংয়ের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় কাঠামো গড়ে তোলা দরকার যাতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বজায় থাকে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, মূল্যায়ন সংস্থা ও মাঠপর্যায়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও যৌথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে এনসিটিবির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

নায়েম

৪০. সমন্বিত প্রশিক্ষণ মাস্টার প্ল্যান ও ডিজিটাল ডাটাবেজের মাধ্যমে নায়েম -এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ভূমিকা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (NAEM)- বিভিন্ন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগে সহযোগিতায় বিশেষ ভূমিকা পালনে একটি সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারে। এ জন্য একটি সুস্পষ্ট ও সমন্বিত প্রশিক্ষণ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই মাস্টার প্ল্যানে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের বিভিন্ন ক্যারিয়ার স্তর, দায়িত্ব ও দক্ষতা চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ধরন, সময়কাল ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। একই সঙ্গে নায়েম, টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহ (TTC), উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (HSTTI), বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন স্পষ্ট করতে হবে।

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাকে তথ্যভিত্তিক করতে একটি কেন্দ্রীয় ও ডিজিটাল প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এই ডাটাবেজ শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তারা কখন, কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, কী ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সে সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করবে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ-পরবর্তী কর্মদক্ষতা, পুনঃপ্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণ চাহিদা চিহ্নিত করা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থাও এতে থাকবে।

৪১. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ ও টেকসই অর্থায়ন: আঞ্চলিক পর্যায়ে শিক্ষা অফিসের সাথে সমন্বয় করে নায়েমের আঞ্চলিক অফিস (Regional Academy for Educational Management - RAEM) বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। নায়েমের আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করতে নিয়মিত রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধি এবং প্রকল্পভিত্তিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরতা কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে। প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মনিটরিং ও

মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট ও পূর্বানুমেয় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন।

ব্যানবেইস

৪২. সমন্বিত জাতীয় শিক্ষা ডেটা সেন্টারে রূপান্তর: ব্যানবেইসকে একটি স্বায়ত্তশাসিত 'ইন্টিগ্রেটেড ন্যাশনাল এডুকেশন ডেটা সেন্টার' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যেখানে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ সব তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। একটি একীভূত প্ল্যাটফর্ম থাকলে রিয়াল-টাইম ডেটা ব্যবহার করে নির্ভুল বাজেট বরাদ্দ, নীতিগত সংস্কার এবং শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হবে।

টিটিসি

৪৩. সমন্বিত জাতীয় শিক্ষক উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ও টেকসই অর্থায়ন কাঠামো প্রণয়ন: শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহকে (TTC) বিচ্ছিন্ন ও প্রকল্পনির্ভর কার্যক্রম থেকে বের করে একটি সমন্বিত জাতীয় শিক্ষক উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে। নিয়মিত রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে টিটিসি-র মূল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, একাডেমিক প্রোগ্রাম ও গবেষণাকে টেকসই অর্থায়নের আওতায় আনতে হবে, যাতে শিক্ষক উন্নয়ন একটি চলমান প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪৪. প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ও বিশেষায়িত বিভাগ প্রতিষ্ঠা: শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহকে পূর্ণাঙ্গ 'পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ' হিসেবে উন্নীত করার পাশাপাশি ভাষা, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও বিশেষ শিক্ষার মতো বিশেষায়িত বিভাগ চালু করা জরুরি। এনাম কমিশনের নির্ধারিত জনবল ছক ('ইন্টারমিডিয়েট প্যাটার্ন') পরিবর্তন করে যুগোপযোগী অরগানোগ্রাম তৈরি ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

৪৫. জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও নেতৃত্ব বিকাশ: ১ বছর মেয়াদি বি.এড, ৪ বছর মেয়াদি বি.এড ও এম.এড প্রোগ্রামের মানসম্মত ডিগ্রি সম্পন্ন করার জন্য টিটিসি-তে পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত বিশেষায়িত জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট টিটিসি থেকেই যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষককে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন

৪৬. অবকাঠামো উন্নয়ন ও ল্যাব স্কুল পুনঃপ্রতিষ্ঠা: টিটিসিগুলোর সায়েন্স ল্যাব, আইসিটি সুবিধা ও ডিজিটাল লার্নিং অবকাঠামো আধুনিকায়ন করা জরুরি। টিটিসির সঙ্গে পূর্বে সংযুক্ত ল্যাব স্কুল পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা নতুন ল্যাব স্কুল স্থাপন করতে হবে, যাতে টিচিং প্র্যাকটিস, মনিটরিং ও মেন্টরিং কার্যক্রম বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকর হয়।

৪৭. ১ বছর ও ৪ বছর মেয়াদি বি.এড প্রোগ্রামের কাঠামোগত সংস্কার: ১ বছর মেয়াদি বি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও ডেপুটেশন প্রক্রিয়ার পূর্ণ সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। কোর্স শুরুর দিন থেকেই প্রেষণ (deputation) কার্যকর করার সুনির্দিষ্ট আদেশ জারি করতে হবে। অন্যদিকে, ৪ বছর মেয়াদি বি.এড শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষকতা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় একটি স্পষ্ট ক্যারিয়ার পাথ নির্ধারণ করতে হবে এবং এনটিআরসিএসহ নিয়োগকারী সংস্থাগুলোর নিয়োগ বিধিমালায় এইসব ডিগ্রির স্বীকৃতি থাকতে হবে।

এনটিআরসিএ

৪৮. বিশেষায়িত মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-কে কার্যকর সংস্থায় রূপান্তর: বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)-কে কার্যকর একটি দক্ষ ও পেশাদারি শিক্ষক নিয়োগ সংস্থায় রূপান্তর করতে হলে সর্বপ্রথম এর স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো এবং মানবসম্পদ কাঠামোকে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানভিত্তিক করতে হবে। প্রেষণনির্ভর নিয়োগ থেকে সরে এসে এনটিআরসিএ-তে শিক্ষণ-শিখন, শিক্ষক উন্নয়ন, শিক্ষা মূল্যায়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে। মাধ্যমে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, সিলেবাস প্রণয়ন এবং নিয়োগ ক সুপারিশ প্রক্রিয়াকে অধিকতর প্রাসঙ্গিক ও মানসম্মত করা সম্ভব হবে। আধুনিক আইটি সুবিধা এবং পর্যাপ্ত জনবল সংযোজনের মাধ্যমে প্রশাসনিক চাপ ও দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করা জরুরি।

৪৯. তথ্যভিত্তিক শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ ও প্রক্ষেপণের মাধ্যমে সময়োপযোগী নিয়োগ: শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে পরিকল্পিত ও বাস্তব চাহিদাভিত্তিক করতে একটি নির্ভরযোগ্য শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ ও প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে মাউশি, টিটিসি, শিক্ষা বোর্ডসমূহ ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষক চাহিদা, বিষয়ভিত্তিক ঘাটতি এবং ভবিষ্যৎ অবসর বা সম্প্রসারণজনিত চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে একটি তথ্যভিত্তিক ডাটাবেজ ও পূর্বাভাস কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি।

বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট

৫০. বিশেষায়িত মানবসম্পদ ও গবেষণাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি: বিইডিইউ-র মানবসম্পদ কাঠামোতে মৌলিক সংস্কার আনা জরুরি। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একটি উচ্চমাত্রার কারিগরি ও গবেষণাভিত্তিক ক্ষেত্র হওয়ায় প্রেষণনির্ভর সাধারণ জনবলের পরিবর্তে শিক্ষামূল্যায়ন, পরিমাপ বিদ্যা ও পরিসংখ্যান, অভীক্ষা তৈরি ও শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। অনুমোদিত পদসমূহ দ্রুত পূরণ করার পাশাপাশি জনবল সংখ্যা ও দক্ষতা বাড়িয়ে একে একটি শক্তিশালী গবেষণা ও মানোন্নয়ন ইউনিটে রূপান্তর করা প্রয়োজন।

৫১. শিক্ষা বোর্ডসমূহের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের মানগত সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ: দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের সঙ্গে বিইডিইউ-র কার্যকর ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করে বর্তমানে বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যে মানগত অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। তা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষা বোর্ডগুলোর প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মান যাচাই কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব এর ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (স্কুল অফ এডুকেশন)

৫২. স্টাডি সেন্টারভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন, টিচিং প্র্যাকটিস ও টিউটর ব্যবস্থার মাননিয়ন্ত্রণ: স্টাডি সেন্টারভিত্তিক ফেস-টু-ফেস সেশন ও টিচিং প্র্যাকটিস কার্যক্রম এবং টিউটরদের মান নিশ্চিত করতে মনিটরিং ও তদারকি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা অত্যাবশ্যক। টিউটরদের জন্য শিক্ষাবিজ্ঞান, দূরশিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন এবং টিচিং প্র্যাকটিস তদারকি বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার কোর্স চালু করা যেতে পারে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

৫৩. বিকেন্দ্রীকৃত ও অংশগ্রহণমূলক অবকাঠামো পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রবর্তন: শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিমাত্রায় কেন্দ্রনির্ভর নকশা ও পরিকল্পনা ব্যবস্থার পরিবর্তে জেলা ও অঞ্চলভিত্তিক অবকাঠামো ম্যাপিং চালু করা প্রয়োজন, যেখানে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু ঝুঁকি, শিক্ষার্থী সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত চাহিদা প্রতিফলিত হবে। একই সঙ্গে অবকাঠামো পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করলে নির্মিত অবকাঠামো বাস্তবসম্মত, ব্যবহারবান্ধব ও দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর হবে।

৫৪. শিশু-বান্ধব ও দেশীয় স্থাপত্যভিত্তিক বিশেষায়িত নকশা সক্ষমতা উন্নয়ন: শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় শিশু-বান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা অবকাঠামো এবং দেশীয় বা আঞ্চলিক স্থাপত্যশৈলী (vernacular architecture) উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষায়িত আর্কিটেকচারাল উইং গঠন করা প্রয়োজন। এই উইং শিশু-বান্ধব, শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত শ্রেণিকক্ষ এবং অবকাঠামো ডিজাইন, দুর্যোগ সহনশীল, পরিবেশ-বান্ধব এবং প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী নকশা উন্নয়নে কাজ করবে ।

৫৫. জনবল, রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই বাজেট কাঠামো শক্তিশালীকরণ: বিপুল সংখ্যক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকরভাবে তদারকির জন্য পর্যাপ্ত প্রকৌশলী ও মাঠপর্যায়ের জনবল নিয়োগ এবং তাদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন জরুরি। বিদ্যমান শিক্ষা অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের জন্য পৃথক ও নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণকে অবকাঠামো উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৭.৪ পরবর্তী পদক্ষেপ ও দায়িত্ব

পরিশেষে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে এসব সহায়ক এবং নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই ভূমিকা সঠিক ও কার্যকরভাবে পালনের জন্য সামগ্রিক শিক্ষাখাতভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করে তার আলোকে শিক্ষার্থীর শিখনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং প্রয়োজনে রূপান্তর করা প্রয়োজন হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষায়িত সক্ষমতা তৈরি করাও অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে এবং পারস্পরিক সুসমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও শিক্ষার উন্নয়নে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক ঐকমত্য, গতিশীল এবং শিক্ষামুখী আমলাতন্ত্র, ব্যক্তি বা পেশাগত গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে শিশুর শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া, কার্যকর বিকেন্দ্রায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সব ধরনের স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা গেলে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো শিশুর শিখন তথা মাধ্যমিক শিক্ষা ও সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে অর্থবহ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

অধ্যায়

৮

সংস্কার বাস্তবায়ন, অর্থায়ন ও পরবর্তী পদক্ষেপ

এক দশ-সালা জাতীয় শিক্ষা মহা-প্রকল্প নয় কেন?

৮.১ সংস্কার অপরিহার্য

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদের প্রায় শেষ সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য পরামর্শক কমিটি নিয়োগ দেওয়া হয়। নির্বাচন পরবর্তী নতুন সরকারের জন্য সংস্কারের এজেন্ডা হিসেবে পরামর্শক কমিটির প্রতিবেদন বিবেচিত হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। কমিটি এই লক্ষ্য সামনে রেখে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা নতুন সরকারের নেতৃত্বে দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এ জন্য সুপারিশের তালিকা তৈরি যথেষ্ট নয়। সুপারিশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারসহ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অতীতের অনেক সংস্কার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। সে কথা বিবেচনায় রেখে ব্যর্থ হওয়ার কারণ পরিহার করতে হবে। এই সবের মধ্যে প্রধান কারণ রাজনৈতিক সংকল্পের দুর্বলতা এবং সেজন্য সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাব।

প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো যথার্থ বিবেচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যেতে হলে কিছু বিষয়ে নীতি নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ও শিক্ষামন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

পরামর্শক কমিটির মতে প্রতিবেদন ও এর সুপারিশসমূহের যথার্থ বিবেচনা ও বাস্তবায়নের পথে এগোনোর জন্য অন্তত ছয়টি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

ক) প্রতিবেদন ও এর সুপারিশ সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রাথমিক পর্যালোচনা
খ) সুপারিশের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের ও সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
গ) আশু ও মধ্যমেয়াদি বাস্তবায়নযোগ্য বিষয় সম্বন্ধে পদক্ষেপ
ঘ) দীর্ঘমেয়াদি ও সামগ্রিক শিক্ষার খাত সম্পর্কে বিবেচনা
ঙ) রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও অর্থায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
চ) বাস্তবায়ন পদক্ষেপের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব

এই সব বিবেচনা করার সময় মনে রাখতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অংশ। একে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। বিশেষত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাসহ প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সমগ্র বিদ্যালয় শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং প্রাথমিক-মাধ্যমিক মিলে শিক্ষা ব্যবস্থার ও মানবসম্পদ তৈরিতে বিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তিমূলক চরিত্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে। পৃথিবীর অনেক দেশে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষা অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়, যা বাংলাদেশে এখনো হয়নি। নির্বাচন পরবর্তী নতুন সরকার সমগ্র বিদ্যালয় শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ (holistic) দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে দেখবে এবং সর্বজনীন,

গ্রহণযোগ্যমানের ও সমতাভিত্তিক বিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। এই উদ্যোগে বর্তমান মাধ্যমিক-শিক্ষা সংস্কার প্রতিবেদন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিযুক্ত প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য পরামর্শক কমিটির সুপারিশমালা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

৮.২ বিভিন্ন সময়সূচির কার্যক্রম পরস্পর-সম্পৃক্ত

প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে বিভক্ত। তবে এখন শুধু আশু করণীয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর অন্য সুপারিশ ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া যায় তেমন নয়। আশু করণীয় ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কিন্তু মধ্যমেয়াদি সুপারিশগুলোর সূচনাও এখনই হতে হবে। এসব কাজ সম্পন্ন করতে বেশি সময় লাগবে, তাই এগুলো মধ্যমেয়াদি বলে বর্ণিত হয়েছে। তেমনি দীর্ঘমেয়াদি কাজ ও লক্ষ্যের বিবেচনা এবং সূত্রপাত এখন থেকেই হতে হবে। এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথও আশু স্থির করতে হবে।

বর্তমান সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম ভবিষ্যতের লক্ষ্য ও অভীষ্টের ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা ও প্রেক্ষিতের বিবেচনা স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কাজকে প্রভাবিত করে। বর্তমান সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ যেন ভবিষ্যতের অগ্রগতিতে অন্তরায় না হয় তা বিবেচনায় রাখতে হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের অগ্রাধিকার ও কার্যকলাপকে যৌক্তিক, সমন্বিত ও সামগ্রিক উদ্যোগের উপাদান হিসেবে বিবেচনার প্রকৃত উপায় মধ্যমেয়াদি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা খাত পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা তৈরি করা (এক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন প্রণীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পায় উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোকে পূর্ণ শিক্ষাখাত পরিকল্পনা বলা যায় না)। এভাবে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরব্যাপী শিক্ষায় রাষ্ট্রের ও জাতির কর্তব্যের রোডম্যাপ তৈরি হতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী দশ বছরের শিক্ষা রূপান্তরের রূপকল্প (Vision) প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। নতুন রূপকল্প প্রয়োজন, কারণ "২০৩৫ সালের পৃথিবীর চাহিদা হবে নতুন ধরনের শেখার - যে শেখা শিক্ষার্থীর জন্য সক্ষমতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং নৈতিক উদ্দেশ্য গঠনে সহায়ক হবে"। শিক্ষার নতুন রূপকল্পের উদ্দেশ্য হবে প্রতি শিশুর জন্য দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনের নিশ্চয়তা। শিক্ষার রূপকল্প বিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য (learning content and objectives) এবং শিক্ষণ-শিখন (teaching-learning/pedagogy) ক্ষেত্রে রূপান্তরের নির্দেশনা দেবে। বর্তমান পরামর্শক কমিটির প্রতিবেদনে শিক্ষার রূপান্তরিত উদ্দেশ্য ও নতুন শিক্ষণ-শিখন বিদ্যালয়ে ও শিশুর শিক্ষা-অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে প্রস্তুত হতে পারে

এবং সে জন্য কী পরিবর্তন দরকার তাতে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এই দুই প্রচেষ্টাকে পরস্পর সম্পূরক হিসেবে দেখতে হবে।

৮.৩ অবহিতকরণ ও প্রাথমিক পর্যালোচনা

সংস্কার সফল করতে হলে এটি প্রধান অংশীজন এবং জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং তাদের সমর্থন আদায় করতে হবে। সরকারের কাছে প্রতিবেদন হস্তান্তরের পর এটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। নতুন রাজনৈতিক সরকারের জন্য সামগ্রিক শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্য অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে বলে আমরা মনে করি। এজন্য গণসচেতনতা ও জনসমর্থন তৈরি করা প্রয়োজন হবে।

সংস্কার সম্পর্কে অবহিতকরণ ও এজন্য সংলাপের মাধ্যমে সমর্থন সৃষ্টির জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন প্রকাশ করে এ ব্যাপারে মতামত আহ্বান করা প্রয়োজন। সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদনের পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। মতামত ও পরামর্শ যথাযথ সংগ্রহ ও পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য গবেষণা সংস্থা ও শিক্ষা সংস্কারে সক্রিয় এনজিওদের যুক্ত করা প্রযোজন হবে।

৮.৪ মন্ত্রণালয়ের ও সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

শিক্ষা সংস্কারে, বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের কিছু আশু পদক্ষেপ হবে নতুন সংস্কারের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা। সরকারের আন্তরিকতা ও সংকল্পের নিদর্শন দ্রুত দেখাতে হবে। এজন্য সরকারের বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্বরান্বিত করে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। জনঅবহিতকরণ চলাকালে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সুপারিশ পর্যালোচনা শুরু হতে পারে। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন টাস্কফোর্স গঠন করে এই কাজের সূচনা হতে পারে। আশু, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ও মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের আওতার বিষয় এবং সরকারি উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার চলমান কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিবেচিত ও গৃহীত হতে থাকবে। এসব বিষয় সংস্কার-সুপারিশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে, এমনকি সাংঘর্ষিকও হতে পারে। কোনো সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য সংস্কারকে যেন বাধাগ্রস্ত না করে তাতে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুপারিশের বিষয় ও লক্ষ্য

বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। একান্ত জরুরি না হলে সুপারিশের ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্ত স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন বা নতুন সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকা প্রয়োজন।

যে সব বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের এক্তিয়ারের বাইরে যাতে সরকারের সমর্থন বা অনুমোদন প্রয়োজন, সে সব ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ে অবহিতকরণ, বিবেচনা ও সমর্থন সংগ্রহে মন্ত্রণালয়কে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রায়নের জন্য জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পাইলট, জনবল সংক্রান্ত ব্যস্থাপনা কাঠামোর পরিবর্তন ও শিক্ষার জন্য সরকারি বিনিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষার সামগ্রিক রূপান্তরের লক্ষ্যে এক নতুন মাত্রার রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন হবে।

৮.৫ আশু ও মধ্যমেয়াদি বাস্তবায়ন বিষয়ে পদক্ষেপ

বিদ্যমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দৈনন্দিন কার্যক্রম চলছে। এ সবের অর্থায়ন, কাজের পরিধি ও অগ্রাধিকার স্থির হয় সরকারের, বার্ষিক বাজেটের মাধ্যমে। এছাড়াও আছে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম। বর্তমানে দাতা-সহযোগিতায় চালু লেইস প্রজেক্টের বিভিন্ন কার্যসূচির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ অন্য কার্যসূচি বিবেচনাধীন থাকতে পারে। এই প্রতিবেদনে যে সংস্কার বা পরিবর্তনের কথা সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো দৈনন্দিন ও উন্নয়ন কার্য পরিচালনা উভয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই সুপারিশ বিবেচনায় ও বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনায় চলমান বা নতুন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও অর্থায়নের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করতে হবে। ওপরে বলা হয়েছে চলমান শিক্ষা কার্যক্রমের কোনো নতুন সিদ্ধান্ত বিশেষ জরুরি বিবেচিত না হলে সংস্কার সংক্রান্ত অবস্থান চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা শ্রেয়। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয় ও সরকারের জন্য দুটি বিষয় বিবেচ্য। এক, সংস্কারকে গুরুত্ব-দিলে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিদের সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগিতা। সংস্কার সংক্রান্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আলোচিত হতে হবে এবং সংস্কার বাস্তবায়ন হবে এসব সহযোগিতার মূল লক্ষ্য। দুই, পরবর্তী বার্ষিক শিক্ষা বাজেট ও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে সংস্কার বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দিতে হবে। সরকারের পরবর্তী বাজেট হতে পারে সংস্কার বাস্তবায়নে সরকারের সংকল্পের নিদর্শন।

৮.৬ দীর্ঘমেয়াদি ও সামগ্রিক শিক্ষক সংক্রান্ত বিবেচনা

দেশ ও সমাজের অগ্রগতি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের জন্য পববর্তী প্রজন্মকে লালন করার গুরু দায়িত্ব শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বর্তায়। মাধ্যমিক শিক্ষাসহ বিদ্যালয় শিক্ষা এই ব্যবস্থার ভিত্তি। তাই বিদ্যালয় শিক্ষাকে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা আয়োজন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না।

একটি সামগ্রিক শিক্ষাখাত পরিকল্পনার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিদ্যালয়কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা এবং এর অংশ হিসেবে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও অর্জনযোগ্য ফলাফল পুনর্বিবেচনা এই প্রতিবেদনের মূল কথা। বর্তমান প্রতিবেদনে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার সীমিত পরিসরে আলোচনা ও সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত হিসেবে সীমারেখা টানলেও শিক্ষার ও সমাজের লক্ষ্য অর্জনে এই প্রাচীর অতিক্রম করা প্রয়োজন। সমগ্র বিদ্যালয় শিক্ষাকে একই মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এনে সর্বজনীন বিদ্যালয় শিক্ষার ধারাবাহিকতা ও পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি হবে প্রাচীর ভাঙার এক প্রথম পদক্ষেপ। ২০৩০ টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট হিসেবে সর্বজনীন প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার এখন বিশ্বময় স্বীকৃত। ২০৩০ সালে না হলেও কবে এই লক্ষ্য বাংলাদেশে অর্জিত হবে তা স্থির করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রণীত 'শিক্ষা রূপকল্প' দলিলে শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

৮.৭ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাখাত পরিকল্পনা এবং এর অংশ হিসেবে বিদ্যালয় শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা উপখাতের বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। ২০২০ সালে এরকমের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ এখন পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে, "শিক্ষার রূপকল্প" প্রতিবেদন, বর্তমান প্রতিবেদন এবং শিক্ষার অন্যান্য উপখাত (উচ্চশিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা) বিষয়ে বিভিন্ন পর্যালোচনার ভিত্তিতে মধ্যমেয়াদি শিক্ষা খাত পরিকল্পনা ও দশ সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা তৈরি হতে পারে।

২০২০ সালের খসড়া শিক্ষা খাত পরিকল্পনায় এটি বাস্তাবায়নের জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন দিক নির্দেশনা ও নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন ও প্রক্রিয়া নির্মাণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপ সংগঠন ও প্রক্রিয়া এখন খাত পরিকল্পনা তৈরির ও অতঃপর বাস্তবায়নে নেতৃত্বদানের জন্য প্রয়োজন। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন

টাস্কফোর্সের আদলে শিক্ষার উভয় মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করে একটি সংস্থা গঠিত হতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা টাস্কফোর্স এক্ষেত্রে সামগ্রিক শিক্ষা টাস্কফোর্সের উপখাতভিত্তিক অঙ্গ হতে পারে।

৮.৮ মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থায়ন

শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের বিনিয়োগ যে যথেষ্ট নয়, তা স্বীকৃত ও বহুল আলোচিত। প্রতি বছর সরকারের বাজেট ঘোষণার প্রাক্কালে এ নিয়ে ব্যাপক গণসংলাপ হয়, কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্তে বা নীতিতে এই সংলাপের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় না। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারকাদের শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতের অর্থায়ন বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তা বা অবহেলা কেন, তা তলিয়ে দেখার বিষয়।

বাংলাদেশের সরকারি বার্ষিক বাজেটে কর থেকে আয় মোট জাতীয় উৎপাদনের ৮ শতাংশের চেয়ে কম। স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় উৎপাদনের ৪ থেকে ৬ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হলে জাতীয় বাজেটের অর্ধেক বা তার চেয়েও বেশি শিক্ষা খাতে দিতে হবে, যা বাস্তবসম্মত নয়। রাজস্ব সংগ্রহ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক কাঠামোগত দুর্বলতা আমাদের অর্থনীতির এক বড় সমস্যা। উন্নয়নশীল প্রতিবেশী দেশ ও আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোও আনুপাতিক হারে দুই থেকে তিন গুণ বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারে।

শিক্ষা অর্থায়নে তিনটি বিষয় বিবেচ্য। প্রথমত, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রকৃত অগ্রাধিকার থাকলে এ জন্য আনুপাতিক হারে সরকারি বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং বাড়ানো সম্ভব। বর্তমানে সংখ্যার হিসেবে প্রতি বছর কিছু বাড়লেও আনুপাতিক হারে আমরা স্থিতাবস্থাও বজায় রাখছি না। কথার পরিবর্তে কাজে রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকলে শিক্ষায় বিনিয়োগ জাতীয় উৎপাদন ও রাষ্ট্রীয় বাজেটের অংশ হিসেবে ক্রমে বাড়তে পারে। দ্বিতীয়ত, সরকারি সূত্রের বাইরেও আছে বেসরকারি ব্যয় - সন্তানের জন্য পরিবারের ব্যয়, ধর্মভিত্তিক সংগঠনের শিক্ষা কার্যক্রম, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বদান্যতা এবং শিক্ষা খাতে বানিজ্যিক ব্যয়। সব বেসরকারি ব্যয় যোগ করলে তা সরকারি ব্যয়ের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু শিক্ষার জনসম্পদ (public good)/চরিত্র বজায় রাখতে হলে সরকারি ব্যয় যথেষ্ট থাকতে হবে এবং সরকারকে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যয়ের উপর নজরদারি রাখতে হবে। বৃহত্তর জনস্বার্থের জিম্মাদার হিসেবে সরকারকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে। তৃতীয়ত, সম্পদের পর্যাপ্ততা শুধু ব্যয়ের পরিমানের ওপর নির্ভর করে না। সম্পদকে যথার্থ কাজে না লাগালে বাজেট বরাদ্দ অর্থহীন হয়ে যায়। বরাদ্দের যথার্থ ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে উপযুক্ত লক্ষ্য, সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ও লক্ষ্য অর্জনের কার্যকর কৌশলের ওপর। সব খাতের মতোই শিক্ষায়ও সরকারি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, সক্ষমতা, সততা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে (আহমদ ২০২৩,

পৃষ্ঠা ২৬২-২৬৩)। তবে এসবের অর্থ এই নয় যে যথেষ্ট রবাদ্দ না থাকলেও ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। বরং বলা যায় শিক্ষার্থী প্রতি বর্তমান ব্যয় থেকে ভালো ফল অর্জন প্রায় অসম্ভব।

শিক্ষার্থী প্রতি স্তরভেদে ব্যয় তুলনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশে আনুপাতিক হারে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং উন্নতদেশের তুলনায় বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যয় উচ্চশিক্ষার ব্যয়ের চেয়ে অনেক কম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে রাষ্ট্রের অধিকতর দায়িত্বের স্বীকৃতি থাকলেও, মানসম্মত শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থী-প্রতি প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হয় না। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থী-প্রতি ব্যয়ে ব্যবধান অনেক কম। ইউনেস্কো স্ট্যাটিসস্টিকস ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ের ১০ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী প্রতি সরকারি ব্যয় এবং উচ্চ শিক্ষায় ৩১ শতাংশ। মালয়েশিয়া তা যথাক্রমে ২৪ ও ২৫ শতাংশ এবং সিঙ্গাপুরে যথাক্রমে ২২ ও ২৪ শতাংশ (আহমদ, ২০২৩, পৃ. ২৭২-২৭৩)।

শিক্ষা একটি শ্রমঘন খাত। সরকারের বাজেট ব্যবস্থায় চলতি (রাজস্ব) ও উন্নয়ন এই দুই খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় হয়। শিক্ষা ব্যয়ের এক বড় অংশ জনবল খাতে, যা প্রধানত রাজস্বখাতের ব্যয়। অবকাঠামোজনিত ব্যয় হয় উন্নয়ন খাত থেকে। সংস্কারের সুপারিশগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে হলে উভয় ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি, উপযুক্ত প্রাক্কলন ও যথার্থ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

সংস্কারের বিভিন্ন সুপারিশের আলোকে এই সব ব্যয়ের ধরন, বিতরণ ও জবাবদিহি এবং ফলাফল - সাপেক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যথার্থ বিকেন্দ্রায়িত শাসন ও ব্যবস্থাপনা শ্রমঘন এই সেবাখাতে বিনিয়োগের কার্যকর ব্যবহারে সহায়ক হবে। মূল লক্ষ্য হবে পরিবারের সঙ্গতির অভাবে মানসম্মত শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বাংলাদেশের কোনো শিশু বঞ্চিত হবে না।

৮.৯ সংস্কারের সূচনা - পরবর্তী পদক্ষেপ

নবনির্বাচিত সরকার ও নতুন রাজনৈতিক আবহ শিক্ষা উন্নয়নের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে; তেমনি সংস্কার ও উন্নয়ন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক ইশতিহারে শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলোতে সামগ্রিক শিক্ষা উন্নয়নের দর্শন, লক্ষ্য ও কৌশলের যথার্থ প্রতিফলন থাকা দরকার। এজন্য কীভাবে এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তা স্পষ্ট করতে হবে। রাজনৈতিক ইশতিহারে তা স্পষ্ট করা সহজ নয়। তবে খণ্ডিত কিছু শিক্ষা টার্গেট থেকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা উন্নয়নের রূপকল্প, কর্মপরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয়, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়ন দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া এবং অর্থায়ন বিষয়ে সিদ্ধান্তে যেতে হবে, সেই স্বীকৃতি প্রয়োজন। এইসব ক্ষেত্রে অবহেলার কারণে অতীতের রাজনৈতিক

প্রতিশ্রুতি থেকে ফল পাওয়া যায়নি। আশার কথা এ পর্যন্ত কয়েকটি দল বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ক কমিশন গঠনের কথা বলেছে।

আমাদের প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু মাধ্যমিক শিক্ষা। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রথমত সমস্ত বিদ্যালয় শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা ও একই সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষা খাতের উপখাত হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন বোধ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে সংস্কারের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট পদক্ষেপ বিবেচনায় রাখা দরকার–

ক) বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যামিক শিক্ষা সংস্কার এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন টাস্কফোর্স অবিলম্বে গঠন করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় নিতে পারে।

খ) শিক্ষা খাত পরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা দেওয়া এবং এ সম্বন্ধে সরকারের অনুমোদন সংগ্রহ করার উদ্যোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে। প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপখাত উন্নয়ন হবে সামগ্রিক শিক্ষা খাত পরিকল্পনার অংশ। এই উদ্দেশ্যে নেতৃত্ব দিতে পারে প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়ের টাস্কফোর্স।

(গ) সমগ্র বিদ্যালয় শিক্ষাকে (প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত) একই মন্ত্রণালয়ের বা তত্ত্বাবধানের আওতায় নিয়ে আসার বিষয় বিবেচনা করার উদ্যোগ নিতে হবে। সর্বজনীন প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে এই পদক্ষেপ প্রয়োজন। নতুন রাজনৈতিক সরকারের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত হবে শিক্ষা উন্নয়নে এক ইতিবাচক বার্তা।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত মর্যাদা ও উন্নয়নে নতুন ভাবনার ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান কাঠামোতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বিষয়ে যে সব সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। দেশের মেধাবী ও আদর্শবান তরুণদের শিক্ষা পেশায় আকৃষ্ট করে ধরে রাখতে হবে। শিক্ষা জনবলের পেশাগত সক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা কাঠামো গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ গ্রহণ করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এই বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্তও হবে নতুন সরকারের শিক্ষায় অগ্রাধিকারের নিদর্শন।

বর্তমান প্রতিবেদনের সুপারিশ শিক্ষা সংস্কারের শেষ কথা নয়। আসল কথা, শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়ন অবহেলিত হয়ে এসেছে। এই অবহেলার অবসান ঘটাতে হবে। সামগ্রিক সংস্কারের প্রক্রিয়ার সূচনা হতে হবে - কালক্ষেপন না করে এবং খন্ডিত ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগে সীমাবদ্ধ না থেকে। শিক্ষা ও জনসম্পদ উন্নয়নের জন্য 'দশ সালা' জাতীয় এক মহাপরিকল্পনা নয় কেন?

তথ্যসূত্র

Ministry of Education. (2020). *Education sector plan (ESP) for Bangladesh fiscal years 2020/21–2024/25*. Government of the People's Republic of Bangladesh. https://www.globalpartnership.org/node/document/download?file=document/file/2020-12-Bangladesh-ESP.pdf

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981

আহমদ, এম. (২০২৩)। *একুশ শতকে বাংলাদেশ: শিক্ষার রূপান্তর*। প্রথমা প্রকাশন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়। (২০২৬)। শিক্ষা রুপকল্প দলিল ২০২৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কনসালটেশন কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি মাধ্যমিক-২ শাখা
shed.gov.bd

নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০০০.০৯১.৩৯.০১৩৬.১৮.৩৩

তারিখ: ৫ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২১ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অফিস আদেশ

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে নিম্নরূপভাবে একটি কনসালটেশন কমিটি গঠন করা হলো:

ক্রম	কমিটির সদস্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	কমিটিতে পদবি
১	ড. মনজুর আহমদ, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২	ড. মুহাম্মদ মোর্শেদ, সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩	জনাব মো: বেলায়েত হোসেন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৪	জনাব শাহীদা ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৫	পরিচালক (মাধ্যমিক উইং), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৬	ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান, উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
৭	জনাব মো: মুসা মিয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক	সদস্য
৮	জনাব মো: শফিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক (অবঃ), শেরে বাংলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়	সদস্য
৯	জনাব এ.কে.এম মোস্তফা কামাল, প্রধান শিক্ষক (অবঃ), আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১০	যুগ্মসচিব (সরকারি মাধ্যমিক অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য সচিব

ক. কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

১. মাধ্যমিক শিক্ষায় বিদ্যমান শিখন-শেখানো কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, গবেষণা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো পর্যালোচনা;

২. মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়পূর্বক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সময়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংস্কারের চাহিদা নিরূপণ;

৩. মাধ্যমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, গবেষণা এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামোর টেকসই মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

৪. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় বিদ্যমান কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো পর্যালোচনা এবং উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়ন;

খ. কমিটি কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনে কোনো বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ বা মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী/শিক্ষক/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে, ঢাকায় বা ঢাকার বাইরে কর্মশালা আয়োজন করতে পারবে এবং প্রয়োজনে মাধ্যমিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারবে;

গ. প্রজ্ঞাপন জারির তিন মাসের মধ্যে কমিটি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে এবং বাস্তবসম্মত সুপারিশসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে;

ঘ. কোন কর্মশালা/সেমিনার/সভা আয়োজন করা বা কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কমিটিকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবে;

ঙ. কনসালটেশন কমিটি সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

২১-১০-২০২৫
সাবিনা ইয়াসমিন
উপসচিব

নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০০০.০৯১.৩৯.০১৩৬.১৮.৩৩/১ (১৩)

তারিখ: ৫ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২১ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। ড. মনজুর আহমদ, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।
২। ড. মুহাম্মদ মোর্শেদ, সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। জনাব মো: বেলায়েত হোসেন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক-১ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
৫। জনাব শাহীদা ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম।
৬। যুগ্মসচিব , সরকারি মাধ্যমিক অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
৭। পরিচালক (মাধ্যমিক উইং), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান, উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা।
৯। জনাব মো: মুসা মিয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক।
১০। উপদেষ্টার একান্ত সচিব, উপদেষ্টার দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
১১। সচিব এর একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
১২। জনাব মো: শফিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক (অবঃ), শেরে বাংলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়।
১৩। জনাব এ.কে.এম মোস্তফা কামাল, প্রধান শিক্ষক (অবঃ), আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

২১-১০-২০২৫
সাবিনা ইয়াসমিন
উপসচিব

পরিশিষ্ট ২

পরামর্শক কমিটি কর্তৃক বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পরিদর্শন ও কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্য

জেলার নাম	উপজেলার নাম	কার্যাবলি	তারিখ
নোয়াখালী	সদর	• নোয়াখালী জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময়	০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
	সদর	• চর এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
যশোর	সদর	• যশোর জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময় • যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
	সদর	• যশোর সরকারি টিটিসির ফ্যাকাল্টিবৃন্দ এবং লেইস প্রজেক্টের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময়	১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
	কেশবপুর	• জলাবদ্ধ এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	
রাজশাহী	মহানগর	• রাজশাহী বিভাগের মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময় • রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় • রাজশাহী সরকারি টিটিসির ফ্যাকাল্টিবৃন্দ এবং ১ বছর মেয়াদি বি.এড শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়	২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	• অতি উচ্চ দারিদ্রপীড়িত এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	• কুলাউড়া উপজেলার হাকালুকি হাওড় সংলগ্ন একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	০৪ জানুয়ারি ২০২৬
	কমলগঞ্জ	• কমলগঞ্জ উপজেলার চা-বাগান সংলগ্ন একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	

জেলার নাম	উপজেলার নাম	কার্যাবলি	তারিখ
	সদর	• মৌলভীবাজার জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময়	০৫ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজার	সদর	• কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময়	১২ জানুয়ারি ২০২৬
বান্দরবান	আলীকদম	• আলীকদম উপজেলার পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়	১৩ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজার	উখিয়া	• উখিয়া উপজেলার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নিকটবর্তী একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়	১৪ জানুয়ারি ২০২৬
	সদর	• সদর উপজেলার একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়	
গাজীপুর	টঙ্গী	• বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড. প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় • জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড. প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রাইভেট টিটিসির অধ্যক্ষদের সাথে মতবিনিময় • টঙ্গীর শিল্প ও শ্রমঘন এলাকার একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বরিশাল	মহানগর	• বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় • বরিশাল সরকারি টিটিসির ফ্যাকাল্টিবৃন্দ এবং ৪ বছর মেয়াদি বি.এড. (সম্মান) শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়	১৮ জানুয়ারি ২০২৬
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	• পটুয়াখালী জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময় • সমুদ্র উপকূলবর্তী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	১৯ জানুয়ারি ২০২৬

পরিশিষ্ট ৩

পরামর্শক কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কর্মশালা এবং মতবিনিময় সভার তালিকা

ক্রম	সভার নাম	তারিখ	স্থান
০১	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি. আর. আবরার মহোদয়, এবং উক্ত মন্ত্রণায়লয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিতিমূলক সভা	২৬ অক্টোবর ২০২৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
০২	মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক এবং অংশীজনদের সাথে স্কোপিং/কার্যনির্ধারণী কর্মশালা	০৮ নভেম্বর ২০২৫	নায়েম
০৩	ভিশন কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনময়	০৩ ডিসেম্বর ২০২৫	নায়েম
০৪	নোয়াখালী জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময়	০৮ ডিসেম্বর ২০২৫	নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
০৫	নোয়াখালী জেলার চর এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়	০৯ ডিসেম্বর ২০২৫	পানামিয়া টি.এফ উচ্চ বিদ্যালয়
০৬	যশোর জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময়	১৩ ডিসেম্বর ২০২৫	যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
০৭	যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	১৩ ডিসেম্বর ২০২৫	যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
০৮	যশোর সরকারি টিটিসির ফ্যাকাল্টিবৃন্দ এবং লেইস প্রজেক্টের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময়	১৪ ডিসেম্বর ২০২৫	যশোর সরকারি টিটিসি
০৯	যশোর জেলার জলাবদ্ধ এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়	১৪ ডিসেম্বর ২০২৫	কাটাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১০	রাজশাহী বিভাগের মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময়	২৩ ডিসেম্বর ২০২৫	রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
১১	রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	২৩ ডিসেম্বর ২০২৫	রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

ক্রম	সভার নাম	তারিখ	স্থান
১২	রাজশাহী সরকারি টিটিসির ফ্যাকাল্টিবৃন্দ এবং ১ বছর মেয়াদি বি.এড শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়	২৩ ডিসেম্বর ২০২৫	রাজশাহী সরকারি টিটিসি
১৩	শিবগঞ্জ উপজেলার অতি দারিদ্রপীড়িত এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়	২৪ ডিসেম্বর ২০২৫	রাণীহাটি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
১৪	কুলাউড়া উপজেলার হাকালুকি হাওড় সংলগ্ন এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়	০৪ জানুয়ারি ২০২৬	ভূকশিমইল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ
১৫	কমলগঞ্জ উপজেলার চা-বাগান সংলগ্ন এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়	০৪ জানুয়ারি ২০২৬	মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়
১৬	মৌলভীবাজার জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময়	০৫ জানুয়ারি ২০২৬	মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
১৭	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	০৬ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
১৮	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	০৬ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
১৯	ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	০৬ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
২০	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	০৭ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
২১	ব্যানবেইসের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	০৭ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
২২	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	০৭ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
২৩	ঢাকা টিটিসি-র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	০৭ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
২৪	বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	০৮ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
২৫	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	০৮ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
২৬	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	০৮ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম

ক্রম	সভার নাম	তারিখ	স্থান
২৭	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	০৮ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
২৮	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	০৮ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
২৯	বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	১১ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
৩০	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	১১ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
৩১	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	১১ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
৩২	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	১১ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
৩৩	এসোসিয়েশন অব টিচার এডুকেটরস বাংলাদেশ (আটেব)-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	১১ জানুয়ারি ২০২৬	নায়েম
৩৪	কক্সবাজার এবং বান্দরবান জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময়	১২ জানুয়ারি ২০২৬	কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
৩৫	আলীকদম উপজেলার পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়	১৩ জানুয়ারি ২০২৬	আলীকদম আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় এবং মাতামুহুরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৩৬	উখিয়া উপজেলার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নিকটবর্তী একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়	১৩ জানুয়ারি ২০২৬	কুতুপালং উচ্চ বিদ্যালয়
৩৭	কক্সবাজার সদর উপজেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়	১৩ জানুয়ারি ২০২৬	কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
৩৮	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড. প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টিবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	১৪ জানুয়ারি ২০২৬	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
৩৯	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড. প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রাইভেট টিটিসির অধ্যক্ষদের সাথে মতবিনিময়	১৫ জানুয়ারি ২০২৬	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রম	সভার নাম	তারিখ	স্থান
৪০	টঙ্গীর শিল্প ও শ্রমঘন এলাকার একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়	১৫ জানুয়ারি ২০২৬	মজিদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
৪১	বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	১৮ জানুয়ারি ২০২৬	বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
৪২	বরিশাল সরকারি টিটিসির ফ্যাকাল্টিবৃন্দ এবং ৪ বছর মেয়াদি বি.এড. (সম্মান) শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়	১৮ জানুয়ারি ২০২৬	বরিশাল সরকারি টিটিসি
৪৩	পটুয়াখালী জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময়	১৯ জানুয়ারি ২০২৬	হোটেল খান প্যালেস
৪৪	সমুদ্র উপকূলবর্তী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়	১৯ জানুয়ারি ২০২৬	কুয়াকাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

পরিশিষ্ট ৪

এক নজরে সুপারিশের ক্ষেত্রসমূহ ও এগুলোর বাস্তবায়নের সময়সীমা

সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকার ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, কিছু সুপারিশ একাধিক বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য বিধায় সেগুলো উভয়ক্ষেত্রেই উল্লেখ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের প্রস্তুতি আশু গ্রহণ করতে হবে যা পরবর্তী সময়ে সম্পন্ন হবে। নিচের ছকে সুপারিশমালার ক্রম বিভিন্ন অধ্যায়ে সুপারিশের ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		আশু	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন				
০১	বিদ্যালয়ভিত্তিক দক্ষতা-স্তর নির্ধারণ ও নিরাময় সেশন চালু			
০২	পাঠ্যবিষয় পর্যালোচনা ও ভিত্তিমূলক ক্ষেত্র অগ্রাধিকার নির্ধারণ			
০৩	দশম শ্রেণি পর্যন্ত অবিভাজিত শিক্ষাক্রম			
০৪	বিদ্যালয়ভিত্তিক সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের গুরুত্ব			
০৫	বিদ্যালয়ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সহায়তা			
০৬	বিদ্যালয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ			
০৭	পাঠ্যক্রম, শিক্ষণপদ্ধতি ও দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়নে গুরুত্ব প্রদান			
০৮	চাহিদাভিত্তিক পাঠদান (Differentiated Instruction)			
০৯	পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইতে দক্ষতা স্তরভিত্তিক শিখন নির্ধারণে গুরুত্ব			
১০	সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম ও মূল্যায়ন			
১১	উপজেলা পর্যায়ে কাউন্সেলিং নেটওয়ার্ক ও প্যারা কাউন্সেলার তৈরিতে গুরুত্ব প্রধান			
১২	পাবলিক পরীক্ষা ও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন			

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		আশু	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
১৩	অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা ও বৃত্তি পরীক্ষা অপ্রয়োজনীয়			
১৪	মানসম্মত ডিজিটাল কনটেন্ট ও ব্লেন্ডেড লার্নিং			
১৫	নমনীয় বিদ্যালয় ও বার্ষিক শিক্ষাপঞ্জি			
১৬	শিক্ষাক্রম উন্নয়ন			
১৭	সামগ্রিক বিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়ন			
শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী				
০১	শূন্যপদ পূরণ			
০২	শিক্ষক প্রস্তুতি			
০৩	শিক্ষকের জবাবদিহি			
০৪	শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা			
০৫	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ও নৈতিক মূল্যবোধ			
০৬	পেশাগত শিখন সমাজ			
০৭	শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত			
০৮	শিক্ষক বদলি নীতি			
০৯	শিক্ষাবিজ্ঞানে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার			
১০	জনবল বৃদ্ধি ও পদোন্নতি			
১১	স্ব-মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা			
১২	প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন			
১৩	বিদ্যালয়ে কর্মরত থেকে পদোন্নতি			
১৪	মূল্যবোধের চর্চা			
১৫	শিক্ষকতা পেশার উচ্চতম মর্যাদা			
অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন				
০১	দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তা			
০২	ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পুনঃভর্তি ও ধরে রাখার কর্মসূচি			

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		আশু	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
০৩	দুর্গম এলাকায় শিক্ষক সংকট মোকাবিলায় দ্রুত নিয়োগ ও পদায়ন			
০৪	নিরাপদ ও সহিংসতামুক্ত বিদ্যালয় পরিবেশ			
০৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্য নৃ-গোষ্ঠী এলাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা			
০৬	প্রতিবন্ধী ও বিশেষচাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্যোগ			
০৭	প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকায় নতুন সরকারি ও আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন			
০৮	নারী শিক্ষক নিয়োগ ও ধরে রাখার জন্য প্রণোদনা			
০৯	অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জীবনদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত			
১০	ডিজিটাল বৈষম্য নিরসনে সমতাভিত্তিক বিনিয়োগ			
১১	বৈষম্য-সচেতন মনিটরিং ও একাডেমিক তদারকি জোরদার			
১২	জলবায়ু ও দুর্যোগ-সহনশীল শিক্ষা অবকাঠামো ও জরুরি শিক্ষা ব্যবস্থা			
১৩	বিদ্যালয় শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক ও আইনি স্বীকৃতি			
১৪	দেশব্যাপী শক্তিশালী বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহি কাঠামো			
বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা				
০১	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি			
০২	প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ ও যোগ্যতা			
০৩	বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখন উন্নয়ন			
০৪	বিদ্যালয় পর্যায়ে ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা			
০৫	কমিউনিটির কাছে দায়বদ্ধতা			
০৬	জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ			

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		আশু	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
মাধ্যমিক শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনা				
০১	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা			
০২	জনবল ও সক্ষমতা			
০৩	বিকেন্দ্রায়ন			
০৪	শিক্ষা জনবল ব্যবস্থাপনা			
০৫	শিক্ষাবিজ্ঞানে ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার			
০৬	অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন উদ্যোগ			
০৭	সামগ্রিক শিক্ষাখাত পরিকল্পনা			
০৮	অদক্ষতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ			
৯	উন্নত বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা			
১০	মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব			
১১	স্থায়ী শিক্ষা কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা টাস্কফোর্স			
সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান				
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ				
০১	সেক্টর-ভিত্তিক পরিকল্পনা ও স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা			
০২	নীতিনির্ধারণী সক্ষমতা জোরদারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ -এর প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদ পুনর্গঠন			
০৩	শিক্ষা-সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ বিচারিক ব্যবস্থা ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়			
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর				
০৪	মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকার প্রদান			
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড				
০৫	আইন ও বিধিমালা আধুনিকায়ন			
০৬	জনবল কাঠামোর বিশেষায়ন, আধুনিকায়ন ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ			

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		আশু	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর				
০৭	জনবল বৃদ্ধি ও বিশেষায়িত নিয়োগ			
০৮	অভিযোগ তদন্তে নিরপেক্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা			
০৯	সমন্বিত একাডেমিক পরিদর্শন, সনদ যাচাই ও এমপিও সংক্রান্ত অনিয়ম ব্যবস্থাপনা			
১০	আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অটোমেশন			
নায়েম				
১১	বিশেষায়িত মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ফলাফলভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা			
ব্যানবেইস				
১২	প্রকল্প-নির্ভরতা হ্রাস ও স্থায়ী জনবল কাঠামো			
১৩	টেকসই অর্থায়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ডেটা ব্যবস্থাপনা			
টিটিসি				
১৪	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে টিটিসির অংশগ্রহণ			
এনটিআরসিএ				
১৫	দক্ষতা ও পেশাগত উপযুক্ততা যাচাইয়ে শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ পরীক্ষার সংস্কার			
১৬	প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়			
বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট				
১৭	স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ			
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়				
১৮	অংশগ্রহণমূলক ও সময়োপযোগী বি.এড শিক্ষাক্রম সংস্কার			
১৯	একাডেমিক নেতৃত্ব ও মাননিয়ন্ত্রণ কাঠামো শক্তিশালীকরণ			

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		আশু	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
২০	পরীক্ষা, ফলাফল ও একাডেমিক ক্যালেন্ডারে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ			
২১	প্রশাসনিক সক্ষমতা উন্নয়ন এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়			
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (স্কুল অফ এডুকেশন)				
২২	দূরশিক্ষণ দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একাডেমিক কাঠামো ও শিক্ষার্থী সম্পৃক্ততা জোরদার			
২৩	শিক্ষাক্রম, শিক্ষণ উপকরণ, একাডেমিক রিসোর্স ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি			
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর				
২৪	ঠিকাদার নির্বাচন ও তদারকিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি			
বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারি অবসর সুবিধা বোর্ড ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট				
২৫	প্রাতিষ্ঠানিক একীভূতকরণ ও সেবা প্রক্রিয়ার সরলীকরণ			
২৬	পেন্ডিং আবেদন নিষ্পত্তিতে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা, বাজেট ও জনবল			
২৭	ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন ও স্বয়ংক্রিয় অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা জোরদারকরণ			
২৮	স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কাঠামো জোরদারকরণ			
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ				
২৯	মাধ্যমিক শিক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ			
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ অধিদপ্তর				
৩০	পেশাদার, শিক্ষাবিষয়ে দক্ষ ও স্থায়ী মানবসম্পদ কাঠামো নিশ্চিতকরণ			
৩১	মাউশির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদারে কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন			

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		আশু	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
৩২	মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যকর আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা			
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড				
৩৩	গবেষণা ও গুণগত মানোন্নয়ন সেল গঠন			
৩৪	আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও আঞ্চলিক শিক্ষা পরিকল্পনা			
৩৫	প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন ও পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন			
এনসিটিবি				
৩৬	শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে এনসিটিবি -এর মূল কার্যাবলির পুনঃসংজ্ঞায়ন ও গবেষণাভিত্তিক রূপান্তর			
৩৭	বিশেষায়িত ও পেশাদার মানবসম্পদ কাঠামো গঠনের মাধ্যমে এনসিটিবি -এর কারিগরি সক্ষমতা জোরদার			
৩৮	প্রমাণভিত্তিক শিক্ষাক্রম সংস্কার ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হ্রাসে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা			
৩৯	শিক্ষাক্রমের উল্লম্ব ও আনুভূমিক সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদারকরণ			
নায়েম				
৪০	সমন্বিত প্রশিক্ষণ মাস্টার প্ল্যান ও ডিজিটাল ডাটাবেজের মাধ্যমে নায়েম -এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ভূমিকা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ			
৪১	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ ও টেকসই অর্থায়ন			
ব্যানবেইস				
৪২	সমন্বিত জাতীয় শিক্ষা ডেটা সেন্টারে রূপান্তর			
টিটিসি				
৪৩	সমন্বিত জাতীয় শিক্ষক উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ও টেকসই অর্থায়ন কাঠামো প্রণয়ন			

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		আশু	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
৪৪	প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ও বিশেষায়িত বিভাগ প্রতিষ্ঠা			
৪৫	জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও নেতৃত্ব বিকাশ			
৪৬	অবকাঠামো উন্নয়ন ও ল্যাব স্কুল পুনঃপ্রতিষ্ঠা			
৪৭	১ বছর ও ৪ বছর মেয়াদি বি.এড প্রোগ্রামের কাঠামোগত সংস্কার			
এনটিআরসিএ				
৪৮	বিশেষায়িত মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-কে কার্যকর সংস্থায় রূপান্তর			
৪৯	তথ্যভিত্তিক শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ ও প্রক্ষেপণের মাধ্যমে সময়োপযোগী নিয়োগ			
বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট				
৫০	বিশেষায়িত মানবসম্পদ ও গবেষণাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি			
৫১	শিক্ষা বোর্ডসমূহের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের মানগত সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ			
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (স্কুল অফ এডুকেশন)				
৫২	স্টাডি সেন্টারভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন, টিচিং প্র্যাকটিস ও টিউটর ব্যবস্থার মাননিয়ন্ত্রণ			
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর				
৫৩	বিকেন্দ্রীকৃত ও অংশগ্রহণমূলক অবকাঠামো পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রবর্তন			
৫৪	শিশু-বান্ধব ও দেশীয় স্থাপত্যভিত্তিক বিশেষায়িত নকশা সক্ষমতা উন্নয়ন			
৫৫	জনবল, রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই বাজেট কাঠামো শক্তিশালীকরণ			

পরিশিষ্ট ৫

মাধ্যমিক শিক্ষায় সহায়ক এবং নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ (Secondary and Higher Education Division - SHED) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী, প্রশাসনিক ও তদারকি বিভাগ, যা দেশের মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, উন্নয়ন, পরিচালনা ও মানোন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে। "সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা" ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের নভেম্বরে মন্ত্রণালয়কে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ গঠিত হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নীতি, আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক তদারকি নিশ্চিত করা হয়। একজন সচিব অথবা সিনিয়র সচিব-এর নেতৃত্বে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অভ্যন্তরে প্রশাসন ও অর্থ, মাধ্যমিক-১ (সরকারি), মাধ্যমিক-২ (বেসরকারি), কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন, পরিকল্পনা, এবং নিরীক্ষা ও আইন - এই প্রধান অনুবিভাগসমূহ এবং তাদের অধীন বিভিন্ন অধিশাখা ও শাখাসমূহের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা হয়। এই বিভাগটির প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে আইন, বিধি ও নির্দেশিকা প্রণয়ন ও সংশোধন; সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদারকি; বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ ব্যবস্থাপনা; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ ইত্যাদি। এসব সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাকে মানসম্মত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সকলের জন্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে।

২. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (Directorate of Secondary and Higher Education - DSHE), সংক্ষেপে মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রধান বাস্তবায়নকারী ও তদারকি সংস্থা। এটি দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে। স্বাধীনতার পর শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে ১৯৮১ সালে ডিরেক্টরেট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (DPI) মাউশিতে রূপান্তরিত হয়। 'Education for All (EFA)' বাস্তবায়ন এবং নারী, অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাই এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরটিকে একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। অধিদপ্তরের অন্তর্গত চারটি প্রধান উইং - কলেজ ও প্রশাসন, মাধ্যমিক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি উইং পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও গবেষণা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সদর দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কলেজ ও প্রশাসন উইং সরকারি কলেজের প্রশাসন, শিক্ষক বদলি ও পদায়ন এবং সামগ্রিক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে। মাধ্যমিক উইং সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক তদারকি ও এমপিও কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত, আর প্রশিক্ষণ উইং শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সমন্বয় করে। এছাড়া মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন এবং ফিন্যান্স এন্ড প্রকিউরমেন্ট উইং তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেন। অধিদপ্তরের আওতায় একটি বিস্তৃত ও জনবল কাঠামো বিদ্যমান। মাঠপর্যায়ে ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ৬৪টি জেলা শিক্ষা অফিস এবং ৪৯৫টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাউশি বর্তমানে প্রায় ত্রিশ হাজার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার লক্ষ তের হাজার শিক্ষক এবং প্রায় ১.৩৮ কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি করে। এছাড়া অধিদপ্তরের অধীনে ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (TTC) এবং ৫টি উচ্চ

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (HSTTI) পরিচালিত হচ্ছে, যা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী একটি স্বায়ত্তশাসিত ও স্ব-নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ১৯২১ সালে East Bengal Secondary Education Board নামে প্রথম শিক্ষাবোর্ড গঠিত হয়, যা পরে Board of Intermediate and Secondary Education, East Pakistan নামে পরিচিত হয়ে ১৯৭১ সালের পর 'ঢাকা বোর্ড' নামে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৬১ সালের পর থেকে The Intermediate and Secondary Education Ordinance, ১৯৬১ এর আওতায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে থাকা বৃহত্তর অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৬২ সালে রাজশাহী, কুমিল্লা, ও যশোর বোর্ড গঠিত হয়, যা ঢাকা বোর্ডের বিভাজন থেকে তৈরি হয়। পরবর্তীতে একই Ordinance, ১৯৬১-এর আওতায় চট্টগ্রাম (১৯৯৫), বরিশাল (১৯৯৯), সিলেট (১৯৯৯), দিনাজপুর (২০০৬) এবং ময়মনসিংহ (২০১৭) শিক্ষাবোর্ড গঠিত হয়। সকল শিক্ষাবোর্ড Ordinance, ১৯৬১ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষাবোর্ডসমূহ মূলত বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, নবায়ন, স্বীকৃতি, বিভিন্ন বিষয় ও বিভাগ খোলা ও পাঠদানের অনুমতি প্রদান করে থাকে; পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (SMC) ও কলেজের গভর্ণিং বডির অনুমতি প্রদান করে থাকে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অনুমোদন এবং আপীল নিষ্পত্তিকরণ করে। শিক্ষার্থীদের ষষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নিবন্ধন, একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি এবং পাবলিক পরীক্ষার (SSC & HSC) ফরম পূরণ সম্পন্ন করার পাশাপাশি এসএসসি (SSC) ও এইচএসসি (HSC) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও ফলাফল প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান, NID এর সাপেক্ষে তথ্য সংশোধন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গমনেচ্ছুদের SSC ও HSC পরীক্ষার ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট যাচাইয়ের কাজও বোর্ড করে থাকে। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং শাখাসমূহের প্রধান ও ডেপুটি প্রধানগণ ডেপুটেশনে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ও বাদ বাকি জনবল স্থায়ীভাবে ও স্থানীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সর্বোপরি, বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠদান প্রক্রিয়া তদারকি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে থাকে।

৪. পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সরকারি বিধি-বিধানের অনুসরণ, অর্থের সদ্ব্যবহার এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালের ১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন পরিচালক ও একজন যুগ্ম পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অধিদপ্তরটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী- এই চারটি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগ একজন উপ-পরিচালকের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার নেতৃত্বে দাপ্তরিক দল নিয়োজিত থাকে। এই অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকার প্রদত্ত বেতন-ভাতা ও মঞ্জুরিসহ সকল তহবিল নির্ধারিত খাতে সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা। এর আওতায় প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত তথ্যের সঠিকতা, বেতন-ভাতা প্রাপ্তির শর্তাবলি, শিক্ষক-কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং সরকারি আদেশ-নির্দেশনার বাস্তবায়ন যাচাই করা হয়। এছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়নে পরিকল্পিত পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও অনিয়ম তদন্ত এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন বিশেষ দায়িত্ব পালন করাও এই অধিদপ্তরের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

৫. এনসিটিবি

বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, উন্নয়ন ও সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (National Curriculum and Textbook Board - NCTB)। পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সূচনা ঘটে দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে 'পূর্ববঙ্গ স্কুল টেক্সটবুক কমিটি' গঠনের মাধ্যমে, যার কাজ ছিল প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন। পরে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে কাঠামোগত

সীমাবদ্ধতা ও প্রশাসনিক জটিলতার প্রেক্ষিতে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে টেক্সটবুক আইন প্রণীত হয় এবং 'স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭০-এর দশকে নবজাত রাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকসমূহ ব্যাপকভাবে সংশোধন, পুনর্লিখন ও আধুনিকীকরণ করা হয়। ১৯৮৩ সালে 'The National Curriculum & Textbook Board Ordinance, ১৯৮৩'-এর মাধ্যমে স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড ও জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র একীভূত হয়ে বর্তমান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বোর্ডের কার্যক্রম আরও যুগোপযোগী ও কার্যকর করতে ২০১৮ সালে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়, যা এনসিটিবি-কে একটি শক্তিশালী ও আধুনিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়ার কথা।

এনসিটিবি-র প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে রয়েছেন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চেয়ারম্যান, যিনি বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন। বর্তমানে চারটি প্রধান উইং - শিক্ষাক্রম, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অর্থ, চারজন পূর্ণকালীন সদস্যের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। বোর্ডের সচিব অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, জনবল ব্যবস্থাপনা ও বোর্ড সভাসহ দাপ্তরিক কার্যক্রম সমন্বয় করেন। বর্তমানে এনসিটিবি-তে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৩০০-এর অধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন, পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সংযুক্তভাবে কাজ করছেন। কারিকুলাম বিশেষজ্ঞরা শিক্ষাবিষয়ক নীতি, পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতা যাচাই এবং শ্রেণি-ভিত্তিক বিষয়বস্তু নির্ধারণে দায়িত্ব পালন করেন। গবেষণা কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহ এবং পাঠ্যবই সংশোধনে পরামর্শ প্রদান করেন। সচিব ও অন্যান্য প্রশাসনিক ও কারিগরি কর্মকর্তারা নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা, মুদ্রণ কার্যক্রম তদারকি, তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। ভবিষ্যতে ২০১৮ সালের আইনের আলোকে কারিগরি, মাদ্রাসা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা নামে চারটি নতুন উইং সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে। কার্যাবলির দিক থেকে এনসিটিবি দেশের প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরিমার্জন ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করে। এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, মুদ্রণ ও সারা দেশে বিনামূল্যে বিতরণ একটি বৃহৎ ও জটিল কার্যক্রম। এছাড়া প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী পাঠ্যসামগ্রী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষাভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক এবং ডিজিটাল ও ইন্টার‍্যাকটিভ বই উন্নয়নে বোর্ড কাজ করছে।

৬. নায়েম

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (National Academy for Educational Management - NAEM) বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বগুণ এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিষ্ঠিত। নায়েমের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৯ সালে, 'এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টার (EEC)' হিসেবে, যা পরে 'বাংলাদেশ এডুকেশন এক্সটেনশন এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (BEERI)' এবং ১৯৮২ সালে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সটেনশন অ্যান্ড রিসার্চ (NIEAER)' হিসেবে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯২ সালে NIEAER-কে পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) নামে পূর্ণাঙ্গ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে কাজ করছে। নায়েমের রূপকল্প হলো দক্ষ, যোগ্য ও সৃজনশীল শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক গড়ে তোলা, এবং মিশন হলো মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষণ-শিখন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে পেশাদার, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন কর্মী তৈরি করা। প্রতিষ্ঠানটি বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান ও অধ্যক্ষদের জন্য প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স, কম্পিউটার, আইসিটি ও লাইব্রেরি প্রশিক্ষণ, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং শিক্ষা গবেষণা ও সেমিনারের মাধ্যমে দেশব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। নায়েমের কার্যক্রমে চারটি প্রধান বিভাগ হলো- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন, গবেষণা ও নথিকরণ এবং প্রশাসন ও অর্থ। প্রতিটি

বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন করে পরিচালক থাকেন। পরিচালকগণকে সহায়তার জন্য ৭ জন উপ-পরিচালক, ১৬ জন সহকারী পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং প্রশাসনিক ও কারিগরি কর্মকর্তা কাজ করেন। প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারীরা নির্দিষ্ট কোর্সের লজিস্টিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে; শিক্ষক প্রশিক্ষকরা কোর্স পরিচালনা, মডিউল তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন।

৭. ব্যানবেইস

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরে একটি বিশেষ স্কিমের মাধ্যমে ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে 'বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো' (ব্যানবেইস) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো সমন্বিত শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান বিনির্মাণ, ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং দেশব্যাপী আইসিটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে তথ্যনির্ভর শিক্ষা পরিকল্পনা ও দক্ষ মানবসম্পদ নিশ্চিত করা। একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ে ১৭৫ জন এবং মাঠ পর্যায়ে ৬৪০ জন জনবল নিয়ে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি অনলাইন জরিপ ও জাতীয় ডাটা ওয়্যার হাউসের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেও ডাটাবেইস তৈরি, হালনাগাদ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আধুনিক জিআইএস (Education GIS - School Mapping) পদ্ধতির মাধ্যমে পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সহায়তা এবং ডিজিটাল লাইব্রেরি পরিচালনা, ই-বুক ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য সহজলভ্যকরণ ও উচ্চশিক্ষার অনলাইন স্কলারশিপ প্রক্রিয়া বিষয়ে কাজ করে। কেন্দ্রীয় আইসিটি ল্যাব এবং প্রতিটি উপজেলায় স্থাপিত 'ইউআইটিআরসিই' (UITRCE) সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসনের সকল স্তরের জনবল ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে তৃণমূল পর্যায়ে ই-সেবা প্রদান করা, শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা করা এবং ইউনেস্কোসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে তথ্য বিনিময় ও সমন্বয় করাও এর অন্যতম কাজ।

৮. টিটিসি

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (টিটিসি) বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ১৯০৯ সালের ৬ জানুয়ারি ঢাকার আরমানিটোলায় দেশের প্রথম টিটিসি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বর্তমানে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরে এর কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক বিষয়গুলো মন্ত্রণালয় ও মাউশি তদারকি করলেও এর একাডেমিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এর সাংগঠনিক কাঠামোতে শীর্ষে থাকেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ; অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকরা শিক্ষাদান করেন। টিটিসি মূলত দক্ষ শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে ১ বছর মেয়াদি বি.এড, ১ বছর মেয়াদি এম.এড এবং ৪ বছর মেয়াদি বি.এড অনার্স কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত বিভিন্ন ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ করে LAISE প্রজেক্টের আওতায় এনটিআরসিএ-এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের ৫৬ দিনের ফাউন্ডেশনাল ট্রেনিং প্রদান করে থাকে। পাশাপাশি শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, অটিজম সচেতনতা এবং উচ্চতর আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিজিটাল শিক্ষা প্রসারে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে।

৯. এনটিআরসিএ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority - NTRCA) ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য হলো দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা। প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫-এর মাধ্যমে গঠিত, যা এনটিআরসিএ-এর পরিচালনা, ক্ষমতা ও কার্যক্রমসমূহকে সংজ্ঞায়িত করে। এ আইন ছাড়াও, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ এবং এনটিআরসিএ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের নিবন্ধন, প্রত্যয়ন, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা নির্ধারিত হয়েছে।

এনটিআরসিএ-এর প্রধান কার্যক্রম হলো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ, শিক্ষকতা পেশায় যোগ্যতা নির্ধারণ, জাতীয় শিক্ষক মান নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তীর্ণ শিক্ষকদের নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান, এবং মেধা ও পছন্দের ভিত্তিতে নিয়োগ সুপারিশ করা। এছাড়া, আন্তর্জাতিক যোগ্যতা যাচাই, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মানোন্নয়ন এবং আইন ও বিধি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করাও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এনটিআরসিএ-এর কার্যক্রম প্রশাসন ও অর্থ, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান, এবং পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন এই তিনটি প্রধান অনুবিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ বাজেট, মানবসম্পদ, ক্রয়, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও সচিবালয় নির্দেশনাসহ সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি করে। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন, হালনাগাদ, মেধা তালিকা প্রস্তুতি, শূন্যপদের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই, অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, প্রার্থী নির্বাচন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগ পরীক্ষা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, প্রশ্নপত্র প্রস্তুতি ও বিতরণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, মৌখিক পরীক্ষা আয়োজন, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রত্যয়নপত্র মুদ্রণ ও বিতরণ নিশ্চিত করে। ৬৯ জনের বেশি স্থায়ী জনবল এনটিআরসিএ-তে কর্মরত, যারা প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে।

১০. বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট

বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (Bangladesh Examination Development Unit - BEDU) ২০০৪ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (SESIP) আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ইউনিটের মূল উদ্দেশ্য হলো শিখন মূল্যায়ন পদ্ধতিকে মুখস্থ বা জ্ঞান-ভিত্তিক কৌশল থেকে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন) অন্তর্ভুক্ত করে আধুনিক ও কার্যকর পদ্ধতিতে রূপান্তর করা। এই ইউনিট মূলত একটি গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, যা পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করে এবং সরকারের নীতি নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান করে। দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডের জন্য নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। বিইডিইউ-এর উদ্যোগে ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হয়, যা পরবর্তীতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সম্প্রসারিত করা হয়। এই ইউনিট সারা দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেখানে প্রশ্ন সেটাপ, মডারেটর এবং মাস্টার ট্রেইনারদের মাধ্যমে প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। এছাড়া, প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার পর 'ইমপ্যাক্ট স্টাডি' পরিচালনা করা হয় এবং সরকারের চাহিদামতো পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। এর অনুমোদিত জনবল ১৭ জন, যার মধ্যে ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, গবেষণা কর্মকর্তা, কম্পিউটার অপারেটর অন্তর্ভুক্ত। প্রধান অধিকাংশ পদ বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের মাধ্যমে প্রেষণ ভিত্তিতে পূরণ করা হয়, বাকিগুলো প্রকল্পভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে হয়; কিন্তু বর্তমানে অনেক পদ শূন্য। প্রতিষ্ঠানটি তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে সারা দেশে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

১১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯২ সালে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রস্তুতিতে কাজ করছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে শিক্ষকতা পেশার উৎকর্ষ সাধনে বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়; এর মধ্যে এক বছর মেয়াদি প্রফেশনাল বিএড (B.Ed) মূলত কর্মরত মাধ্যমিক শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং চার বছর মেয়াদি বিএড (অনার্স) প্রোগ্রামটি প্রাক-সার্ভিস শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে নকশা করা হয়েছে। এসব প্রোগ্রামে শিক্ষণ দক্ষতা, শিক্ষাক্রম, শিশুর ক্রমবিকাশ, মূল্যায়ন, প্রতিফলনমূলক অনুশীলন এবং আধুনিক আইসিটি শিক্ষার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক পেডাগজি বা শিক্ষণবিজ্ঞান পড়ানো হয়। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণামুখী সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এক বছর মেয়াদি এমএড (M.Ed) প্রোগ্রামও পরিচালিত হয়। এছাড়া, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে বিএসএড (BSEd) ও এমএসএড (MSEd) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে বুদ্ধি, বাক ও শ্রবণ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিভাগে বিশেষায়িত শিক্ষণ-পদ্ধতি শেখানো হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এসব প্রোগ্রামের কারিকুলাম প্রস্তুত ও সার্টিফিকেট প্রদানের দায়িত্ব পালন করে এবং নির্ধারিত যোগ্যতা

সাপেক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষক নন- উভয় ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তির সুযোগ পায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রশিক্ষণে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক তত্ত্বধান পরিচালনা করে।

১২. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (স্কুল অফ এডুকেশন)

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (Bangladesh Open University - BOU)-এর ছয়টি স্কুলের মধ্যে একটি হলো স্কুল অফ এডুকেশন। ১৯৯২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্কুল অফ এডুকেশন শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই স্কুলের প্রধান লক্ষ্য হলো দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা উন্নয়ন করা, শিক্ষক শিক্ষার মান উন্নত করা এবং দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পেশাদার তৈরি করা। স্কুল অফ এডুকেশন ওপেন ও ডিস্ট্যান্স লার্নিং (ODL) পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন একাডেমিক প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে: ব্যাচেলর অফ এডুকেশন (B.Ed), ব্যাচেলর অফ মাদ্রাসা এডুকেশন (B.MEd), মাস্টার অফ এডুকেশন (M.Ed), মাস্টার অফ ফিলোসফি (MPhil) এবং ডক্টর অফ ফিলোসফি (PhD)। B.Ed প্রোগ্রামটি শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিতদের পেডাগজি ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদানের জ্ঞান, দক্ষতা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে তাত্ত্বিক পাঠ এবং শিক্ষাদানের প্র্যাকটিক্যাল সেশন অন্তর্ভুক্ত। স্কুল অফ এডুকেশনের প্রোগ্রামগুলো ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং বিভিন্ন সমন্বিত স্টাডি সেন্টারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, সিলেট, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য প্রধান অঞ্চলে অবস্থিত, যা দেশের সব প্রান্তে শিক্ষক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালযের বি.এড প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং এদের আশি শতাংশের অধিক এক বছরের মধ্যে ডিগ্রি সম্পন্ন করে।

১৩. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও নতুন ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে তৎকালীন 'ডিপিআই'-এর অধীনে গঠিত 'ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট' পরবর্তীতে ২০০২ সালে পূর্ণাঙ্গ 'শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর' (ইইডি) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য সকল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠদান উপযোগী আধুনিক, মানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা। এই অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় এবং এর কার্যক্রম সারা দেশে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে আছেন প্রধান প্রকৌশলী। তাঁকে সহায়তা করার জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ১ জন পরিচালক ও ২ জন উপ-পরিচালক এবং বিভিন্ন ডেস্কের নির্বাহী প্রকৌশলীরা থাকেন। বিভাগীয় পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীরা জোনাল অফিস পরিচালনা করেন। জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীরা মূল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তৃণমূল পর্যায়ে সরাসরি কাজ তদারকির জন্য উপজেলায় উপ-সহকারী প্রকৌশলীরা দায়িত্বরত থাকেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা ও ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং জরাজীর্ণ ভবন সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ। আধুনিক বিজ্ঞানাগার, আইসিটি ল্যাব, লাইব্রেরি, সীমানা প্রাচীর ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার (WASH block) মতো প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ ও বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করাও এর অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ-এর অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর প্রাক্কলন (estimate) তৈরি, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও নির্মাণকাজ তদারকি থেকে শুরু করে ভবন হস্তান্তর পর্যন্ত যাবতীয় কারিগরি ও দাপ্তরিক দায়িত্ব এই অধিদপ্তর পালন করে।

১৪. বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারি অবসর সুবিধা বোর্ড ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি 'সংবিধিবদ্ধ' প্রতিষ্ঠান। মূলত এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের পেনশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে ২০০২ সালে বোর্ডটি

প্রতিষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে থাকা বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের জাতীয় বাজেট থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

১৯৯০ সালের একটি সংবিধিবদ্ধ আইন (আইন নং-২৮, ১৯৯০) অনুযায়ী গঠিত 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট' বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করার একটি বিশেষ সংস্থা। একজন চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সচিব এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এই ট্রাস্টটি মূলত শিক্ষকদের বেতনের অংশ এবং সরকারি অনুদানের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিলের স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত অডিট নিশ্চিত করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের পর তাঁদের প্রাপ্য কল্যাণ সুবিধার টাকা দ্রুত প্রদান করা এবং চাকুরীকালীন কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীর মৃত্যু ঘটলে তাঁর পরিবারকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া। এছাড়া, কোনো শিক্ষক বা কর্মচারী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তাঁদের সুচিকিৎসার জন্য বিশেষ চিকিৎসা অনুদান প্রদান এবং সাধারণভাবে সকল বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করাই এই ট্রাস্টের মূল কর্মপরিধি।

পরিশিষ্ট ৬

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের ফলাফল মূল্যায়ন

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের অংশ হিসেবে পরামর্শক কমিটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১১টি বিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং ১০টি বিদ্যালয়ের ৮ম এবং ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে। পরিদর্শনকৃত উপজেলাগুলো শহর ও গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি চর, জলাবদ্ধ এলাকা, চা বাগান, হাওর, অতি দরিদ্র অঞ্চল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা, শরণার্থী ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকা, উপকূলীয় ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকা এবং শিল্পাঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত। এই পরিদর্শনের অংশ হিসেবে সরকারি, এমপিওভুক্ত এবং এমপিওভুক্ত নয় এমন বিভিন্ন ধরনের মোট ১০টি বিদ্যালয়ের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ৪৩৭ জন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে মোট ৫০ নম্বরের একটি অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অভীক্ষাটিতে বাংলা, ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে যথাক্রমে ১৫, ১৫ ও ২০ নম্বরের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত অভীক্ষার ফলাফলের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এই পরিশিষ্টে সংযোজন করা হলো। উল্লেখ্য, এই অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থী সারাদেশ থেকে দৈবচয়নের সাহায্যে বাছাই করা হয়নি এবং বাছাইকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও সীমিত। এছাড়া, বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নগুলো ৮ম ও ৯ম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের প্রশ্নগুলো পুরো পাঠ্যসূচি থেকে কিংবা আদর্শায়িত কৃতি অভীক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরি করা হয়নি। তাই এই ফলাফল সারাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ করা যাবে না এবং এটি এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্যও নয়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাস্তর বিবেচনা করে অভীক্ষার প্রশ্নপত্রটি সহজ ও মানানসই করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিক্ষাটির কাঠিন্য বিবেচনায় অন্তত ৮০% স্কোর অর্জনকে এই স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অভীক্ষাটির মাধ্যমে পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান এবং তাদের শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শিখন অর্জনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে ধারণা পাওয়া যায়।

অভীক্ষাটি বাংলা বিষয়ে ৩টি, ইংরেজি বিষয়ে ৩টি এবং গণিতে ৭টিসহ, মোট ১৩টি প্রশ্ন সম্বলিত ছিল। শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নগুলো সমাধানের প্রচেষ্টার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলা বিষয়ের ৩টি প্রশ্নের সবগুলোই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে ৯৬.৮% শিক্ষার্থী। অপরদিকে, ইংরেজি অংশের ক্ষেত্রে ৬৬.৪% শিক্ষার্থী সবগুলো প্রশ্নের উত্তর করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। গণিতের ক্ষেত্রে প্রায় ৮০% শিক্ষার্থী ৪ বা ৪ এর অধিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করলেও, মাত্র ২৭.২% শিক্ষার্থীর সবগুলো প্রশ্নের সমাধান করার প্রচেষ্টা তাদের গণিতভীতি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতার অভাবকে নির্দেশ করে।

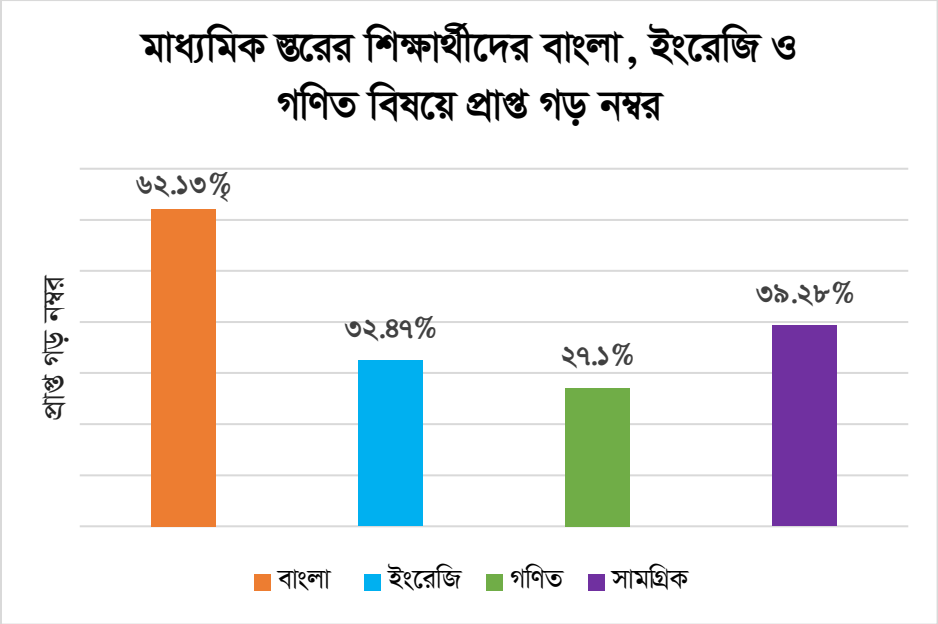

মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৪৩৭

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাস্তর বিবেচনা করে প্রণীত সহজ ও মানানসই অভীক্ষায় ৮০% অর্জনকে ফলাফলের সন্তোষজনক মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে কোনো বিষয়ের গড় অর্জনই এই লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করতে পারেনি। বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের গড় অর্জন সর্বোচ্চ (৬২.১৩%) হলেও তা বিবেচিত সন্তোষজনক মাত্রার চেয়ে প্রায় ১৮% কম, যা নির্দেশ করে যে তুলনামূলক সহজ প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রেও মাতৃভাষাভিত্তিক দক্ষতা ও পাঠ অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত মানের ঘাটতি রয়েছে। ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের চিত্রটি আরও উদ্বেগজনক; এখানে গড় অর্জন লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকেরও নিচে অবস্থান করছে। ইংরেজিতে গড় অর্জন ৩২.৪৭% এবং গণিতে মাত্র ২৭.১%, যা বিবেচিত সন্তোষজনক মাত্রার (৮০%) তুলনায় অনেক কম। সহজ প্রশ্নপত্রের পরেও গণিত ও ইংরেজিতে এমন নিম্নমুখী ফলাফল শিক্ষার্থীদের ভাষাগত এবং যৌক্তিক ও সমস্যা সমাধানমূলক দক্ষতার ক্ষেত্রে এক ধরনের তীব্র ঘাটতি নির্দেশ করে। সামগ্রিক গড় স্কোর ৩৯.২৮% হওয়ার প্রধান কারণ হলো বাংলা বিষয়ের তুলনামূলক ভালো অবস্থান, তবে ইংরেজি ও গণিতের শোচনীয় ফলাফল সামগ্রিক অর্জনের মানকে সন্তোষজনক মাত্রার অনেক নিচে নামিয়ে দিয়েছে। এই ফলাফল প্রমাণ করে যে, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা ন্যূনতম মানসম্মত শিখনফল অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না।

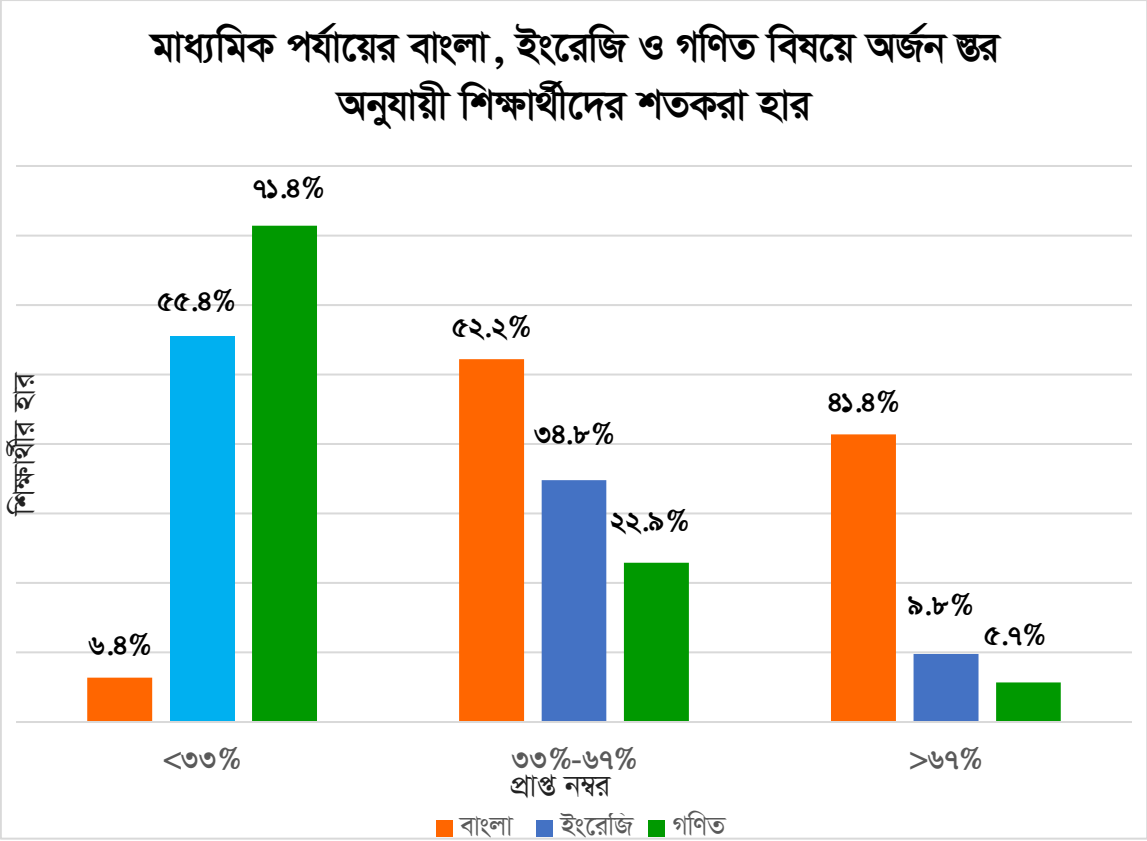

মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৪৩৭

উপরের লেখচিত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে অর্জনের স্তরভিত্তিক বণ্টন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ফলাফল তুলনামূলক সন্তোষজনক ও স্থিতিশীল; যেখানে অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী (৫২.২%) মধ্যম স্তরে এবং ৪১.৪% শিক্ষার্থী উচ্চ স্তরে অবস্থান করছে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, অর্ধেকেরও কম শিক্ষার্থীর বাংলায় ৬৭% এর উপরে অর্জন এ বিষয়ে আশানুরূপ ফলাফল নির্দেশ করে না। ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের চিত্রটি আরো বেশি উদ্বেগজনক। ইংরেজিতে অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী (৫৫.৪%) এবং গণিতে সিংহভাগ শিক্ষার্থী (৭১.৪%) ৩৩ শতাংশের নিচে স্কোর অর্জন করেছে, যা এই দুই বিষয়ে ব্যাপক শিখন ঘাটতির নির্দেশক। বিশেষ করে গণিতে উচ্চ স্তরের শিক্ষার্থীর হার মাত্র ৫.৭%, যা শিক্ষার্থীদের গাণিতিক ও যৌক্তিক দক্ষতা বিকাশে বড় ধরনের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সামগ্রিকভাবে এই উপাত্তগুলো প্রমাণ করে যে, বাংলা বিষয়ে শিখন ফলাফল অন্য দুই বিষয়ের তুলনায় ইতিবাচক হলেও, তা আশানুরূপ নয়। ইংরেজি ও গণিতের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপক দুর্বলতা রয়েছে।

বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের ফলাফলের ক্ষেত্রে জেন্ডার পার্থক্য

বর্তমান অভীক্ষায় মোট ৪৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ছেলে শিক্ষার্থী ১৮৮ জন এবং মেয়ে শিক্ষার্থী ২৪৯ জন। শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত- এই তিনটি মৌলিক বিষয়ে জেন্ডারভিত্তিক অর্জনের পার্থক্য এবং প্রতি বিষয়ে তাদের অর্জনন স্তর অনুযায়ী ফলাফলের তুলনা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

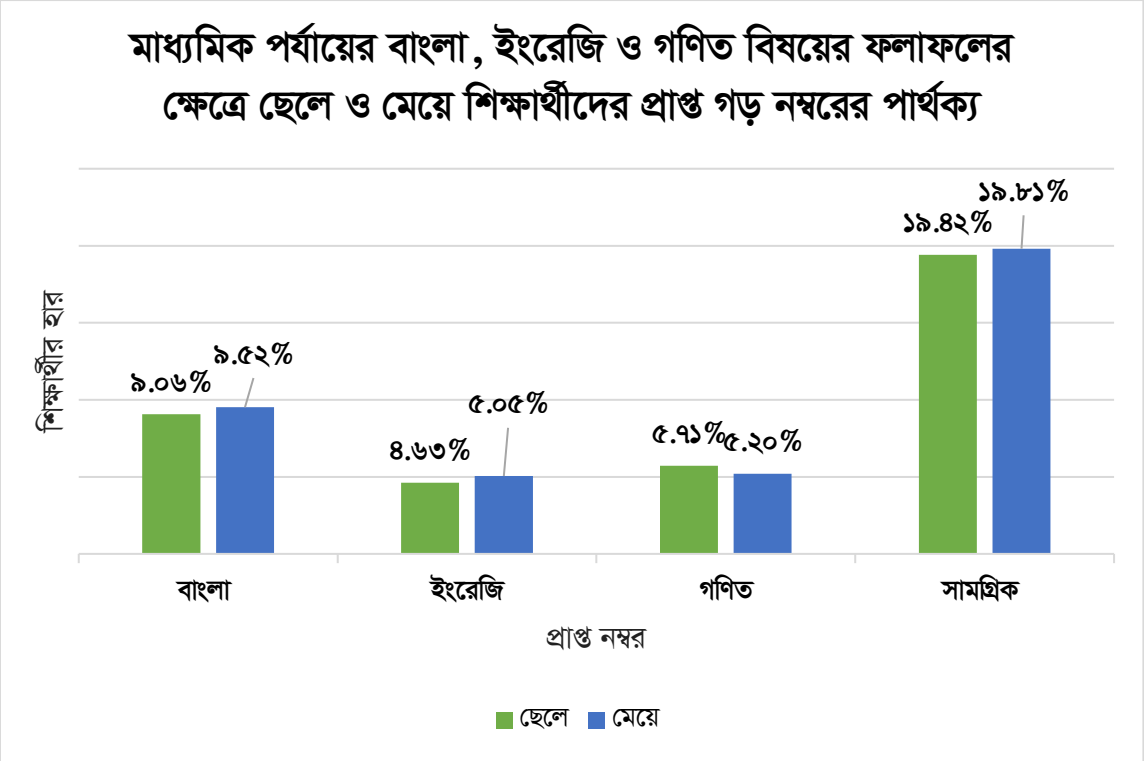

ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ১৮৮, মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ২৪৯

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ফলাফল বিশ্লেষণে ছেলে ও মেয়েদের অর্জনের মধ্যে অত্যন্ত সামান্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। গ্রাফের তথ্য অনুযায়ী, ভাষাভিত্তিক দক্ষতা তথা বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয়েই মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় সামান্য এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, গণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে ছেলেদের পারদর্শিতা মেয়েদের তুলনায় কিছুটা ভালো। সামগ্রিক ফলাফলের বিচারে মেয়ে শিক্ষার্থীরা (১৯.৮১%) ছেলেদের (১৯.৪২%) তুলনায় সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও উভয় দলের মধ্যে পারদর্শিতার এই পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে অত্যন্ত ক্ষীণ। এই উপাত্ত নির্দেশ করে যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে জেন্ডারভিত্তিক কোনো বড় ধরনের বৈষম্য নেই, বরং উভয় পক্ষই প্রায় সমান্তরালভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

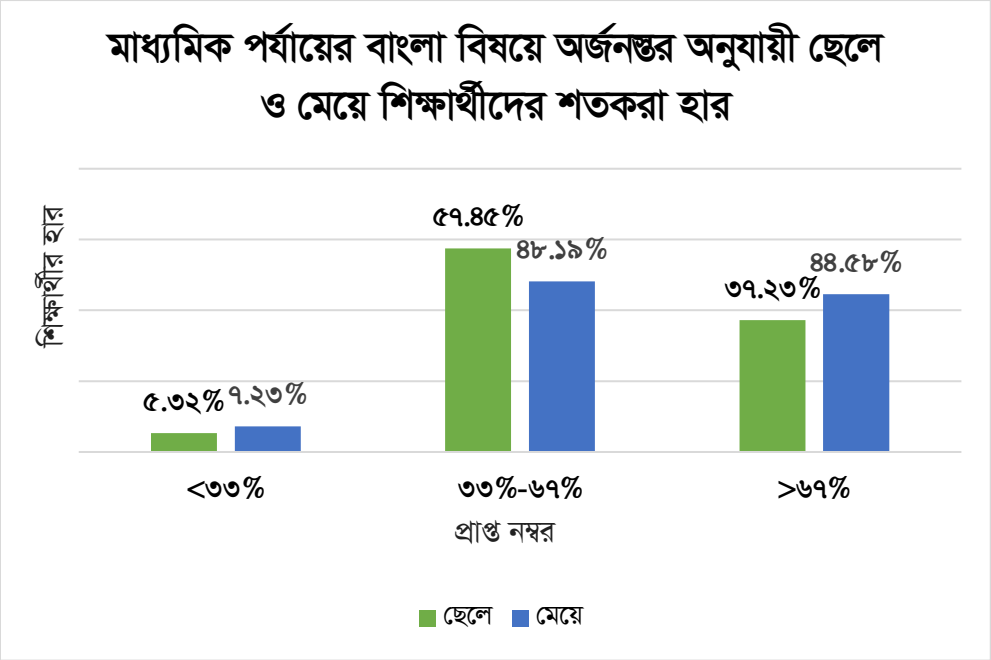

ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ১৮৮, মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ২৪৯

বাংলা বিষয়ে অর্জন স্তরের ভিত্তিতে বিশ্লেষণে দেখা যায়, ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ, যথাক্রমে ৫৭.৪৫% এবং ৪৮.১৯% একটি মধ্যম স্কোর রেঞ্জ অর্থাৎ ৩৩%-৬৭% এর মধ্যে অবস্থান করছে। তবে উচ্চ স্কোর রেঞ্জে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে আছে। বাংলা বিষয়ে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ নূন্যতম এক-তৃতীয়াংশ নম্বর অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

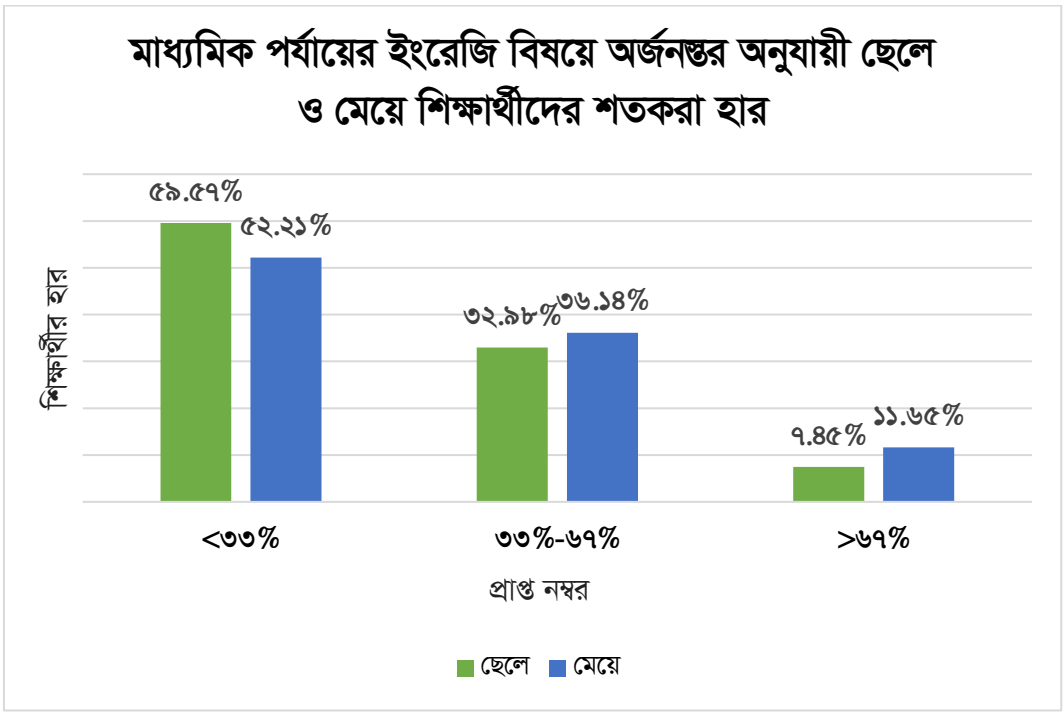

ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ১৮৮, মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ২৪৯

ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে গ্রাফ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীর অর্জন প্রধানত নিম্ন স্কোর রেঞ্জে (<৩৩%) কেন্দ্রীভূত, যা ইংরেজি বিষয়ে সার্বিক দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন করে। তবে মধ্যম ও উচ্চ স্কোর রেঞ্জে মেয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছেলেদের তুলনায় কিছুটা বেশি। ফলে, যদিও ইংরেজি বিষয়ে সামগ্রিক অর্জন তুলনামূলকভাবে কম, মেয়েদের অর্জন হার ছেলেদের তুলনায় ভালো।

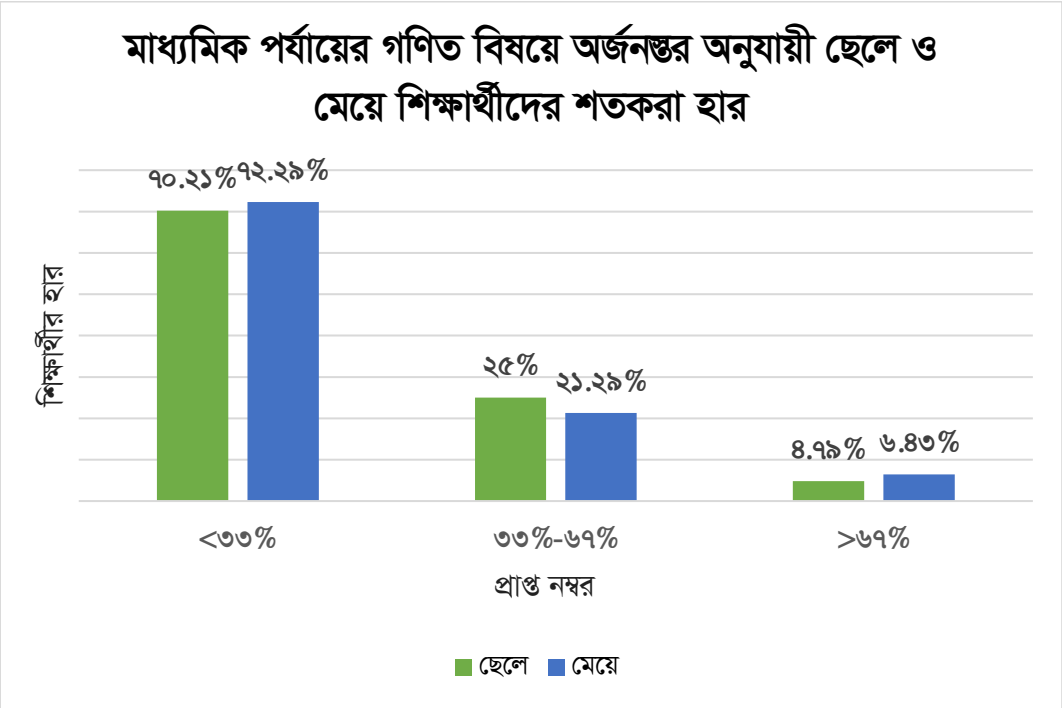

ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ১৮৮, মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ২৪৯

গণিত বিষয়ে অর্জন স্তর ভিত্তিক ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রেই ৩৩% এর চেয়েও কম স্কোর অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের আধিক্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ছেলে শিক্ষার্থীদের ৭০.২১% এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের ৭২.২৯% শিক্ষার্থী এই নিম্ন স্তরে অবস্থান করছে, যা গণিত বিষয়ে গুরুতর শিখন ঘাটতির প্রতিফলন। মধ্যম স্কোর রেঞ্জে ছেলে শিক্ষার্থীদের অংশ মেয়েদের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও উভয় ক্ষেত্রেই এই হার সীমিত এবং উচ্চ স্কোর অর্জনকারী শিক্ষার্থী প্রায় নাই বললেই চলে। সার্বিকভাবে, গ্রাফটি নির্দেশ করে যে গণিত বিষয়ে উভয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের তীব্র অর্জন ঘাটতি রয়েছে।

বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের ফলাফলের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের তুলনা

বর্তমান অভীক্ষায় মোট ৪৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে শহর এলাকার শিক্ষার্থী ১০৫ জন এবং গ্রাম এলাকার শিক্ষার্থী ৩৩২ জন। শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত- এই তিনটি মৌলিক বিষয়ে এলাকাভিত্তিক অর্জনের পার্থক্য এবং প্রতি বিষয়ে তাদের অর্জন স্তর অনুযায়ী ফলাফলের তুলনা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

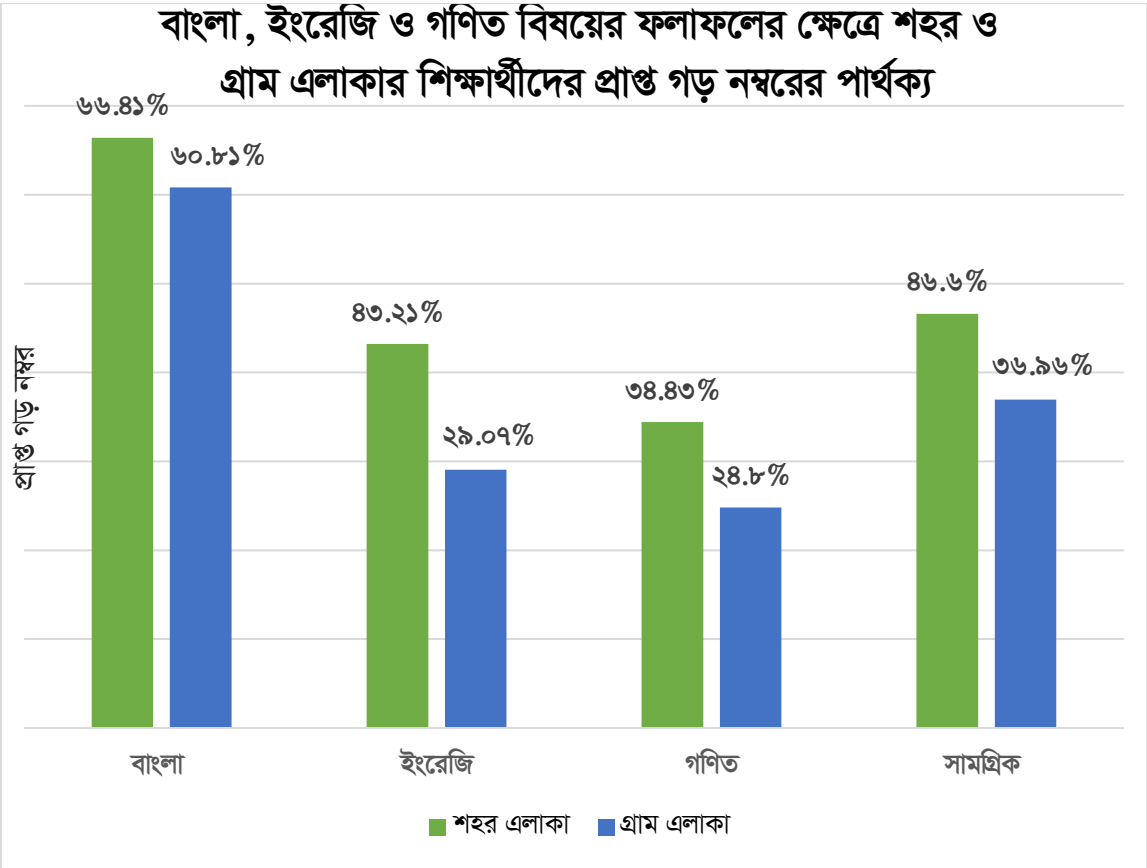

শহর এলাকার শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১০৫ , গ্রাম এলাকার শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৩২

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ফলাফল বিশ্লেষণে শহর ও গ্রাম এলাকার মধ্যে একটি স্পষ্ট ও উদ্বেগজনক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। গ্রাফের তথ্য অনুযায়ী, বাংলা, ইংরেজি ও গণিত- এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতিটিতেই শহর এলাকার শিক্ষার্থীরা গ্রাম এলাকার তুলনায় উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে ইংরেজি ও গণিতের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশি প্রকট, যেখানে শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীর অর্জনের ব্যবধান যথাক্রমে প্রায় ১৪% ও ১০%। সামগ্রিক অর্জনের ক্ষেত্রেও শহর এলাকার শিক্ষার্থীদের গড় হার (৪৬.৬%) গ্রাম এলাকার (৩৬.৯৬%) তুলনায় অনেক বেশি। এই পরিসংখ্যান নির্দেশ করে যে, গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় শহরের শিক্ষার্থীরা উন্নততর পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা লাভের মাধ্যমে ভাষাগত ও যৌক্তিক দক্ষতা অর্জনে অধিকতর সক্ষম হচ্ছে। তবে উভয় অঞ্চলেই প্রত্যাশিত ফলাফলের তুলনায় এই অর্জন অনেক কম, যা ইঙ্গিত করে যে অঞ্চল নির্বিশেষে শিক্ষার সামগ্রিক গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

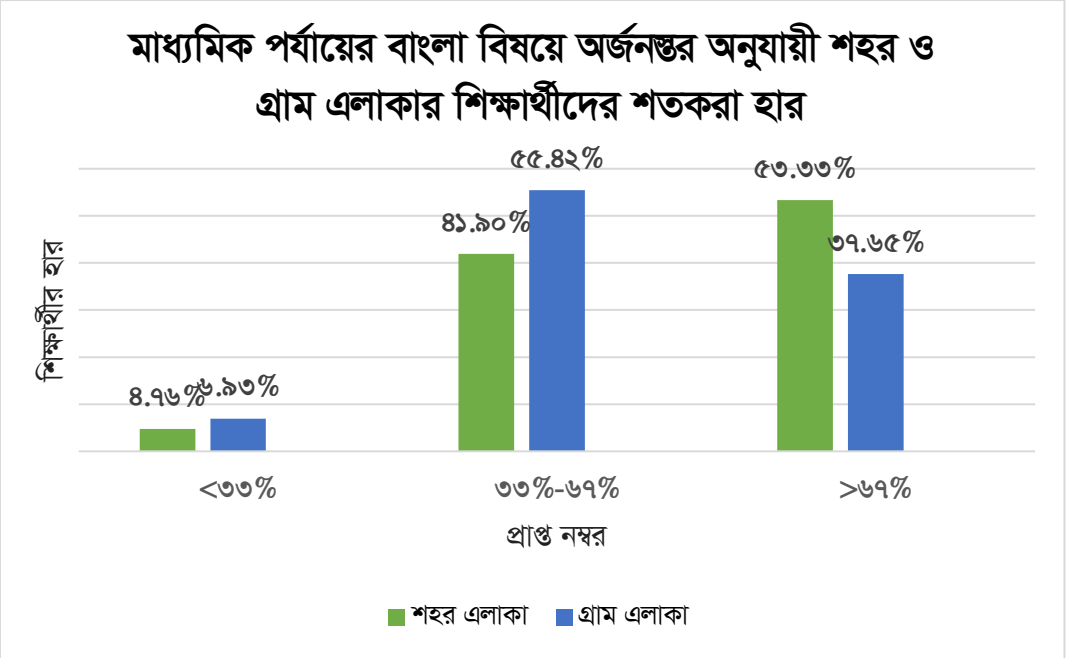

শহর এলাকার শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১০৫ , গ্রাম এলাকার শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৩২

বাংলা বিষয়ে শহরাঞ্চলের অর্ধেকের বেশি (৫৩.৩৩%) শিক্ষার্থীর অর্জন উচ্চতর স্তরে (>৬৭%) কেন্দ্রীভূত হলেও অভীক্ষার কাঠিন্য ও প্রত্যাশিত মানদণ্ড অনুযায়ী এই ফলাফল পুরোপুরি আশানুরূপ নয়; যেহেতু শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ এখনও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে অবস্থান করছে। বিপরীতে, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মধ্যম স্কোর রেঞ্জে অর্জনের হার সর্বাধিক এবং এখানে নিম্ন স্কোর রেঞ্জে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, বাংলা বিষয়ে শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় উচ্চ স্কোর অর্জনে এগিয়ে থাকলেও, উভয় অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যেই ভাষাগত দক্ষতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশে আরও উন্নতির অবকাশ রয়েছে।

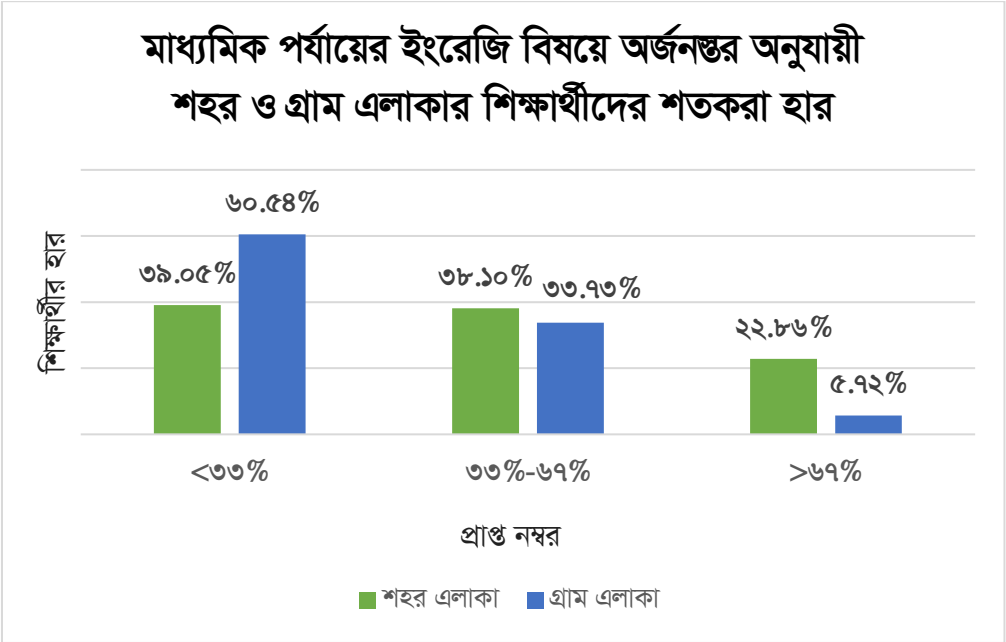

শহর এলাকার শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১০৫ , গ্রাম এলাকার শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৩২

ইংরেজি বিষয়ে শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অর্জনের মধ্যে স্পষ্ট বৈষম্য প্রতিফলিত হয়। শহরাঞ্চলের ৩৯.০৫% শিক্ষার্থী নিম্ন স্কোর রেঞ্জে (<৩৩%), ৩৮.১০% মধ্যম স্কোর রেঞ্জে এবং ২২.৮৬% উচ্চ স্কোর রেঞ্জে (>৬৭%) অবস্থান করছে। অপরদিকে, গ্রামাঞ্চলের অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী ন্যূনতম ৩৩% স্কোর করতে অসামর্থ্য হয়েছে, যা ইংরেজি বিষয়ে চরম দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়। মধ্যম স্কোর রেঞ্জে গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের হার ৩৩.৭৩% হলেও উচ্চ স্কোর রেঞ্জে তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত সীমিত (৫.৭২%)। সামগ্রিকভাবে, ইংরেজি বিষয়ে শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অর্জন গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় বেশি হলেও উভয় অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশের ইংরেজি দক্ষতা অত্যন্ত অসন্তোষজনক।

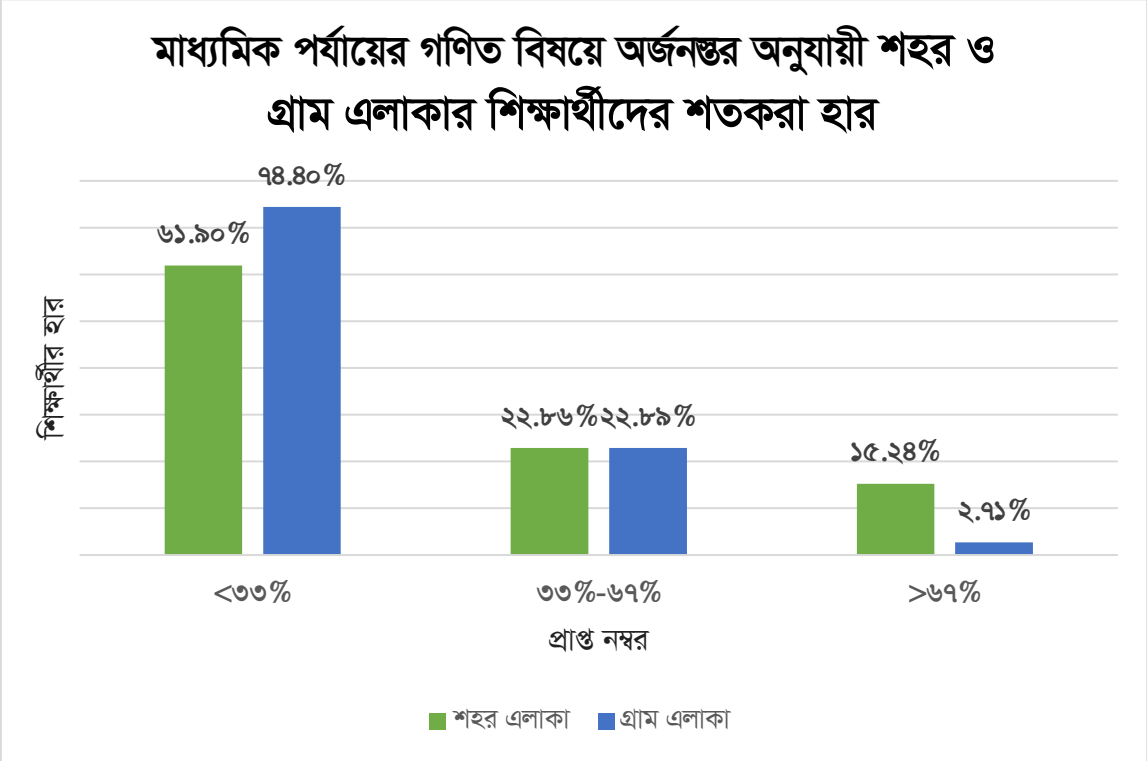

শহর এলাকার শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১০৫ , গ্রাম এলাকার শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৩২

গণিত বিষয়ে উভয় অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন মানের অর্জনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। শহরাঞ্চলের ৬১.৯০% শিক্ষার্থী এবং গ্রামাঞ্চলের ৭৪.৪০% শিক্ষার্থী ৩৩% এর নিচে স্কোর করছে। মধ্যম স্কোর রেঞ্জে উভয় অঞ্চলের শিক্ষার্থীর অংশ প্রায় সমান হলেও উচ্চ স্কোর রেঞ্জে (>৬৭%) শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই থেকে প্রতীয়মান হয় যে গণিত বিষয়ে সামগ্রিক অর্জন দুর্বল হলেও শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য স্পষ্ট এবং গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশি উদ্বেগজনক।

৮ম এবং ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের ফলাফলের তুলনা

বর্তমান অভীক্ষায় মোট ৪৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ২২৩ জন এবং নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ২১৪ জন। শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত- এই তিনটি মৌলিক বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জনের পার্থক্য এবং প্রতি বিষয়ে তাদের অর্জন স্তর অনুযায়ী ফলাফলের তুলনা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

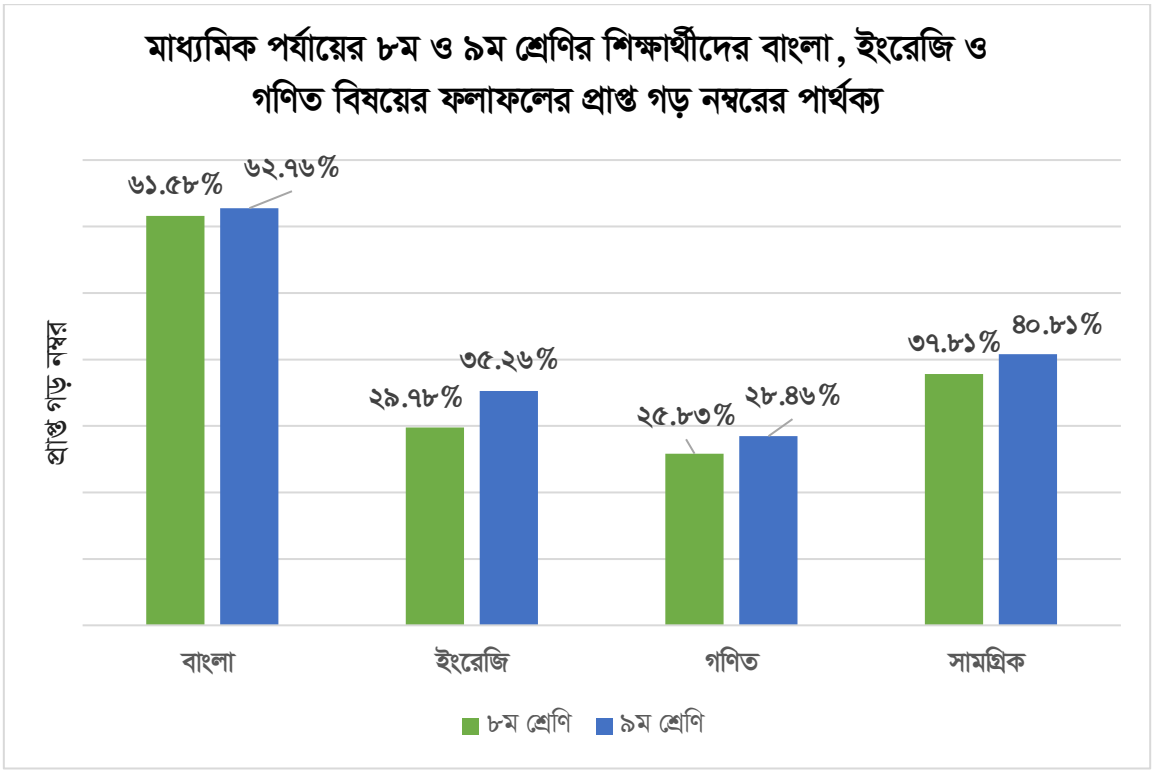

৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২২৩, ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২১৪

অষ্টম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক অর্জনের চিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি বিষয়েই অষ্টম শ্রেণির তুলনায় নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা কিছুটা বেশি। গ্রাফের তথ্য অনুযায়ী, বাংলায় উভয় শ্রেণির অর্জন ৬০ শতাংশের উপরে থাকলেও ইংরেজি ও গণিত উভয় ক্ষেত্রেই নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণির তুলনায় প্রায় ৩ থেকে ৫ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। সামগ্রিক অর্জনের ক্ষেত্রেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে, যেখানে নবম শ্রেণির গড় অর্জন (৪০.৮১%) অষ্টম শ্রেণির (৩৭.৮১%) তুলনায় প্রায় ৩ শতাংশ বেশি। এই পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চতর শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও সকল বিষয়েই ফলাফল কাঙ্ক্ষিত মাত্রার তুলনায় বেশ নিচে অবস্থান করছে। বিশেষ করে ইংরেজি ও গণিতে শিক্ষার্থীদের অর্জন খুবই হতাশাজনক।

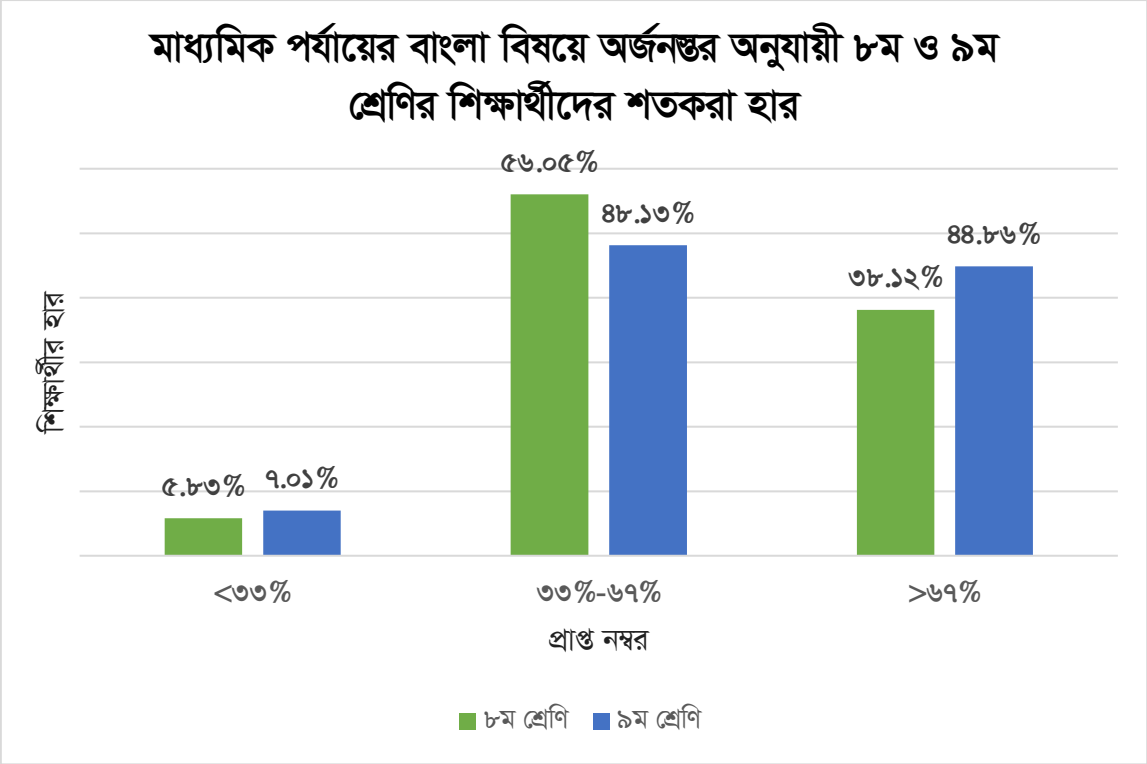

৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২২৩, ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২১৪

লেখচিত্রে প্রদর্শিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলা বিষয়ে উভয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অর্জন প্রধানত মধ্যম ও উচ্চ স্কোর রেঞ্জে কেন্দ্রীভূত। ৮ম শ্রেণির ক্ষেত্রে অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী মধ্যম স্কোর রেঞ্জে (৩৩%৬৭%) অবস্থান করছে এবং ৩৮.১২% শিক্ষার্থী উচ্চ স্কোর রেঞ্জে (>৬৭%) অর্জন করেছে, যেখানে নিম্ন স্কোর রেঞ্জে (<৩৩%) শিক্ষার্থীর হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম (৫.৮৩%)। অপরদিকে, ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ স্কোর রেঞ্জে অর্জনের হার আরও বেশি, যদিও মধ্যম স্কোর রেঞ্জে শিক্ষার্থীর হার কিছুটা কম। তবে ৯ম শ্রেণিতে নিম্ন স্কোর রেঞ্জে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ৮ম শ্রেণির তুলনায় সামান্য বেশি। লেখচিত্র পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, শ্রেণি অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বিষয়ে উচ্চ অর্জনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

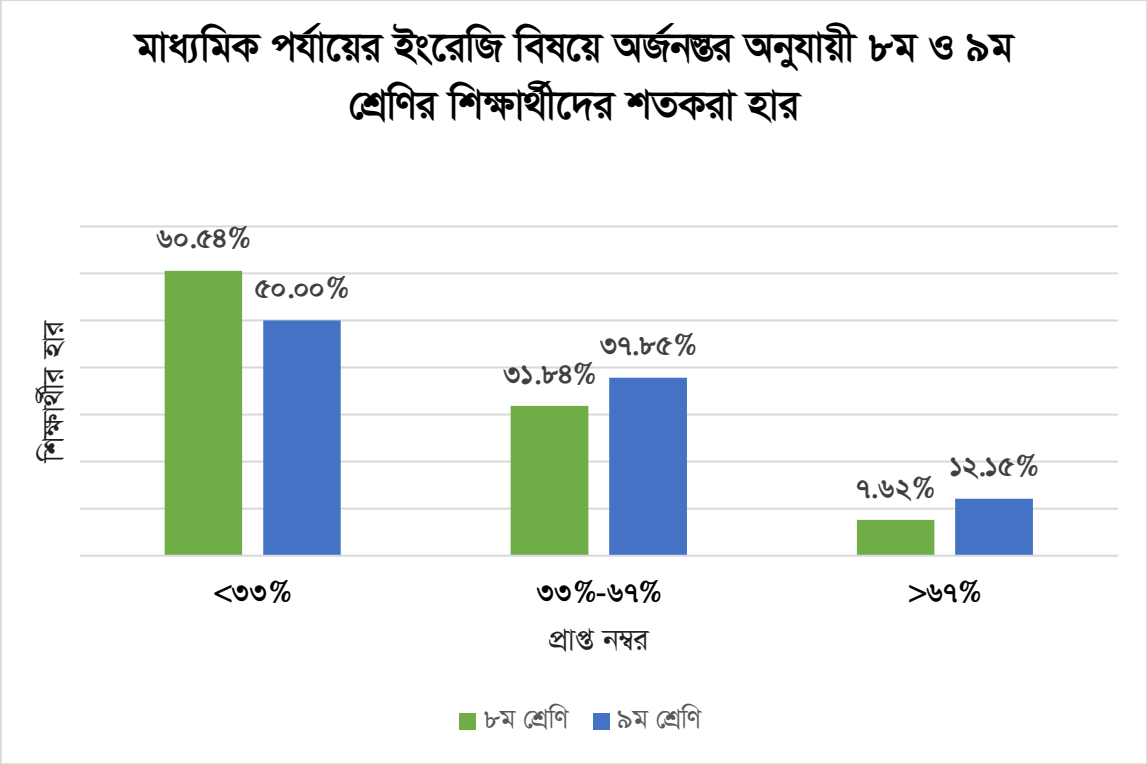

৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২২৩, ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২১৪

ইংরেজি বিষয়ের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৮ম এবং ৯ম, উভয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অর্জন অত্যন্ত হতাশাজনক। ৮ম শ্রেণির ৬০.৫৪% শিক্ষার্থী এবং ৯ম শ্রেণির ৫০% শিক্ষার্থী ন্যূনতম ৩৩% স্কোর অর্জন করতে অপারগ। মধ্যম স্কোর রেঞ্জে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশ ৮ম শ্রেণির তুলনায় বেশি, যা শ্রেণি অগ্রগতির সঙ্গে কিছুটা উন্নতির ইঙ্গিত দেয়। একইভাবে, উচ্চ স্কোর রেঞ্জে অর্জনকারী শিক্ষার্থীর হার ৯ম শ্রেণিতে, ৮ম শ্রেণির তুলনায় বেশি। তবে লেখচিত্র থেকে এটি স্পষ্ট যে ইংরেজি বিষয়ে উভয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরই যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে।

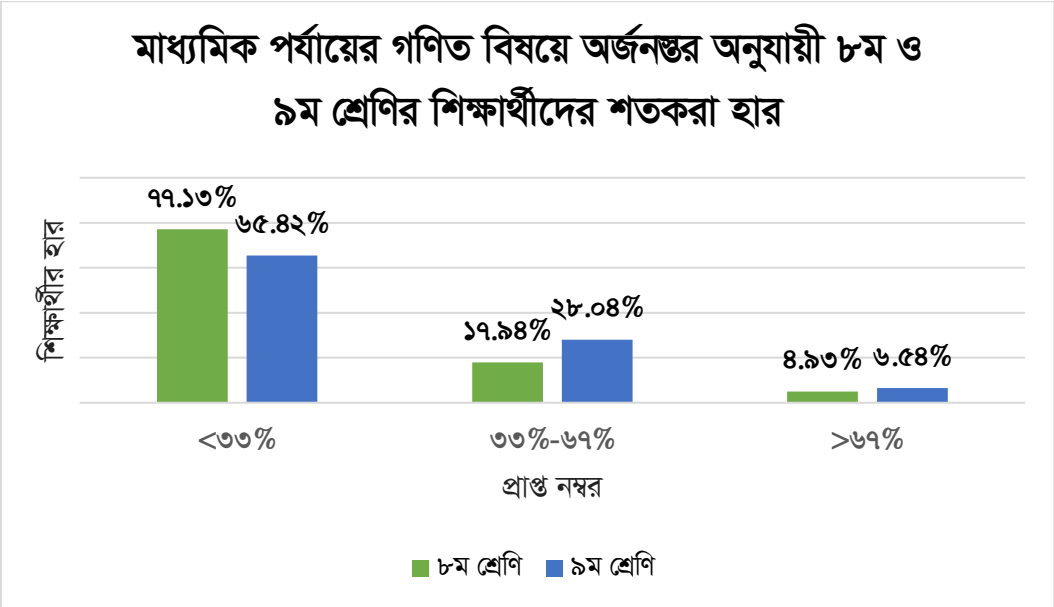

৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২২৩, ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২১৪

লেখচিত্র থেকে দেখা যায়, গণিত বিষয়ে ৮ম শ্রেণির ৭৭.১৩% শিক্ষার্থী এবং ৯ম শ্রেণির ৬৫.৪২% শিক্ষার্থী ৩৩% এরচেয়েও কম স্কোর করেছে, যা গণিত বিষয়ে চূড়ান্ত শিখন ঘাটতির প্রতিফলন। যদিও ৯ম শ্রেণিতে মধ্যম স্কোর ও উচ্চ স্কোর রেঞ্জে শিক্ষার্থী ৮ম শ্রেণির তুলনায় কিছুটা বেশি, তবুও ৯ম শ্রেণিতে মাত্র ৬.৫৪% এবং ৮ম শ্রেণিতে মাত্র ৪.৯৩% শিক্ষার্থীর ৬৭% এর বেশি স্কোর করা নিশ্চিত করে মাধ্যমিক পর্যায়ে গণিত বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জনের কিয়দংশও এখন পর্যন্ত অর্জিত হয়নি।

বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি, এমপিও এবং নন-এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের তুলনা

বর্তমান অভীক্ষায় মোট ৪৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ৫৭ জন, এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ৩৪৫ জন এবং নন-এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ৩৫ জন । শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত- এই তিনটি মৌলিক বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জনের পার্থক্য এবং প্রতি বিষয়ে তাদের অর্জনস্তর অনুযায়ী ফলাফলের তুলনা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

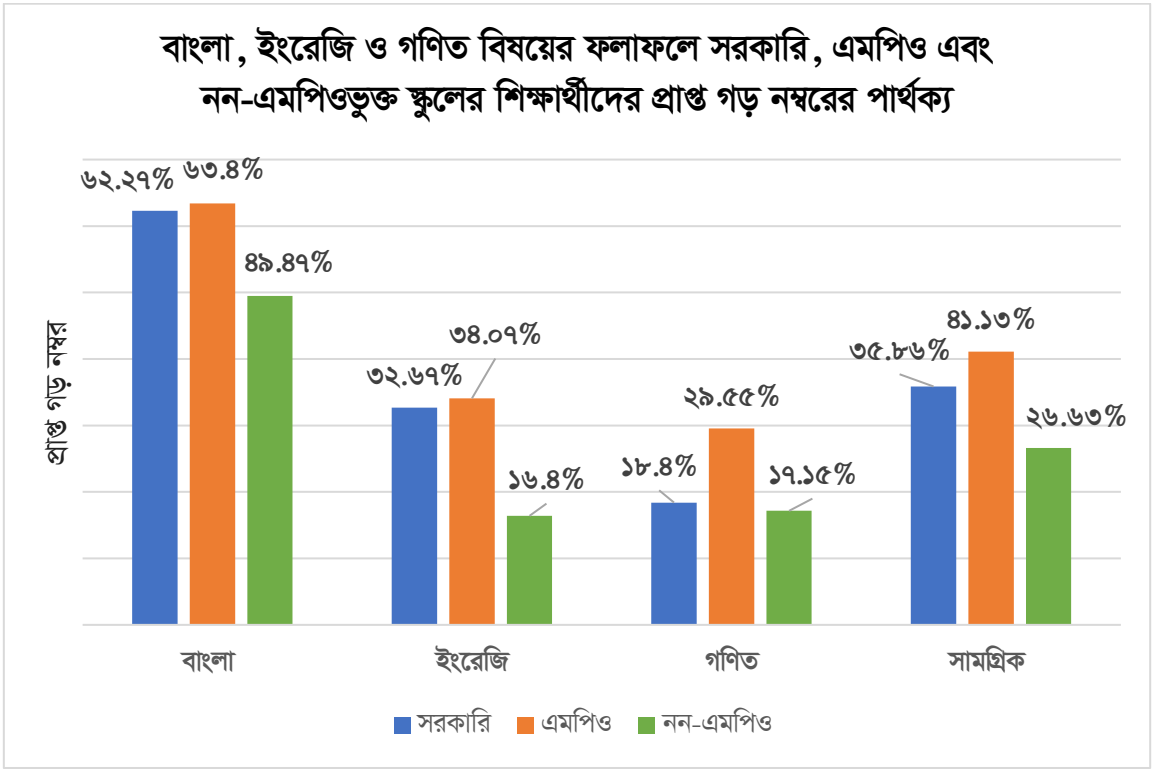

সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৫৭, এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৪৫, নন-এমপিও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৫

মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক অর্জনের চিত্রটি বিশ্লেষণ করলে শিক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ একটি বড় বৈষম্য ফুটে ওঠে। গ্রাফে প্রদর্শিত তথ্য অনুযায়ী, প্রায় প্রতিটি সূচকেই নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অন্য দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে, যার মধ্যে ইংরেজিতে তাদের দুর্বলতা সবচেয়ে প্রকট (মাত্র ১৬.৪%)। তবে গণিত বিষয়ের ফলাফল অত্যন্ত উদ্বেগজনক; এখানে এমপিওভুক্ত স্কুলগুলো (২৯.৫৫%) অন্য দুই প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কিছুটা ভালো অবস্থানে থাকলেও তাদের গড় অর্জনের হার এক-তৃতীয়াংশের (৩৩.৩৩%) চেয়েও কম। অন্যদিকে, সরকারি স্কুল (১৮.৪%) এবং নন-এমপিও স্কুল (১৭.১৫%)

গণিতে প্রায় একইভাবে নিম্নমুখী পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে। সামগ্রিক অর্জনে এমপিওভুক্ত স্কুল (৪১.১৩%) শীর্ষে থাকলেও তা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত বা সন্তোষজনক নয়। এছাড়া, নন-এমপিও স্কুলের শিক্ষার্থীদের (২৬.৬৩%) সামগ্রিক অর্জন অত্যন্ত হতাশাজনক। এই পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই গুণগত ও কার্যকর শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে।

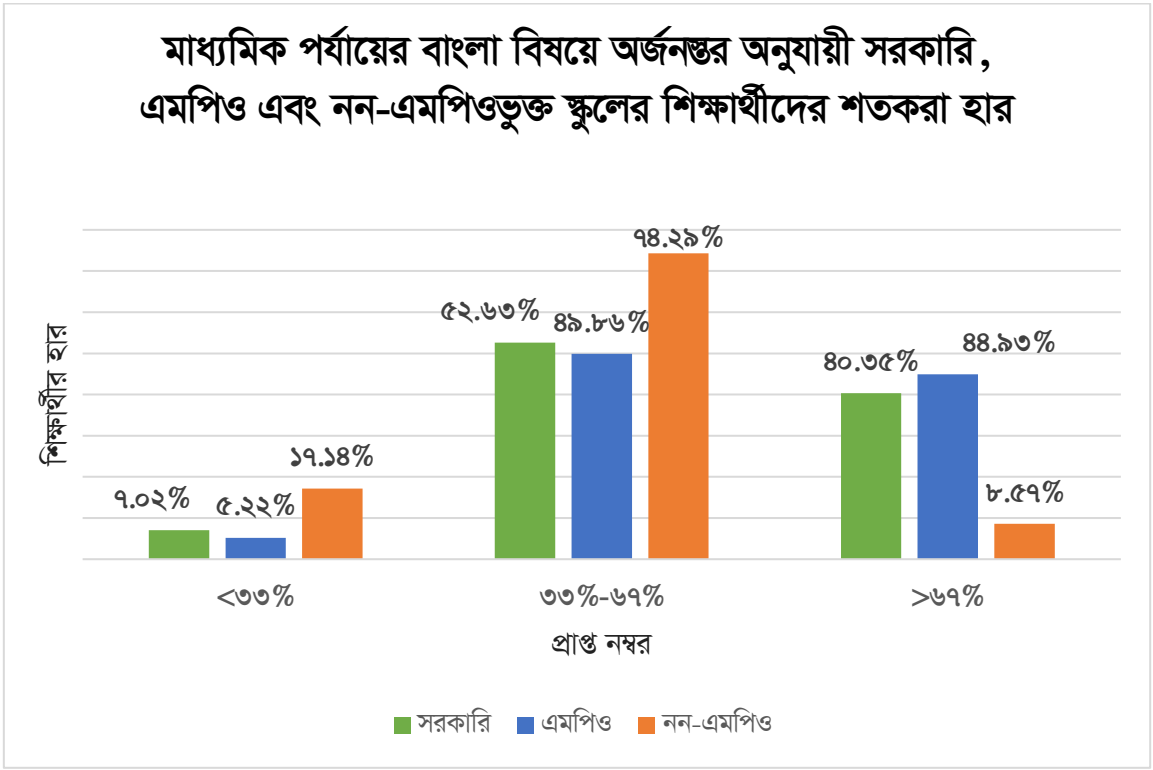

সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৫৭, এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৪৫, নন-এমপিও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৫

লেখচিত্রে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলা বিষয়ে সরকারি ও এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অর্জন মূলত মধ্যম ও উচ্চ স্কোর রেঞ্জে কেন্দ্রীভূত। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, সহজ ও মানানসই প্রশ্নপত্র হওয়া সত্ত্বেও সরকারি ও এমপিওভুক্ত উভয় প্রতিষ্ঠানেরই একটি বড় অংশ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি। বিপরীতে, নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষার্থী মধ্যম স্কোর রেঞ্জে অবস্থান করলেও উচ্চ স্কোর রেঞ্জে (>৬৭%) তাদের হার অত্যন্ত সীমিত। এছাড়া, নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানে নিম্ন স্কোর রেঞ্জে শিক্ষার্থীর হার অন্য দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেকটাই বেশি। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলা বিষয়ে সরকারি ও এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের তুলনায় এগিয়ে থাকলেও, সার্বিকভাবে কোনো স্তরের প্রতিষ্ঠানের অর্জনই সম্পূর্ণ আশানুরূপ নয়।

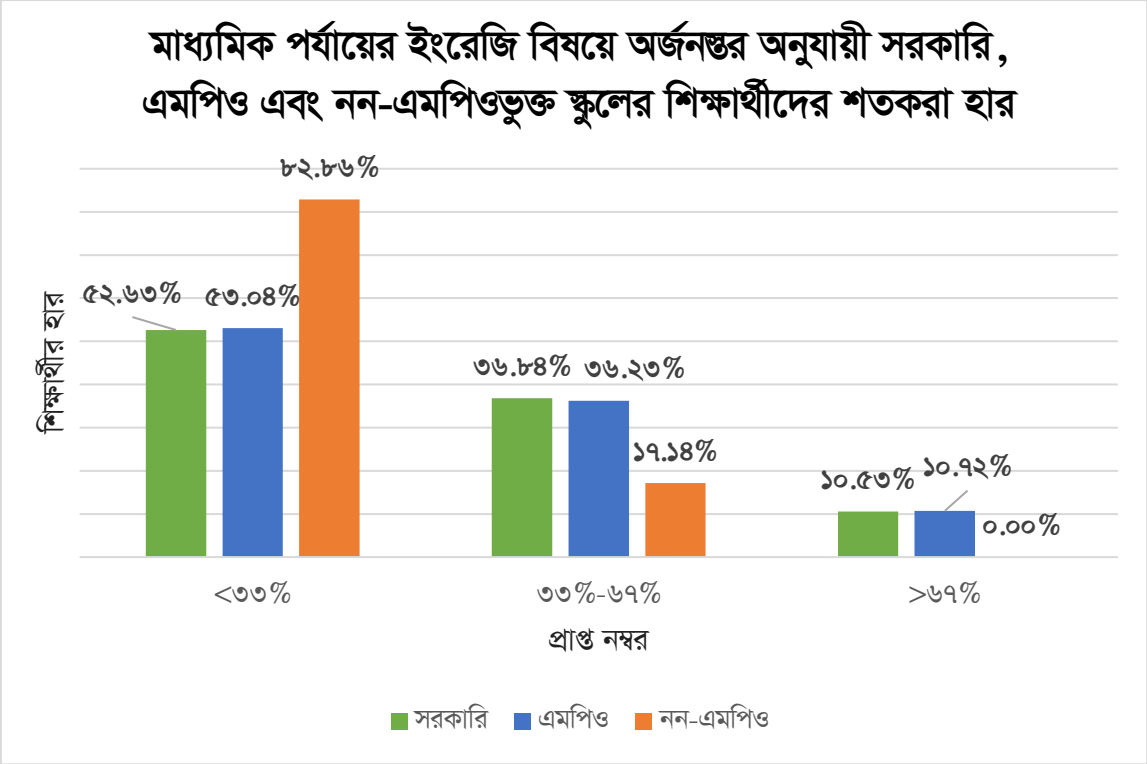

সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৫৭, এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৪৫, নন-এমপিও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৫

ইংরেজি বিষয়ের লেখচিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অর্জন প্রধানত নিম্ন স্কোর রেঞ্জে কেন্দ্রীভূত। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৫২.৬৩%, এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ৫৩.০৪% এবং নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানের ৮২.৮৬% শিক্ষার্থী ইংরেজি বিষয়ে ন্যূনতম ৩৩% নম্বর অর্জনে অপারগ। মধ্যম স্কোর রেঞ্জে সরকারি ও এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশ প্রায় সমান হলেও নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানে এই হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম। ৬৭% এর বেশি নম্বর অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর হার সরকারি (১০.৫৩%) ও এমপিওভুক্ত (১০.৭২%) প্রতিষ্ঠানে সীমিত এবং নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ থেকে ইংরেজি বিষয়ে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বৈষম্য এবং দেশব্যাপী সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক দুর্বলতা ফুটে ওঠে।

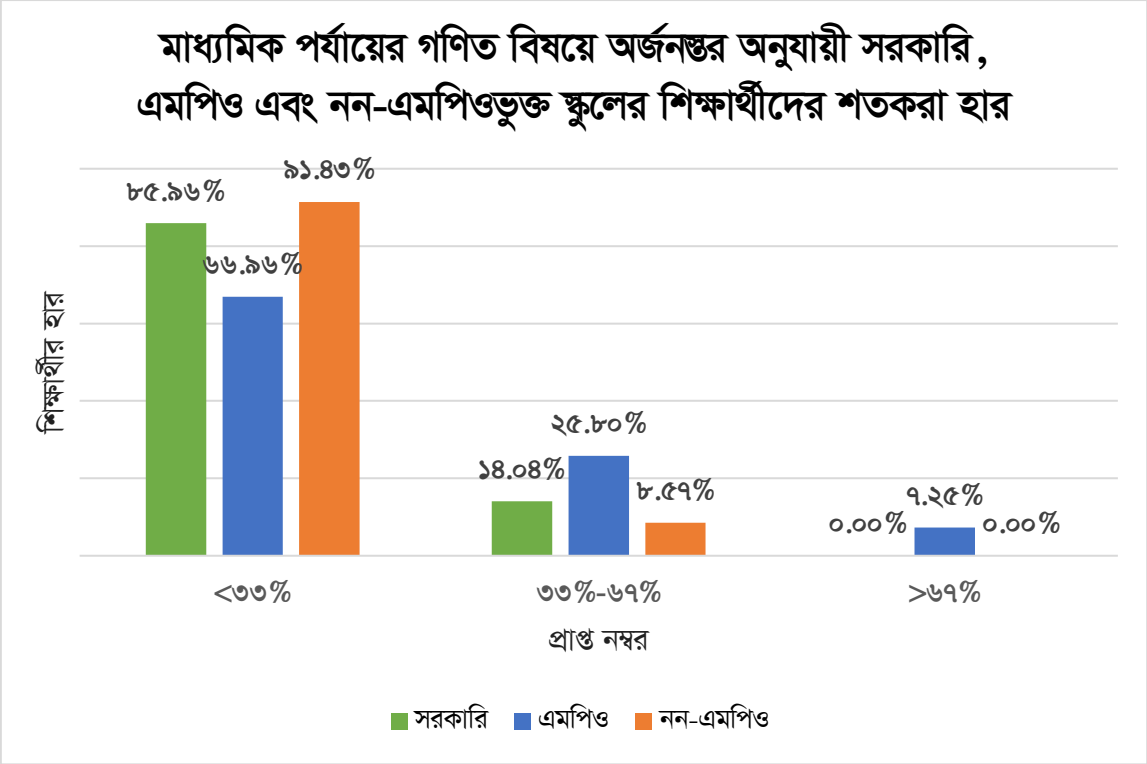

সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৫৭, এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৪৫, নন-এমপিও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩৫

লেখচিত্র থেকে, অত্যন্ত উদ্বেগজনকভাবে গণিত বিষয়ে তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্ন স্কোর রেঞ্জে অত্যন্ত উচ্চ কেন্দ্রীকরণ লক্ষ করা যায়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৮৫.৯৬%, এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ৬৬.৯৬% এবং নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানের ৯১.৪৩% শিক্ষার্থী গণিতে ন্যূনতম পাশ নম্বর অর্থাৎ ৩৩% নম্বর তুলতে অপারগ, যা গণিত বিষয়ে গুরুতর শিখন ঘাটতির প্রতিফলন। মধ্যম স্কোর রেঞ্জে সরকারি, এমপিওভুক্ত এবং নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশ সীমিত। পাশাপাশি, উচ্চ স্কোর রেঞ্জ অর্থাৎ ৬৭% নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থীর হার কেবল এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সামান্য উপস্থিত থাকলেও সরকারি ও নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানে এটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সামগ্রিকভাবে লেখচিত্রটি নির্দেশ করে যে গণিত বিষয়ে সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষ করে, নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানে সমস্যার তীব্রতা অনেক বেশি।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের ফলাফল বিশ্লেষণে আরও কিছু বিষয় লক্ষ করা যায়। যেমন:

- **শিক্ষার্থীদের অর্জনের উপর মায়ের শিক্ষাগত স্তরের প্রভাব:** মায়ের শিক্ষাগত স্তর শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক ও সামগ্রিক ফলাফল অর্জনের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষাসম্পন্ন মায়েদের সন্তানেরা বাংলা বিষয়ে গড়ে ৬৯.২৯%, ইংরেজিতে ৪৩.২৮% এবং গণিতে ৩৩.৪১% অর্জন করে ফলাফলের দিক থেকে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, উচ্চশিক্ষিত মায়েদের সন্তানদের ক্ষেত্রেও সকল বিষয়ের ফলাফলই সন্তোষজনক লক্ষ্যমাত্রার নিচে অবস্থান করছে। বিশেষ করে ইংরেজি ও গণিতের ক্ষেত্রে এই ফলাফল খুবই হতাশাজনক। বিপরীতে, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন মায়েদের সন্তানেরা ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে। অন্যদিকে, যেসব শিক্ষার্থীর মায়ের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, তাদের

সামগ্রিক গড় অর্জন মাত্র ৩২.৮৬% এবং গণিতে অর্জন সর্বনিম্ন। অভীক্ষাটির প্রশ্নপত্র সহজ হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজি ও গণিতে সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের এই করুণ ফলাফল এবং মায়ের শিক্ষাগত স্তর ভেদে অর্জনের ব্যাপক পার্থক্য শিক্ষার গুণগত মানের এক গভীর সংকটকে নির্দেশ করে। পরিশেষে বলা যায়, মায়ের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের এগিয়ে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তা পর্যাপ্ত প্রভাব ফেলতে পারছে না।

- **আঞ্চলিক বৈচিত্র্যভেদে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনের তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ** দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার্থীদের ফলাফলে বড় ধরনের বৈচিত্র্য ও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি অঞ্চলে বাংলা বিষয়ে অর্জনের হার ৬০ শতাংশের আশেপাশে থাকলেও ইংরেজি এবং বিশেষ করে গণিতে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা খুবই দুর্বল। সব প্রতিকূলতা ছাপিয়ে একটি ইতিবাচক তথ্য হলো, অতি দরিদ্র অঞ্চল (৫৯.৩৫%) এবং হাওর অঞ্চলের (৫০.৩৩%) শিক্ষার্থীরা সামগ্রিক ফলাফলে অন্য সব এলাকার চেয়ে এগিয়ে আছে। তবে উল্লেখ্য যে, শীর্ষস্থানে থাকা এই অঞ্চলগুলোর অর্জনও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক নিচে।

  এর বিপরীতে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা (২৬.৬৩%), চা বাগান (৩১.৪৪%) এবং উপকূলীয় ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার (৩২.৫০%) শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ফলাফল অত্যন্ত হতাশাজনক। এসব অঞ্চলে ইংরেজি ও গণিতের অর্জন মাত্র ১৬ থেকে ১৯ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা নির্দেশ করে যে প্রান্তিক অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা সাধারণ পাঠ্যক্রমের সাথে মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে। কাঠিন্যের দিক দিয়ে অভীক্ষাটি সহজ হওয়া সত্ত্বেও শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের ফলাফলও সন্তোষজনক নয়; যেখানে শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা গণিতে এক-তৃতীয়াংশের কম (২৮%) অর্জন করেছে। শিল্পাঞ্চলের চিত্র অত্যন্ত উদ্বেগজনক, যেখানে গণিতের অর্জন সর্বনিম্ন (১৫%)। সামগ্রিকভাবে এই চিত্রটি প্রমাণ করে যে, অঞ্চলভেদে শিক্ষার্থীদের এই নিম্নমুখী অর্জন এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

- ৯ম শ্রেণির বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শাখায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি ও গণিতের ফলাফলে স্পষ্ট বৈষম্য দেখা যায়। বাংলা বিষয়ে সব শাখার শিক্ষার্থীরাই গড়ে ৫০% এর উপরে নম্বর পেলেও, ইংরেজি ও গণিতে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরাই কেবল গড়ে ৩৩% এর বেশি নম্বর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, কাঠিন্যের দিক দিয়ে প্রশ্নপত্র সহজ হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিভাগের এই সর্বোচ্চ অর্জনও সন্তোষজনক মাত্রার অর্ধেকেরও নিচে। অন্যদিকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শাখার শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ও গণিতে গড়ে ন্যূনতম ১২% নম্বরও অর্জন করতে পারেনি, যা এক ভয়াবহ শিখন সংকটকে নির্দেশ করে। শাখাভেদে ইংরেজি ও গণিতে শিক্ষার্থীদের এই নিম্নমুখী ফলাফল এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

পরিশিষ্ট ৭

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক কনসালটেশন কমিটি কর্তৃক শিখন যাচাই অভীক্ষা

বিষয়: বাংলা, ইংরেজি ও গণিত

শ্রেণি: অষ্টম ও নবম

সময়: ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান ৫০

১.১. শিক্ষার্থীর নাম: **১.২. রোল:**

২. শ্রেণি: ৮ম / ৯ম **১.২. শাখা/গ্রুপ (শুধু ৯ম শ্রেণির জন্য):** বিজ্ঞান / মানবিক / বাণিজ্য

৩. বিদ্যালয়ের নাম:

৪. উপজেলা:

৫. জেলা:

৬. জেন্ডার: ছেলে / মেয়ে / তৃতীয় লিঙ্গ

৭. মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা: (প্রযোজ্য বক্সে টিক চিহ্ন দাও)

- ☐ লেখাপড়া করেননি
- ☐ প্রাথমিক শিক্ষায় অংশ নিয়েছেন বা সম্পন্ন করেছেন
- ☐ মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশ নিয়েছেন বা সম্পন্ন করেছেন
- ☐ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় অংশ নিয়েছেন বা সম্পন্ন করেছেন
- ☐ জানা নেই

৮. তুমি কি প্রাইভেট পড় অথবা কোচিং সেন্টারে যাও? (প্রযোজ্য বক্সে টিক চিহ্ন দাও)

- ☐ হ্যাঁ
- ☐ না

৮.১ উত্তর হ্যাঁ হলে গত তিন মাসে আনুমানিক মোট কত টাকা খরচ হয়েছে?

বাংলা (পূর্ণমান: ১৫)

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নবম শ্রেণির ছাত্র শাকিব স্কুল যাওয়ার পথে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে। ব্যাগ হাতে নিয়ে চেইন খুলতেই অনেক টাকা দেখতে পায়। আশেপাশে কাউকে না পেয়ে সে ব্যাগটি নিয়ে দ্রুত বাসায় ফেরে। বিকেলে তার বাবা অফিস থেকে ফেরার পর ঘটনাটি তাঁকেও জানায়। তাঁরা গুনে দেখে ব্যাগে এক লক্ষ টাকা আছে। সেখানে যোগাযোগের নাম, ঠিকানা কোনো কিছুই ছিল না। শাকিবের বাবা প্রতিবেশীদের পরামর্শে মাইকিং করার সিদ্ধান্ত নেন। মাইকিং - এ বলা হয় "কিছু টাকা পাওয়া গেছে, উপযুক্ত প্রমাণসহ মালিক উপস্থিত হলে ফেরত দেওয়া হবে"। প্রথম দিন কেউ যোগাযোগ করেননি। দ্বিতীয় দিন বিকেলে ক্লান্ত ও চিন্তাগ্রস্থ একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি আসেন। তিনি দাবি করেন, তাঁর এক লক্ষ টাকাসহ ব্যাগ পথে হারিয়ে গেছে। তিনি যথাযথ প্রমাণসহ বর্ণনা দেওয়ায় নিশ্চিত হয়ে শাকিবের বাবা কয়েকজন প্রতিবেশী ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সাহেবের উপস্থিতিতে ঐ ব্যক্তিকে টাকাসহ ব্যাগটি ফেরত দেন। টাকা পেয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং শাকিবের জন্য প্রাণভরে দোয়া করেন। শাকিবের এই সততার কথা দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন স্কুলে গেলে প্রধান শিক্ষক শাকিবকে অ্যাসেম্বলিতে ডেকে তার ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করেন এবং বলেন "শাকিব আমাদের অনুপ্রেরণা, দেশের সকল শিক্ষার্থী তাকে অনুসরণ করুক - এটাই আমাদের প্রত্যাশা"।

১. "শাকিব আমাদের অনুপ্রেরণা, দেশের সকল শিক্ষার্থী তাকে অনুসরণ করুক - এটাই আমাদের প্রত্যাশা", এ উক্তি ও ঘটনাটি থেকে তুমি কী শিক্ষা গ্রহণ করলে, ব্যাখ্যা করো। ৫

২. বিরাম চিহ্ন বসাও। **৫**

লখাই বাকপ্রতিবন্ধী এক পথের কিশোর পিতৃহীন লখাই রাতে ফুটপাতে ঘুমায় তার ভিখারি মা দিনভর ভিক্ষা করে আর তার দিন কাটে বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করে কাগজ কুড়িয়ে খাবারের দোকানের এঁটোপাতা চেটে তারপরও এই লখাইয়ের সাধ জাগে সবার মতো একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে গিয়ে ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে

৩. চলিত ভাষায় রূপান্তর কর। **৫**

ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো, একটা অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র। তাই বলিয়া কাজ মানে যে সৌরভবিহীন পুষ্প, ইহা যেন কেহ মনে করিয়া না বসেন। কাজ জিনিসটাই ভাবকে রূপ দেয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে বস্তু জগতের। তাই বলিয়া ভাবকে যে আমরা মন্দ বলিতেছি বা নিন্দা করিতেছি, তাহা নহে; ভাব জিনিসটা খুবই ভালো। মানুষকে কব্জায় আনিবার জন্য তাহার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়া তাহাকে মাতাইয়া না তুলিতে পারিলে তাহার দ্বারা কোনো কাজ করানো যায় না, বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভাব-পাগল দেশে।

English (Full Mark: 15)

Read the text and answer questions 1.

There was a large castle and a garden of a Giant. The Giant went to visit his daughter far away from the castle. Some children of that locality played in his garden every afternoon. The children ran, jumped, sang, shouted and played until sunset. The Giant came back after some months and saw the children playing in his garden. "What are you doing here?" cried the Giant in a very gruff voice. The children ran away in fear.

The Giant did not like the children. To keep the children away, he built a high wall around his castle and the garden. The children were sad. Then came the spring all over the country. There were flowers and birds were chirping everywhere. Only in the garden of the Giant, there was no spring; flowers did not bloom and no birds sang. "I cannot understand why the spring is so late this year," said the Giant.

One morning, the Giant was lying in his bed when he heard some lovely music. It was so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. But in fact, it was only a little bird singing outside his window. The smell of a delicious perfume came in. "I believe the spring has come at last," said the Giant. He looked out and to his surprise saw that some children were playing in the garden and some were climbing the trees. The trees were full of flowers, buds, and fresh leaves. Nature was in a jovial mood.

The Giant felt sorry for his cruel behaviour to the children. "How selfish I have been!" he said to himself. "Now I understand why the spring did not come here." The Giant felt love for all the children. He said in a mild voice, "Children, I love you all!" Love has a power to change everything positively.

1. What made the spring return in the garden? **5**

2. Match the words in column A with their meanings in column B. **1X5 = 5**

A	B
Gruff	Fragrance
Perfume	A large house
Jovial	Soft
Castle	Angry
Mild	Jolly

gruff =

perfume =

jovial =

castle =

mild =

3. Correct the following sentences. **1X5 = 5**

a) Ten boy are playing in the field.

b) Sun is very hot.

c) I was born at 2010.

d) I see you yesterday.

e) The tree is very tall, is it?

গণিত (পূর্ণমান: ২০)

১ থেকে ৩ নং প্রশ্নের সঠিক উত্তরে টিক ($\surd$) চিহ্ন দাও। **২X৩ = ৬**

১। ১ লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন সম্পর্কে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) ১ কিলোগ্রামের একটু কম

খ) ১ কিলোগ্রামের একটু বেশি

গ) ১ কিলোগ্রামের সমান

ঘ) কোনটিই সঠিক নয়

২। যদি অ = {৩,৪,৫} এবং ই = {৭,৮} হয়, তাহলে অ∩ই = কত?

ক) $\varnothing$

খ) {০}

গ) {৭,৮}

ঘ) {৩,৪,৫,৭,৮}

৩। ১০, ১২, ১৪, ১৮, ১৯, ২৫ সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত?

ক) ১১.৫

খ) ১৪.৬

গ) ১৬

ঘ) ১৮.৬

৪। $x^2 + 5x + 6$, এবং $3x - 4$; দুইটি বীজগাণিতিক রাশি। রাশি দুটির গুণফল নির্ণয় কর। **৫**

৫। ৬ বছর পূর্বে আরিফ ও তার বাবার বয়সের অনুপাত ১:৪ ছিল। ৬ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত হবে ১:২। আরিফ ও তার বাবার বর্তমান বয়স নির্ণয় কর। ৫

৬।

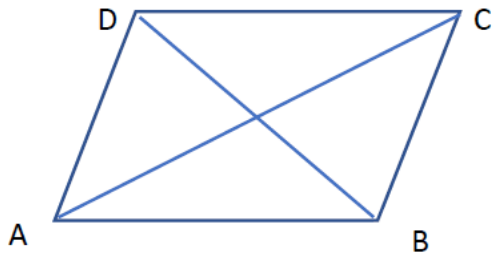

ক) উপরের চিত্র থেকে AB ভূমি বিশিষ্ট দুইটি ত্রিভুজের নাম লিখ। ২

খ) চিত্রের $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D$ সমান কত? ২

(রাফ)

পরিশিষ্ট ৮

মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা: বাছাইকৃত ৭ টি উপজেলার কেইস স্টাডি

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক কমিটি বিভিন্ন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অঞ্চলের ১১টি বিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং ১০টি বিদ্যালয়ের ৮ম এবং ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে। । এর মধ্যে হাওরাঞ্চল, শ্রমঘন শহুরে অঞ্চল, উপকূলবর্তী এলাকা, জলাবদ্ধ অঞ্চল, চা বাগান সংলগ্ন এলাকা, নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির সংলগ্ন এলাকা ইত্যাদি বিবেচনায় ৭টি উপজেলা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। এই ৭টি উপজেলায় বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন, পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়ে দক্ষতা যাচাই, উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়, মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নানা তথ্য বিশ্লেষণ-ইত্যাদির মাধ্যমে উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই পরিশিষ্টে কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের আলোকে ৭টি উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষার চিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। তবে উপজেলাভিত্তিক কেইস স্টাডি উপস্থাপনের পূর্বে উপজেলাগুলো থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলো:

- পরিদর্শনকৃত উপজেলাগুলোতে দারিদ্রের হারে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। সাধারণভাবে দেখা গেছে, ৭টির মধ্যে ৬টি উপজেলাই উচ্চ দরিদ্র এলাকা হিসেবে চিহ্নিত।
- বিগত এক দশকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমেছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমপিওভুক্ত বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। কেইস স্টাডিতে বর্ণিত উপজেলাগুলোর মধ্যে দেখা গেছে সবগুলোতেই সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা দুই থেকে তিনটি । মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হার ৬% থেকে ৮% এর মধ্যে। স্বাভাবিকভাবে, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও কম। উদাহরণস্বরূপ, কমলগঞ্জে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ৪.৯৪% শিশু; বাকি ৯৫% অন্যান্য ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।
- সব উপজেলায় ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি এবং পুরুষ শিক্ষকের তুলনায় নারী শিক্ষকের সংখ্যা কম ।
- পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পরিদর্শনকৃত প্রায় সকল উপজেলাগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। তবে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় এই অনুপাত ১ঃ ২৬ যা জাতীয় গড় অনুপাত থেকে কম।
- যদিও শিখনের মানে উপজেলাভেদে পার্থক্য রয়েছে, তবে সামগ্রিকভাবে শিখনের মান বেশ অসন্তোষজনক বলা যায়। পরিদর্শনকৃত উপজেলাগুলোতে উপজেলাভেদে ইংরেজি ও গণিতে তীব্র শিখন ঘাটতি পাওয়া গেছে ৬৮% থেকে ৭৬% শিক্ষার্থীর মধ্যে। বাংলার ক্ষেত্রে এই হার তুলনামূলকভাবে কম। বাংলায় মাত্র ১১% শিক্ষার্থীর তীব্র শিখন ঘাটতি থাকলেও ৭৩ শতাংশ নম্বর অর্জনে সক্ষম হয়েছে মাত্র ৩১% শিক্ষার্থী। গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র শিখন ঘাটতি পাওয়া গেছে সকল উপজেলায়, তবে এই মাত্রা সর্বোচ্চ আলীকদম (৯১%) ও টঙ্গীতে (৯২%)।
- দারিদ্রপীড়িত শিশুদের অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ সব উপজেলাতেই লক্ষ্য করা গেছে। সব উপজেলাতেই অতি দরিদ্র পরিবারের শিশুরা শিশুশ্রম, বন্যা ও জলাবদ্ধতা, শস্য রোপন বা পাকার সময়ে মৌসুমি কাজ ইত্যাদি কারণে বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসে না। এছাড়া অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির সমস্যার ক্ষেত্রে এলাকাভেদে পার্থক্য

রয়েছে যার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল ও সমাধান প্রয়োজন। যেমন, হাওর ও জলাবদ্ধ এলাকায় বর্ষাকালে যাতায়াত সমস্যা; পার্বত্য অঞ্চলে যাতায়াত ও আবাসিক সুবিধার অভাবে শিক্ষার্থী অনুপস্থিতি; পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় মাতৃ ভাষার শিক্ষার সুযোগের অভাব ও মাতৃভাষার শিক্ষক স্বল্পতার পাশাপাশি দুর্গমতার কারণে সারা বছর যাতায়াত সমস্যা, আবাসিক সুবিধার অভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপস্থিতি এবং জুম চাষের মৌসুমে শিক্ষার্থী অনুপস্থিতি; পর্যটন ও শহর সংলগ্ন বা শিল্পায়নঘন এলাকায় শিশুশ্রম, কর্মজীবী পরিবারের শিশুদের মৌসুমি অভিবাসন, অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে শিশুর বিদ্যালয়ে অনিয়মিত উপস্থিতি-অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এমন বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা গেছে।

- মাধ্যমিক শিক্ষায় মানব সম্পদের ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তির প্রতিকূলতাজনিত সমস্যা লক্ষ করা গেছে। বিদ্যালয়প্রতি শিক্ষক সংখ্যার অপর্যাপ্ততার চিত্র প্রায় সব উপজেলায় উঠে এসেছে। সর্বমোট ৭টি উপজেলার মধ্যে ৬টি উপজেলার তথ্য সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি। বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় উক্ত উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার এর পদ বর্তমানে শূন্য । এক্ষেত্রে উক্ত পদে ১ জন সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দায়িত্বরত রয়েছেন। উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে ১৪.৩% প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ রয়েছে।
- অবকাঠামোগত অবস্থা পর্যবেক্ষণকালে বর্ণিত ৭টি উপজেলায় মধ্যে ৩টি উপজেলার অবকাঠামোগত তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বাকি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৯৭% বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নেই যেটিকে শিক্ষকবৃন্দ বিদ্যালয়ের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অধিকাংশ উপজেলায় র‍্যাম্প , খেলার মাঠ , কম্পিউটার ল্যাব ও ডিজিটাল সুবিধাদির অভাব দেখা গেছে। বর্ণিত ৭টি উপজেলায় প্রায় ৮০% বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প এবং ৫৪% বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নেই যা প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিশুদের কার্যকর অন্তর্ভুক্তির পথে অন্তরায়। এছাড়া ৪১% বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক সংযোগের অভাব রয়েছে যা মানসম্মত শিখন পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করছে। ৪২% বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা এবং ৩৮% বিদ্যালয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। উপরন্তু, কোনো বিদ্যালয়ই খেলার মাঠ সংক্রান্ত তথ্য দিতে পারেনি যা এই গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। এগুলো শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের পথে অন্তরায়।

এখানে উল্লেখ্য, কেইস স্টাডিগুলোর তথ্য ব্যানবেইস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে সংগৃহীত। জাতীয় গড় তথ্য থেকে এগুলো কিছুটা ভিন্ন হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। তবে সামগ্রিকভাবে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে আরও যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

নিচে পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ৭টি উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১. কেশবপুর, যশোর

যশোর জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী এবং গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হলো কেশবপুর। কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত এই উপজেলাটি একদিকে যেমন তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের জন্য পরিচিত, অন্যদিকে জলাবদ্ধতার মতো কিছু দীর্ঘমেয়াদি সংকটের কারণেও আলোচনায় থাকে। সেই বিবেচনায় এই উপজেলাকে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে । বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালের প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২– এর রিপোর্ট অনুসারে কেশবপুর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২,৭৭,৬৫৫, যার ৩৩.৪% দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) চেয়ে ১৪.২% বেশি এবং অতি উচ্চ দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান: কেশবপুর উপজেলার একটি স্কুলের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ৪৮ জন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের শিখন দক্ষতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫ এবং গণিতে ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ৫০ নম্বরের একটি অভীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এতে অংশগ্রহন করে মোট ২৩ জন ছেলে ও ২৫ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। যার মধ্যে ৮ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৪ জন ও ৯ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৪ জন।

মূল্যায়নে দেখা যায়, বাংলায় মোট ৩ টি প্রশ্নের মধ্যে ৮৩% শিক্ষার্থী (৪৬জন) সকল প্রশ্নের উত্তর করেছে, ২টি প্রশ্নের উত্তর করেছে ৪.১৭% শিক্ষার্থী অর্থাৎ ২ জন। তবে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় শিক্ষার্থীরা গড়ে ৬১% (১৫নম্বরের মধ্যে ৯.১৬) নম্বর পেয়েছে। ১০.৪২% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। ৪৩.৭৫% শিক্ষার্থী ১১ নম্বর ও তার ঊর্ধ্বে স্কোর করেছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, তাদের বাংলা বিষয়ে পারদর্শিতা খুব একটা সন্তোষজনক নয়।

একই শিক্ষার্থীদের ইংরেজি দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় ২% শিক্ষার্থী (১জন) কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারেনি। তবে ৮১.২৫%শিক্ষার্থী (৩৯জন) ৩টি প্রশ্নেরই উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং ১২.৫% শিক্ষার্থী (৬জন) ২টি প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে পেয়েছে ৩৩.৮৭% (সর্বমোট ১৫নম্বরের মধ্যে ৫.০৮ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। তবে যেহেতু ২% শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারেনি, তাদের বাদ দিয়ে বাকিদের গড় স্কোর ৫.১৯ যা প্রায় ৩৪.৬%। সামগ্রিকভাবে তাদের ইংরেজি বিষয়ে পারদর্শিতা বেশ অসন্তোষজনক। ৫৬% শিক্ষার্থী অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। ৮.৩৩%শিক্ষার্থী ১১-১৫নম্বরের মধ্যে অবস্থান করছে।

গণিতের দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় মোট ৭টি প্রশ্নের মধ্যে ০-২টি প্রশ্নের উত্তর করেছে এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। তবে ৭০.৭৩% শিক্ষার্থী (৩৪জন) ৬-৭টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং বাকি ২৯.১৭% শিক্ষার্থী (১৪জন) ৩-৫ টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে তারা ৩৫% (সর্বমোট ২০নম্বরের মধ্যে ৭.০৩ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। এর মধ্যে ২% শিক্ষার্থী (১জন) কোনো নম্বর অর্জন করতে পারেনি। একই সাথে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতার হার মাত্র ২%। ৫৪.১৭% অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে এবং ৪.১৭% শিক্ষার্থী ১৫-২০ নম্বরের মধ্যে অবস্থান করছে। এ থেকে বোঝা যায় তাদের গণিতের পারদর্শিতা একদমই সন্তোষজনক নয়।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি: কেশবপুর যশোরের একটি প্রধান নদীমাতৃক ও বন্যাদুর্গত উপজেলা। ভূমি ও নদীর নিম্নাংশ হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও দীর্ঘমেয়াদি জলাবদ্ধতা -এর শিকার হয়ে থাকে এই কেশবপুর উপজেলা। বিশেষ করে মনোহরনগরসহ ১২টি গ্রামে পানি নিষ্কাশনের অভাবের কারণে পানি দীর্ঘ সময় থাকতে পারে, যা ৭ মাস পর্যন্তও টেকে। এর ফলে সড়ক, বাড়ি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিবন্দী হয়। এই অবস্থা সরাসরি বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। ২০২৫ সালে কেশবপুরে প্রায় ৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্লাবিত হয়ে শ্রেণিকক্ষে পানি ঢুকে পড়েছে, ফলে পাঠদান মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কম পানি থাকলেও স্কুল মাঠও ব্যবহারযোগ্য থাকে না এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না।

জলাবদ্ধতার কারণে রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও সমস্যায় পড়ে। উপজেলার কিছু অংশের রাস্তা দীর্ঘদিন জলমগ্ন থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই কারণে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতেও অনিচ্ছুক বা সময়মতো আসতে পারে না, বিশেষত দুরত্ব বেশি হলে আরও সমস্যা সৃষ্টি হয়।

টয়লেট, পানি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অব্যবস্থা একটি বড় অন্তর্ভুক্তি-জনিত সমস্যা। জলাবদ্ধতার কারণে বিদ্যালয়ের টয়লেট, পথ ও আশপাশে পানি জমে থাকার ফলে বিশেষত মেয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে চাইছে না, যা লিঙ্গভিত্তিক অন্তর্ভুক্তির প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। শিক্ষকরাও এসব কারণে এই এলাকায় আসতে চাননা। কেউ কেউ প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন। উপজেলা বা জেলা সদর থেকে বিদ্যালয়ে আসতে গিয়ে অনেকেই দেরি করে আসেন এবং বিদ্যালয় ছুটির আগেই চলে যান বলে মতবিনিময়ে উঠে এসেছে।

এ ছাড়াও, পানিবন্দী জীবনে জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকি, জলবাহিত রোগ, খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শিক্ষার স্থায়ী ব্যাঘাত হয়ে থাকে – যা স্থানীয় শিক্ষার মান ও অংশগ্রহণকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

সর্বোপরি, মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা, যাতায়াতে অসুবিধা এই উপজেলার প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় । তদুপরি অবকাঠামো বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষের সংকট এবং মান একটি বড় ইস্যু হওয়ায় শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বিদ্যালয় পাঠাতে চান না অভিভাবকরা।

উপজেলার পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়: কাটাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়

যশোরের কেশবপুর উপজেলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বিদ্যালয় হলো কাটাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টি ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার অন্তর্গত। কাটাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উত্তরে ও পূর্বে কৃষিজমি, বসতিপূর্ণ এলাকা, দক্ষিণে খাল ও বিলাঞ্চল এবং পশ্চিমে গ্রামীণ জনপদ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নদী ও জলাভূমি। বিদ্যালয়টি সড়কপথে কেশবপুর উপজেলা সদর ও যশোর জেলা সদরের সঙ্গে সংযুক্ত।

জনবল ও বাজেট ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয়টিতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক এর পদ শূন্য। ১৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ১২ জন কর্মরত অর্থাৎ ২০ শতাংশ পদ শূন্য এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সহায়ক কর্মচারী ৭ জনের মধ্যে ৬ জন কর্মরত অর্থাৎ ১৪ শতাংশ পদ শূণ্য। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে সহশিক্ষা চালু আছে। সর্বমোট অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ৭৭৫ জন । উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭৪ জন অর্থাৎ ৪৮.২০ শতাংশ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতাধীন। সেশনচার্জ, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফিসহ সর্বসাকুল্যে শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক আদায় নিম্নরূপ:

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	নবম শ্রেণি	দশম শ্রেণি
৩৫০০ টাকা	৩৫০০ টাকা	৩৯১০ টাকা	৩৯৬০ টাকা	৩৯৬০ টাকা

বিদ্যালয়ের অভিগম্যতা ও শিখনমান

সামগ্রিকভাবে, মাধ্যমিকে কেশবপুর উপজেলার এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলায় পারদর্শিতা মোটামুটি। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় তারা বাংলায় গড়ে ৬১% (১৫ নম্বরের মধ্যে ৯.১৬) নম্বর পেয়েছে। তবে তাদের ইংরেজি ও গণিতের পারদর্শিতা একেবারেই অসন্তোষজনক। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ইংরেজিতে পেয়েছে ৩৩.৮৭% (সর্বমোট ১৫ নম্বরের মধ্যে ৫.০৮ নম্বর) নম্বর পেয়েছে আর গণিতে ৩৫% (সর্বমোট ২০ নম্বরের মধ্যে ৭.০৩ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। এই এলাকার জলাবদ্ধতার কারণে সৃষ্ট খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা, টয়লেট, পানি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে; বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, যেখানে গ্রামীণ জনপদ, চা–বাগান এলাকা ও সামাজিক বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এ উপজেলার দারিদ্র্য শিক্ষা ব্যবস্থা, সুযোগের অসমতা এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মতো নানা চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেই বিবেচনায় এই উপজেলা কে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে । বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালের প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২ এর রিপোর্ট অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ২৮৬৬৮২, যার ২২% ই দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) চেয়ে ২.৮% বেশি এবং উচ্চ দরিদ্র এলাকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী কমলগঞ্জ উপজেলার ২ টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মোট কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ১৮ জন, যার ১০জন (৫৫.৫৬%) নারী শিক্ষক। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা মোট ৭৬৪ এর বেশি, যার ৩৫৩ বা ৪৬.২০% মেয়ে শিক্ষার্থী। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ মাদ্রাসা, এমপিও, নন–এমপিও বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট বিদ্যালয় সংখ্যা ৩২ যেখানে ৩৬৬ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যার ১১৪জন (৩১.১৫%) নারী শিক্ষক। সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৪৭৩, যার ৮৮৩৫জন বা প্রায় ৫৭% মেয়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই উপজেলায় মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ৫% সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় যাচ্ছে বাকি ৯৫% অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়ছে । এছাড়া এই উপজেলায় সার্বিকভাবে পুরুষ শিক্ষকের হার অনেক বেশি। তবে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ১০০ জনে ৫৫ জনই নারী শিক্ষক।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী শিক্ষক–শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪২ যা সরকারি হিসাবে প্রদত্ত জাতীয় অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশি(জাতীয় গড় অনুপাত ১:২৯)। সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে এই অনুপাত একই রকম (১:৪২) ।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানবসম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান: কমলগঞ্জ উপজেলার একটি স্কুলের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের শিখন দক্ষতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫ এবং গণিতে ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ৫০ নম্বরের একটি অভীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে মোট ২১ জন ছেলে ও ২৯ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। যার মধ্যে ৮ম ও ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি ক্লাস এ যথাক্রমে ২৫ জন করে।

মূল্যায়নে দেখা যায়, বাংলায় মোট ৩ টি প্রশ্নের মধ্যে ৯৮% শিক্ষার্থী (৪৯জন) সকল প্রশ্নের উত্তর করেছে, ২টি প্রশ্নের উত্তর করেছে ২% শিক্ষার্থী অর্থাৎ ১জন। তবে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় তারা গড়ে ৬২% (১৫নম্বরের মধ্যেও ৯.৩৩) নম্বর পেয়েছে। ৮% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছেএবং একই সংখ্যক শিক্ষার্থী ১৩ নম্বর ও তার ঊর্ধ্বে স্কোর করেছে। সামগ্রিকভাবে তাদের বাংলা বিষয়ে পারদর্শিতা মোটামুটি।

একই শিক্ষার্থীদের ইংরেজি দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় ২% শিক্ষার্থী (১জন) কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারেনি। তবে ৬০%শিক্ষার্থী (৩০জন) ৩টি প্রশ্নেরই উত্তর করেছে এবং ৩৪% শিক্ষার্থী (১৭জন) ২টি প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ১৮.২% (সর্বমোট ১৫নম্বরের মধ্যে ২.৭৩ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। তবে যেহেতু ২% শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারেনি, তাদের বাদ দিয়ে বাকিদের গড় স্কোর ২.৭৯ যা প্রায় ১৮.৬%। সামগ্রিকভাবে তাদের ইংরেজি বিষয়ে পারদর্শিতা বেশ অসন্তোষজনক। ৯০% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। ২% শিক্ষার্থী ১৪নম্বর পেলেও হতাশাজনকভাবে তারা ব্যতীত আর কেউ ১০ নম্বরের বেশি পায়নি।

গণিতের দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় মোট ৭টি প্রশ্নের মধ্যে ৪% শিক্ষার্থী (২জন) ০–২টি প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে। তবে ৩৬%শিক্ষার্থী (১৮জন) ৬–৭টি প্রশ্নেরই উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং বাকি ৬০% শিক্ষার্থী (৩০জন) ৩–৫ টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ১৮.৩% (সর্বমোট ২০নম্বরের মধ্যে ৩.৬৬ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। এর মধ্যে ১২% শিক্ষার্থী (৬জন) কোনো নম্বর অর্জন করতে পারেনি। একজন শিক্ষার্থীও সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। একই সাথে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতার হার ও ০% এবং ৪% শিক্ষার্থী (২জন) সর্বোচ্চ ১০নম্বর পেয়েছে। এছাড়া ৯০% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। এ থেকে বোঝা যায় তাদের গণিতের পারদর্শিতা অত্যন্ত অসন্তোষজনক।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি: কমলগঞ্জ মৌলভীবাজারের পিছিয়ে পড়া একটি উপজেলা। কমলগঞ্জের অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত প্রধানতম চ্যালঞ্জগুলোর একটি হলো চা বাগান বেষ্টিত অঞ্চল হওয়ার কারণে এখানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা, বিশেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা একেবারেই কম। সীমান্তবর্তী চা বাগানগুলোতে দেখা যায় টিলার উপর অবস্থিত ভাঙা টিনশেড ঘরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। হেলে পড়া ঘরের ভেতরেই গাদাগাদি করে বসে চলে শিখন কার্যক্রম। আবার দেখা যায় একই ঘরে বাঁশের বেড়া দিয়ে ভাগ করা হয়েছে দুটি শ্রেণিকক্ষ। চা বাগান কেন্দ্রিক জীবিকা পরিচালিত হওয়ার কারণে বেশিরভাগ পরিবারই দরিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করছে। ফলে বংশ পরম্পরায় অধিকাংশ বাবা–মা'রাই চা শ্রমিক। নিরক্ষরতার কারণে তাদের মধ্যে সন্তানদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা কম। পারিপার্শ্বিক কারণে স্বাভাবিকভাবেই এই সন্তানরা শিক্ষার থেকে উপার্জনের পথকেই প্রাধান্য দেয়।

মৌলভীবাজার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, জেলার চা বাগানের বিদ্যালয়গুলো বাগান কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করে। এসব বিদ্যালয়ে প্রাথমিকেই ৩০–৪০% শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ে, মাধ্যমিকে গিয়ে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৭০–৮০%। র‍্যাম্প ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা এই উপজেলার প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়। ৫০% সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নেই। মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নেই ৫০% বিদ্যালয়ে। প্রধান শিক্ষকবৃন্দ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর ট্রেনিং পেলেও সহকারী শিক্ষকগণ কোনো প্রশিক্ষণ পাননি বলে মতবিনিময়ে জানা যায়।

সর্বোপরি, শ্রেণিকক্ষের অভাবে, অভিভাবকের অসচ্ছলতা ও অসচেনতা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের শিক্ষণ জ্ঞান নিয়েও থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন।

অবকাঠামোগত অবস্থা: উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, কমলগঞ্জে মোট ৩২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে যার মধ্যে ২টি সরকারি ও ২৩টি এমপিওভুক্ত স্কুল রয়েছে। কমলগঞ্জ উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে নানাবিধ অবকাঠামোগত সমস্যার চিত্রটি স্পষ্ট।

মৌলভীবাজারের চা বাগান বেষ্টিত একটি উপজেলা হিসেবে এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ, ইন্টারনেট ও বিশুদ্ধ খাবার পানির অপর্যাপ্ততা রয়েছে। বিশেষ করে এমপিওভুক্ত ও অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোতে মোট স্কুলসংখ্যার (৩০) তুলনায় উক্ত সেবাগুলো বেশ অপর্যাপ্ত (বিশুদ্ধ খাবার পানি ৫১%, ইন্টারনেট ২৯%, বিদ্যুৎ ৫১%)। তবে কম্পিউটার সুবিধা মাত্র ৩টি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থাকলেও ইন্টারনেট সংযোগ প্রায় ৬টি বিদ্যালয়ে রয়েছে। ফলে এই ইন্টারনেট আদৌ কোনো ব্যবহারে যাচ্ছে কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অন্যান্য অবকাঠামোগত সমস্যাও বেশ তীব্র।

সীমানা প্রাচীর সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থেকে যাচ্ছে। এছাড়া মোট বিদ্যালয়ের মাঝে মাত্র ৯% বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প এবং ৪০% বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশ ব্লক এর উপস্থিতি প্রতিবন্ধী শিশু এবং মেয়ে শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে বাধাগ্রস্ত করছে। মোট বিদ্যালয়ের মাঝে মাত্র ৩৭% বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি, ৫৩% বিদ্যালয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, ৩১% বিদ্যালয়ে কমন টয়লেট এর উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের পথে অন্তরায়। পাশাপাশি যথেষ্ট পরিমাণ নিরাপদ শ্রেণিকক্ষের অভাব মানসম্মত শিখনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যথেষ্ট পরিমাণ নিরাপদ শ্রেণিকক্ষের অভাব মানসম্মত শিখনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিরাপদ খেলার মাঠ সম্পর্কিত ও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

উপজেলার পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়: মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার চা বাগান সংলগ্ন এলাকার একটি বিদ্যালয় মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়। এটি ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চা বাগান বেষ্টিত এলাকায় শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মাধবপুর বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার অন্তর্ভুক্ত। মাধবপুরের উত্তরে ও পূর্বে চা–বাগান এলাকা, দক্ষিণে কৃষিজমি এবং পশ্চিমে বসতিপূর্ণ রয়েছে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য মৌলভীবাজার জেলার কিছু অংশের কাছাকাছি হওয়ায় এই অঞ্চলে সীমান্তবর্তী ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি সড়কপথে কমলগঞ্জ উপজেলা সদর ও মৌলভীবাজার জেলা সদরের সঙ্গে সংযুক্ত।

জনবল ও বাজেট ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয়টিতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক এর পদ শূন্য। ১৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ১২ জন কর্মরত অর্থাৎ ২০শতাংশ পদ শূন্যএবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সহায়ক কর্মচারী ৭ জনের মধ্যে ৬ জন কর্মরত অর্থাৎ ১৪ শতাংশ পদ শূন্য। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে সহশিক্ষা চালু আছে। সর্বমোট ৭৭৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭৪ জন অর্থাৎ ৪৮.২০ শতাংশ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতাধীন। সেশনচার্জ, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফিসহ সর্বসাকুল্যে শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক আদায় নিম্নরূপ:

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	নবম শ্রেণি	দশম শ্রেণি
৩৫০০ টাকা	৩৫০০ টাকা	৩৯১০ টাকা	৩৯৬০ টাকা	৩৯৬০ টাকা

বিদ্যালয়ের অভিগম্যতা ও শিখনমান

সামগ্রিকভাবে, মাধ্যমিকে কমলগঞ্জ উপজেলার এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলায় পারদর্শিতা মোটামুটি। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় বাংলায় গড়ে ৬২% (১৫নম্বরের মধ্যেও ৯.৩৩) নম্বর পেয়েছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ইংরেজিতে ১৮.২% (সর্বমোট ১৫নম্বরের মধ্যে ২.৭৩ নম্বর) আর গণিতে ১৮.৩% (সর্বমোট ২০নম্বরের মধ্যে ৩.৬৬ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। যা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। দারিদ্রতা, বাবা-মায়ের অসচেতনতা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে অন্তরায়। বিশেষ করে র‍্যাম্প ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা এই উপজেলার প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়।

৩. কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার হাওরবেষ্টিত কুলাউড়া, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। চা এই উপজেলার অন্যতম অর্থনৈতিক সম্পদ, যা বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। তবে প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) অনেক পরিবারের জীবিকায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সেই বিবেচনায় এই উপজেলা কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে । বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালের প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২- এর রিপোর্ট অনুসারে কুলাউড়া উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩৯৪১৫৬, যার ২৬.৫% দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) এর চেয়ে ৭.৩% বেশি এবং উচ্চ দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী কুলাউড়া উপজেলার ৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট কর্মরত শিক্ষক আছেন ৫২জন, যার প্রায় ৫৩.৮৫ শতাংশ নারী শিক্ষক। এসব বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ১৩১৮ জন, যার মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৪২৫জন বা ৩২.২৫% । সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ মাদ্রাসা, এমপিও, নন-এমপিও বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট বিদ্যালয় সংখ্যা ৩৭ যেখানে ৪৬৬জন শিক্ষক কর্মরত আছেন, যার ৩৩৬জন (৭২%) নারী শিক্ষক। সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯১০৭, যার ১১৫৭২ জন বা প্রায় ৬০.৬% মেয়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই উপজেলায় মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ৬.৯% সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় যাচ্ছে বাকি ৯৩% অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়ছে । এছাড়া এই উপজেলায় সার্বিকভাবে নারী শিক্ষকের হার কিছুটা বেশি। বিশেষ করে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতি ১০০ জনে মাত্র ৫৪ জন নারী শিক্ষক।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এই উপজেলার শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪১ যা সরকারি হিসাবে প্রদত্ত জাতীয় অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশি (জাতীয় গড় অনুপাত ১:২৯)। সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে এই অনুপাতে বেশ কিছুটা তারতম্য রয়েছে(১:২৫) ।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানবসম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান

কুলাউড়া উপজেলার একটি স্কুলের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ৪৯ জন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের শিখন দক্ষতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫ এবং গণিতে ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ৫০ নম্বরের একটি অভীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে মোট ১৫ জন ছেলে ও ৩৪ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। যার মধ্যে ৮ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৭ জন ও ৯ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩২ জন।

মূল্যায়নে দেখা যায়, বাংলায় মোট ৩ টি প্রশ্নের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী (৪৯জন) সকল প্রশ্নের উত্তর করেছে। কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় তারা গড়ে ৬৯.৫৩%

(১৫নম্বরের মধ্যেও ১০.৪৩) নম্বর পেয়েছে। ২% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। ৫৬% শিক্ষার্থী ১১ নম্বর ও তার উর্ধ্বে স্কোর করেছে। সামগ্রিকভাবে তাদের বাংলা বিষয়ে পারদর্শিতা মোটামুটি।

একই শিক্ষার্থীদের ইংরেজি দক্ষতা মূল্যায়নে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। ৮১.৬৩%শিক্ষার্থী (৪০জন) ৩টি প্রশ্নেরই উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং ১৮.৩৭% শিক্ষার্থী (৯জন) ২টি প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ৪৯ জন ৪৬.৫৩% (সর্বমোট ১৫নম্বরের মধ্যে ৬.৯৮ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে তাদের ইংরেজি বিষয়ে পারদর্শিতা অসন্তোষজনক। ৩০.৬১% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে এবং ১৪.৩% শিক্ষার্থী ১১ বা তার বেশি নম্বর অর্জন করেছে।

গণিতের দক্ষতা মূল্যায়নে মোট ৭টি প্রশ্নের কোনোটির উত্তর প্রদান করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। তবে ৬১%শিক্ষার্থী (৩০জন) ৬–৭টি প্রশ্নেরই উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং বাকি ৩৮.৭৮% শিক্ষার্থী (১৯জন) ৩–৫ টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় ৩৮.৭৫% (সর্বমোট ২০নম্বরের মধ্যে ৭.৭৫ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। ১–৭স্কোর (৩৩% বা তার নিচে) অর্জন করেছে ৪২.৮৬% এবং ১৫–২০ স্কোর করেছে প্রায় ৬.১২% শিক্ষার্থী। এ থেকে বোঝা যায় তাদের গণিতের পারদর্শিতা একদমই সন্তোষজনক নয়।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওর বেষ্টিত উপজেলা কুলাউড়া। এই উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত প্রধানতম চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে – বর্ষা মৌসুমে হাওর পানিতে পরিপূর্ণ থাকার কারণে যাতায়াতের সমস্যা। বর্ষায় পানি বেশি বাড়লে অনেক সময় স্কুল বন্ধ থাকে। আবার স্কুল খোলা থাকলেও শিক্ষার্থীদের নৌকা দিয়ে স্কুলে আসতে হয়। নৌকা যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হলেও এটি ব্যয়বহুল। আবার এই অঞ্চলের পরিবারগুলো শুধুমাত্র বোরো ধানের উপর নির্ভরশীল। বন্যায় ফসল নষ্টও হয়ে গেলে দরিদ্রতা বেড়ে যায়, ফলে অনেক শিশু পড়াশুনা ছেড়ে জীবিকা নির্বাহের সন্ধানে লেগে পরে।

আবার এই অঞ্চলের অনেক অভিভাবক বিশেষ করে বাবারা জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ও যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমায়। তাই কারণবশত ওই এলাকাগুলোর মানুষের মধ্যে শিক্ষার সচেতনতা কম। বিদেশগামী নির্ভর চিন্তার কারণে শিশুরা শৈশব থেকেই শিক্ষাবিমুখ হয়ে বেড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে মাধ্যমিকে এসে তারা বেশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ, প্রয়োজনে বর্ষা মৌসুমে মোবাইল স্কুল বা শিক্ষতরীর আদলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

র‍্যাম্প ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা এই উপজেলার প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়। ৬৬% সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নেই। মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক সম্পর্কিত কোনো তথ্যই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি যাতায়াত সমস্যার কারণে শিক্ষকরাও এসব অঞ্চলে আসতে চান না।

সর্বোপরি, বর্ষায় যাতায়াতের অসুবিধা, অভিভাবকের অসচ্ছলতা ও অসচেনতা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, স্কুল বন্ধ প্রভৃতি কারণে শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। এসব সমস্যা সমাধানে সরকারের কোনো নির্দিষ্ট মাস্টারপ্ল্যান নেই বলে স্থানীয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা জানান।

অবকাঠামোগত অবস্থা

উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, কুলাউড়ায় মোট ৭০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে যার মধ্যে ৩টি সরকারি ও ৩০টি এমপিওভুক্ত স্কুল রয়েছে।

কুলাউড়া উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে সংকট রয়েছে ডিজিটাল সুযোগ সুবিধার। কম্পিউটার রয়েছে মাত্র ৭.১৪% (৫টি) বিদ্যালয়ে। এছাড়াও ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। আইসিটি

ল্যাব রয়েছে মাত্র ৮.৫% বিদ্যালয়ে। সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে উক্ত সুবিধাগুলো প্রত্যক্ষ করা যায়নি। এছাড়া মোট বিদ্যালয়ের মাত্র ১.৪৩% বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর, ৭.১৪% বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক, ৩৪% বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ এই উপজেলার বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত সংকটের চিত্র তুলে ধরে। বাউন্ডারি ওয়ালের অভাব বিদ্যালয়ের ও শিশুদের নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করছে, বিশেষ করে যেই বিদ্যালয়গুলো শহর এলাকায় অবস্থিত সেখানে ঝুঁকি বেশি। ৩৩% সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে র‍্যাম্প থাকলেও এমপিও ভুক্ত ও অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোতে এর হার ১.৫%। মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের স্বল্পতা ও র‍্যাম্প এর অপর্যাপ্ততা নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির পথে। নিরাপদ খেলার মাঠ, মাল্টিমিডিয়া ও শিক্ষকদের জন্য রুম আছে কি নেই এই ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

উপজেলার পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়: ভূকশিমইল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার হাকালুকি হাওড় সংলগ্ন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভূকশিমইল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ । এটি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করে আসছে। ভুকশিমইল বিদ্যালয়টি বাংলাদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার অদূরে অবস্থিত। ভুকশিমইল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজটি সড়কপথে কুলাউড়া উপজেলা সদর ও মৌলভীবাজার জেলা সদরের সঙ্গে সংযুক্ত।

জনবল ও বাজেট ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয়টিতে অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক এর পদ শূন্য। ২৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ২০ জন কর্মরত অর্থাৎ ২৪শতাংশ পদ শূন্যএবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সহায়ক কর্মচারী ৯ জনের মধ্যে ৮ জন কর্মরত অর্থাৎং ১২ শতাংশ পদ শূন্য। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে সহশিক্ষা চালু আছে। সর্বমোট অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ৫৫৮ জন। উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১০ জন অর্থাৎ ৩৭.৬৩ শতাংশ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতাধীন। সেশনচার্জ, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফিসহ সর্বসাকুল্যে শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক আদায় নিমরূপ:

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	নবম শ্রেণি	দশম শ্রেণি
২৭৭০ টাকা	২৮৩০ টাকা	২৮৩০ টাকা	৩৪৮০ টাকা	৩৪৮০ টাকা

বিদ্যালয়ের অভিগম্যতা ও শিখনমান

সামগ্রিকভাবে, মাধ্যমিকে কুলাউড়া উপজেলার এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলায় পারদর্শিতা মোটামুটি। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় সকলে বাংলায় গড়ে ৬৯.৫৩% (১৫নম্বরের মধ্যেও ১০.৪৩) নম্বর পেয়েছে।ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে পেয়েছে ৪৬.৫৩% (সর্বমোট ১৫ নম্বরের মধ্যে ৬.৯৮ নম্বর) নম্বর। এ থেকে বোঝা যায় তাদের এই বিষয়ে তেমন পারদর্শিতা নেই। গণিতে গড়ে পেয়েছে ৩৮.৭৫% (সর্বমোট ২০ নম্বরের মধ্যে ৭.৭৫ নম্বর) নম্বর । যা অত্যন্ত অসন্তোষজনক।

এই বিদ্যালয়ে বন্যায় হাওর পানিতে পরিপূর্ণ থাকার কারণে খারাপ যাতায়াত ব্যবস্থা, পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা ও জীবিকার তাগিদে বিদেশমুখী হওয়া এবং অসচেতনতার কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। র‍্যাম্প ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়।

৪. আলীকদম, বান্দরবান

বান্দরবান জেলার পাহাড়বেষ্টিত এক চমৎকার জনপদ আলীকদম। মাতামুহুরী নদীর তীরে অবস্থিত এই উপজেলাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যতটা সমৃদ্ধ, এর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। সেই বিবেচনায় এই উপজেলাকে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে । বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালের প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২– এর রিপোর্ট অনুসারে আলীকদম উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৫৯,১৬২, যার ২৭.৭% দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) এর চেয়ে ৮.৫% বেশি এবং উচ্চ দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান: আলীকদম উপজেলার একটি স্কুলের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ৩৫ জন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের শিখন দক্ষতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫ এবং গণিতে ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ৫০ নম্বরের একটি অভীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এতে অংশগ্রহন করে মোট ১৫ জন ছেলে ও ২০ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। যার মধ্যে ৮ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৩ জন ও ৯ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১২ জন।

মূল্যায়নে দেখা যায়, বাংলায় মোট ৩ টি প্রশ্নের মধ্যে ৯৭.১৪% শিক্ষার্থী (৩৪জন) সকল প্রশ্নের উত্তর করেছে, ২টি প্রশ্নের উত্তর করেছে ২.৮৫% শিক্ষার্থী অর্থাৎ ১ জন। তবে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় তারা গড়ে ৪৯.৫৩% (১৫নম্বরের মধ্যেও ৭.৪৩) নম্বর পেয়েছে। ২২.৮৬% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। মাত্র ৮.৫৭% শিক্ষার্থী ১১ নম্বর ও তার উর্ধ্বে স্কোর করেছে। সামগ্রিকভাবে তাদের বাংলা বিষয়ে পারদর্শিতা যথেষ্ট অসন্তোষজনক।

একই শিক্ষার্থীদের ইংরেজি দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারেনি এমন কোনো শিক্ষার্থী নেই। তবে ৭১.৪৩% শিক্ষার্থী (২৫জন) ৩টি প্রশ্নেরই উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং ২৮.৫৭% শিক্ষার্থী (১০জন) ২টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ৩৫জন পেয়েছে ১৬.৪% (সর্বমোট ১৫নম্বরের মধ্যে ২.৪৬ নম্বর) নম্বর। সামগ্রিকভাবে তাদের ইংরেজি বিষয়ে পারদর্শিতা খুবই অসন্তোষজনক। ৩২জন অর্থাৎ ৯১.৪৩% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। একইসাথে ১১ বা তার উপরে স্কোর করেছে এমন কোনো শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি।

গণিতের দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় মোট ৭টি প্রশ্নের মধ্যে ২.৮৬% শিক্ষার্থী (১জন) ০–২টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে। ৩১.৪৩%শিক্ষার্থী (১১জন) ৬–৭টি প্রশ্নেরই উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং বাকি ৬৫.৭১% শিক্ষার্থী (২৩জন) ৩–৫ টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ৩৫ জন ১৭.১৫% (সর্বমোট ২০ নম্বরের মধ্যে ৩.৪৩ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। এর মধ্যে ১৭.১৪% শিক্ষার্থী (৬জন) কোনো নম্বর অর্জন করতে পারেনি। একই সাথে কোনো শিক্ষার্থী ১৫ নম্বরের বেশি অর্জন করতে পারেনি। ৯১.৪৩% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। এ থেকে বোঝা যায় তাদের গণিতের পারদর্শিতা একেবারে নেই বললেই চলে।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি: বান্দরবান জেলার অন্তর্গত উপজেলা আলীকদমে মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত প্রধানতম চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে – পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় প্রয়োজনের তুলনায় কমসংখ্যক বিদ্যালয়ের

সংখ্যা। পাশাপাশি শিক্ষা সেবা ব্যাহত করার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক দুর্গমতা অন্যতম; বিশেষ করে মাতামুহুরী নদী এবং খাড়া পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে অনেক শিক্ষার্থীকে মূল জনপদে আসতে হয়, যার কারণে বর্ষাকালে জীবনঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবাসিক সুযোগ–সুবিধা সম্পন্ন বিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষার অভিগম্যতা থাকলেও এই ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ, প্রয়োজনে বর্ষা মৌসুমে মোবাইল স্কুল বা শিক্ষাতরীর আদলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি যথাসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন বিশেষ করে আবাসিক বিদ্যালয় চালু করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও শেখার ক্ষেত্রে ভাষা সংক্রান্ত সমস্যা একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৭ সাল হতে নৃ–গোষ্ঠী শিশুদের (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও ওঁরাও) পাঁচটি মাতৃভাষায় পাঠদানের বই বিতরণ করা হলেও ওই ভাষার শিক্ষক তথা প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। ফলে আলীকদমের পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা) শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাকার্যক্রম পুরোপুরি কাজে আসছে না। তারা শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

সর্বোপরি, শিক্ষায় অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক দুর্গমতা, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, ভাষাগত ব্যবধান, শিক্ষকের অপ্রতুলতা পাহাড়ি এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। এসব সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আলীকদমে একটি টেকসই ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

মানব সম্পদের অবস্থা: আলীকদমে বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৭২টি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদের বিপরীতে ৫৪ জন কর্মরত আছেন। এছাড়া বিভিন্ন পদে শূন্যপদের হিসেব নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো।

আলীকদম উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষায় মানব সম্পদের অবস্থা

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদের হার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	০১	০	১০০%
সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০%
অন্যান্য (উপজেলা শিক্ষা অফিস)	০৩	০১	৬৬.৬৭%
উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	০১	০	১০০%
প্রধান শিক্ষক	০৭	০৬	১৪.৩%
সহকারী শিক্ষক	৬৫	৪৮	২৬.১৫%
অন্যান্য	০৬	০১	৮৩.৩৩%

বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় উক্ত উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার এর পদ বর্তমানে শূন্য । এক্ষেত্রে উক্ত পদে ১ জন সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দায়িত্বরত রয়েছেন। উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে ১৪.৩% প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ রয়েছে। মতবিনিময়কালে জানা যায়, ঢাকা মহানগরীর কাছে অবস্থিত না হওয়ায় এই উপজেলায় পদায়নের ব্যাপারে কর্মকর্তাদের স্পষ্টতই আগ্রহ নেই। এছাড়া পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়টিতেও প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য থাকায় বিদ্যালয়টিতে নেতৃত্বের জায়গাটিতে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। সহকারী শিক্ষক পদে ২৬.১৫% পদ খালি থাকা শ্রেণিকক্ষে

শিখন নিশ্চিতকরণে অন্তরায়। সবমিলিয়ে ৩২% পদ শূন্য রয়েছে যা আশু পূরণ করা প্রয়োজন বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদগুলো। শূন্য পদগুলো পূরণ করা গেলে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি সাধিত হবে আশা করা যায়।

উপজেলার পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়: আলীকদম আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়

বান্দরবানের আলীকদমে অবস্থিত একটি পরিচিত প্রতিষ্ঠান আলীকদম আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়। এটি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে আলীকদম উপজেলা ও আশেপাশের এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করে আসছে। বিদ্যালয়টি পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ড কতৃর্ক পরিচালিত এবং শিক্ষার্থী শতভাগ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর । বিদ্যালয়টি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত বান্দরবান জেলার আলীকদম উপজেলায়। বিদ্যালয়টির উত্তরে ও পূর্বে পাহাড়ি বন, দক্ষিণে গ্রামীণ বসতি এবং পশ্চিমে স্থানীয় সড়ক ও মাতামুহুরী নদী। আলী কদম এলাকার প্রধান সড়ক ও স্থানীয় পথের মাধ্যমে উপজেলা সদর ও বান্দরবান জেলা সদর সঙ্গে সংযুক্ত। বিদ্যালয়টি শতভাগ আবাসিক।

জনবল ও বাজেট ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয়টিতে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য ও সহকারী প্রধান শিক্ষক আছেন। ১৭জন শিক্ষকের মধ্যে ১৭ জন কর্মরত অর্থাৎ শূন্য পদ নেই এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সহায়ক কর্মচারী ১৮জনের মধ্যে ১৩জন কর্মরত অর্থাৎ ১৮ শতাংশ পদশূণ্য। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে সহশিক্ষা চালু আছে। সর্বমোট ২১৫জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। উপবৃত্তির কার্যক্রম পূর্বে ছিল বর্তমানে নেই। সেশনচার্জ, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফিসহ সর্বসাকুল্যে শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক আদায় নিম্নরূপ:

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	নবম শ্রেণি	দশম শ্রেণি
বিনামূল্যে	বিনামূল্যে	বিনামূল্যে	বিনামূল্যে	বিনামূল্যে

বিদ্যালয়ের অভিগম্যতা ও শিখনমান

সামগ্রিকভাবে, মাধ্যমিকে আলীকদম উপজেলার এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলায় তেমন পারদর্শিতা নেই । বাংলায় প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ৪৯.৫৩% (১৫নম্বরের মধ্যেও ৭.৪৩) নম্বর পেয়েছে। ইংরেজিতে পেয়েছে গড়ে ১৬.৪% (সর্বমোট ১৫ নম্বরের মধ্যে ২.৪৬ নম্বর) এবং গণিতে ১৭.১৫% (সর্বমোট ২০ নম্বরের মধ্যে ৩.৪৩ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। এই দুই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা শোচনীয়। বিদ্যালয়টির ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে যাতায়াত অব্যবস্থা,অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা,ভাষাগত ব্যবধান, শিক্ষকের অপ্রতুলতা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে বাধা তৈরি করছে। এলাকায় পর্যাপ্ত বিদ্যালয় না থাকায় এই একটি বিদ্যালয়ের উপর নির্ভলশীলতা ও চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. উখিয়া, কক্সবাজার

উখিয়া, কক্সবাজার জেলার একটি সীমান্তবর্তী উপজেলা, যেখানে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির অবস্থিত। এটি এলাকার সামাজিক কাঠামোকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। রোহিঙ্গা সংকটের কারণে স্থানীয় শ্রমবাজারে সৃষ্টি হয়েছে চাপ, কমেছে মজুরি। সেই বিবেচনায় এই উপজেলাকে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান

ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালের প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২– এর রিপোর্ট অনুসারে উখিয়া উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২৫৮৩১৩, যার ২৭.৪% দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) এর চেয়ে ৮.২% বেশি এবং উচ্চ দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী উখিয়া উপজেলার ২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট কর্মরত শিক্ষক আছেন ১৯জন, যার প্রায় ২৬.৮৪ শতাংশ নারী শিক্ষক। এসব বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৭৯৭ জন, যার মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৪২৩জন বা ৫৩% । সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ মাদ্রাসা, এমপিও, নন–এমপিও বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট বিদ্যালয় সংখ্যা ৩০ যেখানে ৩৫০জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যার ১১৭জন (৩৩.৪৩%) নারী শিক্ষক। সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭২৬৫, যার ৯৯৪৮ জন বা প্রায় ৫৭.৬২% মেয়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই উপজেলায় মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ৪.৬২% সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় যাচ্ছে বাকি ৯৫.৩৮% অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়ছে । এছাড়া এই উপজেলায় সার্বিকভাবে পুরুষ শিক্ষকের হার কিছুটা বেশি। তবে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক তুলনামূলক অনেকটা বেশি, প্রতি ১০০ জনে মাত্র ৫৩ জন।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এই উপজেলার শিক্ষক–শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪৯ যা সরকারি হিসাবে প্রদত্ত জাতীয় অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশি (জাতীয় গড় অনুপাত ১:২৯)। সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে এই অনুপাতে কিছুটা তারতম্য রয়েছে(১:৪২) ।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানবসম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান: উখিয়া উপজেলার একটি স্কুলের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ৫৬ জন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের শিখন দক্ষতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫ এবং গণিতে ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ৫০ নম্বরের একটি অভীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে মোট ২৭ জন ছেলে ও ২৯ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। যার মধ্যে ৮ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৬ জন ও ৯ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০ জন।

মূল্যায়নে দেখা যায়, বাংলায় মোট ৩ টি প্রশ্নের মধ্যে ৯৪.৬৪% শিক্ষার্থী (৫৩জন) সকল প্রশ্নের উত্তর করেছে। কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ৫৯.৭৩% (১৫নম্বরের মধ্যেও ৮.৯৬) নম্বর পেয়েছে। ১২.৫% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। মাত্র ৩৭.৫% শিক্ষার্থী ১১ নম্বর ও তার উর্ধ্বে স্কোর করেছে । সামগ্রিকভাবে তাদের বাংলা বিষয়ে পারদর্শিতা অসন্তোষজনক।

একই শিক্ষার্থীদের ইংরেজি দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। তবে ৮০.৩৫%শিক্ষার্থী (৪৫জন) ৩টি প্রশ্নেরই উত্তর করেছে এবং ১৬.০৭% শিক্ষার্থী (৯জন) ২টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং সর্বশেষ ১টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে ৩.৫৭% অর্থাৎ ২জন শিক্ষার্থী। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ৩৩.৩% (সর্বমোট ১৫নম্বরের মধ্যে ৫ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে তাদের ইংরেজি বিষয়ে পারদর্শিতা অসন্তোষজনক। ৬৪.২৯% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে এবং ৭.১৪% শিক্ষার্থী ১১ বা তার বেশি নম্বর অর্জন করেছে।

গণিতের দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় মোট ৭টি প্রশ্নের কোনটির উত্তর প্রদান করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। ৪২.৮৬%শিক্ষার্থী (২৪জন) ৬–৭টি প্রশ্নেরই উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং বাকি ৫৫.৩৬% শিক্ষার্থী (৩১জন) ৩–৫ টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে । প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ৫৬জন পেয়েছে ২৩.৮৫% (সর্বমোট ২০নম্বরের মধ্যে ৪.৭৭ নম্বর) নম্বর । ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে ৭৫% শিক্ষার্থী এবং ১৫–২০ স্কোর করেছে প্রায় ৩.৬% শিক্ষার্থী। এ থেকে বোঝা যায় তাদের গণিতের পারদর্শিতা একদমই সন্তোষজনক নয়।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি: উখিয়া বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। ভৌগোলিক দুর্গমতা, দারিদ্র্য এবং শরণার্থী সংকটের প্রভাবে তৈরি হওয়া শিক্ষক স্বল্পতা এখানে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ের দূরত্ব এবং যাতায়াত খরচ শিক্ষার সুযোগকে সীমিত করে, যা অনেক ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে উচ্চহারে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পর্যটন এই অঞ্চলের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাজারমূল্য তুলনামূলক বেশি। ফলে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার ব্যয়ও বেশি। এক্ষেত্রে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিশেষ শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা প্রয়োজন যাতে জীবনযাত্রার উচ্চব্যয়ের কারণে তারা ঝরে না পড়ে।

উখিয়ায় রোহিঙ্গা শিবিরের উপস্থিতি স্থানীয় অবকাঠামো, সম্পদ ও শিক্ষা সেবার উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। একইসাথে উক্ত সমস্যাটি এই অঞ্চলের স্বাভাবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও শিক্ষার পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। ফলে অনেক অভিভাবকই বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের মেয়ে শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনাগ্রহী হয়ে পড়ছেন। রোহিঙ্গা শিবিরের কারণে সৃষ্ট নিরাপত্তাহীনতা কাটাতে বিদ্যালয়গুলোতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, পর্যাপ্ত নারী নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ এবং সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে অভিভাবকদের আস্থা ফিরিয়ে আনা অপরিহার্য।

র‍্যাম্প এর অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা এই উপজেলার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়। ৫০% সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নেই। এমনকি নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কারণে শিক্ষকরাও এসব অঞ্চলে আসতে চান না।

সর্বোপরি, নিরাপত্তাজনিত অসুবিধা, অভিভাবকের অসচ্ছলতা ও বাড়তি খরচ, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, শিক্ষক সংকট প্রভৃতি কারণে শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। এসব সমস্যা সমাধানে সরকারের কোনো নির্দিষ্ট মাস্টারপ্ল্যান নেই বলে স্থানীয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা জানান।

অবকাঠামোগত অবস্থা: উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, উখিয়ায় মোট ৪৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে যার মধ্যে ২টি সরকারি ও ১৪টি এমপিওভুক্ত স্কুল রয়েছে।

উখিয়া উপজেলার নানাবিধ অবকাঠামোগত সমস্যার চিত্রটি স্পষ্ট। উপকূলীয় ও প্রান্তিক একটি উপজেলা হিসেবে বিদ্যুৎ সংযোগ, ইন্টারনেট সংকট লেখচিত্রে উঠে এসেছে। তবে বিদ্যুৎ সংযোগ ২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই থাকলেও কম্পিউটার সব বিদ্যালয়ে নেই। ফলে ডিজিটাল শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। অন্যান্য অবকাঠামোগত সমস্যাও বেশ তীব্র। মোট বিদ্যালয়ের মাত্র ১৯% বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প রয়েছে যা প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে বাধাগ্রস্ত করছে। মোট বিদ্যালয়ের মাঝে ৩০% বিদ্যালয়ে আইসিটি ল্যাব, ৬% বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীরের উপস্থিতি এই উপজেলার বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত সংকটের চিত্র তুলে ধরে। যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপদ শ্রেণিকক্ষের অভাব মানসম্মত শিখনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উল্লেখ্য, মাল্টিমিডিয়ার, খেলার মাঠ, শিক্ষকদের জন্য আলাদা রুম - এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

কুতুপালং উচ্চ বিদ্যালয়, উখিয়া

উপকুলীয় ও প্রত্যন্ত উপজেলায় শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করে আসা একটি প্রতিষ্ঠান কুতুপালং উচ্চ বিদ্যালয়। এটি ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুতুপালং উচ্চ বিদ্যালয় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার কুতুপালং এলাকায়। বিদ্যালয়টির উত্তরে ও পূর্বে পাহাড়ি এলাকা ও বনভূমি, রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্র, দক্ষিণে বসতিপূর্ণ এলাকা এবং পশ্চিমে সড়ক ও স্থানীয় বাজার এলাকা। কুতুপালং এলাকা সড়কপথে উখিয়া উপজেলা সদর ও কক্সবাজার জেলা সদরের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রধান সড়ক সংযোগ থাকায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের যাতায়াত সহজ ও সুবিধাজনক।

জনবল ও বাজেট ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয়টিতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক আছেন। ১৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৪ জন কর্মরত অর্থাৎ ২৩ শতাংশ পদ শূণ্য এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সহায়ক কর্মচারী ৭ জনের মধ্যে ৭জন কর্মরত অর্থাৎ কোন শূণ্য পদ নেই। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে সহশিক্ষা চালু আছে। সর্বমোট অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ১০৬৬জন । উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১৬ জন অর্থাৎ ১১ শতাংশ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতাধীন। সেশনচার্জ, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফিসহ সর্বসাকুল্যে শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক আদায় নিমরূপ:

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	নবম শ্রেণি	দশম শ্রেণি
৩৩০০ টাকা	৩৩০০ টাকা	৪৭০০ টাকা	৪৭০০ টাকা	৪৭০০ টাকা

বিদ্যালয়ের অভিগম্যতা ও শিখনমান

সামগ্রিকভাবে, মাধ্যমিকে উখিয়া উপজেলার এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলায় পারদর্শিতা খুব কম। বাংলায় প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় সকলে গড়ে ৫৯.৭৩% (১৫নম্বরের মধ্যেও ৮.৯৬) নম্বর পেয়েছে। ইংরেজিতে পারদর্শিতা আরও শোচনীয়। গড়ে পেয়েছে ৩৩.৩% (সর্বমোট ১৫নম্বরের মধ্যে ৫ নম্বর) নম্বর। আবার গণিতে ২৩.৮৫% (সর্বমোট ২০নম্বরের মধ্যে ৪.৭৭ নম্বর) যা একেবারেই অসন্তোষজনক। ভৌগোলিক দুর্গমতা, দারিদ্র্য এবং শরণার্থী সংকটের প্রভাবে তৈরি হওয়া শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষার্থীদের অনিরাপত্তা বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এখানে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিদ্যালয়ের দূরত্ব এবং যাতায়াত খরচ, পর্যটন এলাকা হওয়ায় শিক্ষার খরচ শিক্ষা সুযোগকে সীমিত করে। র‍্যাম্প এর অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়।

৬. কলাপাড়া, পটুয়াখালী

পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত সংলগ্ন উপকূলীয় নিকটবর্তী উপজেলা কলাপাড়া। কলাপাড়ার মূল অর্থনীতি সমুদ্রের মাছ ধরা হলেও রেস্টুরেন্ট ও আবাসিক হোটেল এখন বর্তমানে এর অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। সেই বিবেচনায় এই উপজেলা কে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে ।বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালের প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২- এর রিপোর্ট অনুসারে কলাপাড়া উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২৭৭০৩৫, যার ৭.৭% দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) এর চেয়ে বেশ কম এবং অতি নিম্ন দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী কলাপাড়া উপজেলার ২ টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট কর্মরত শিক্ষক আছেন ৩৪জন, যার প্রায় ২৩.৫৩ শতাংশ নারী শিক্ষক। এসব বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ১২৭৩ জন, যার মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৫১৩ জন বা ৪০.৩% । সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ মাদ্রাসা, এমপিও, নন-এমপিও বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট বিদ্যালয় সংখ্যা ৩৭ যেখানে ৪৫৯জন (১২২১) শিক্ষক কর্মরত আছেন যার ১১৪জন (২৪.৮৪%) নারী শিক্ষক। সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১৭৭৮, যার ৬০৮২ জন বা প্রায় ৫১.৬৪% মেয়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই উপজেলায় মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ১০.৮% সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় যাচ্ছে বাকি ৮৯.২% অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়ছে। এছাড়া এই উপজেলায় সার্বিকভাবে পুরুষ শিক্ষকের হার অনেক বেশি। তবে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক তুলনামূলক কম, প্রতি ১০০ জনে মাত্র ২৩ জন।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এই উপজেলার শিক্ষক- শিক্ষার্থী অনুপাত ১:২৬ যা সরকারি হিসাবে প্রদত্ত জাতীয় অনুপাতের তুলনায় বেশ কম (জাতীয় গড় অনুপাত ১:২৯)। সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে এই অনুপাতে তারতম্য রয়েছে (১:৩৭) ।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি , মানবসম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো

শিখনের মান

কলাপাড়া উপজেলার একটি স্কুলের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ৪৪ জন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের শিখন দক্ষতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫ এবং গণিতে ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ৫০ নম্বরের একটি অভীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে মোট ১৫ জন ছেলে ও ২৯ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। যার মধ্যে ৮ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২১ জন ও ৯ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৩ জন।

মূল্যায়নে দেখা যায়, বাংলায় মোট ৩ টি প্রশ্নের মধ্যে ৯৫.৪৫% শিক্ষার্থী (৪২জন) সকল প্রশ্নের উত্তর করেছে। কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় সকলে গড়ে ৫৫.৭৩% (১৫নম্বরের মধ্যেও ৮.৩৬) নম্বর পেয়েছে। ১৮% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে । মাত্র ২৫% শিক্ষার্থী ১১ বা তার উর্ধ্বে স্কোর করেছে।সামগ্রিকভাবে তাদের বাংলা বিষয়ে পারদর্শিতা অসন্তোষজনক।

একই শিক্ষার্থীদের ইংরেজি দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করেনি এমন ২জন (৪.৫৪%) শিক্ষার্থী রয়েছে। তবে ৫৯%শিক্ষার্থী (২৬জন) ৩টি প্রশ্নেরই উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং ৩৪% শিক্ষার্থী (১৫জন) ২টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং সর্বশেষ ১টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে ২.২৭% অর্থাৎ ১জন শিক্ষার্থী। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় তারা গড়ে ২৫.১৩% (সর্বমোট ১৫ নম্বরের মধ্যে ৩.৭৭ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে তাদের ইংরেজি বিষয়ে পারদর্শিতা খুবই অসন্তোষজনক। ৭৭% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে এবং ৪.৫৪% শিক্ষার্থী ১১ বা তার বেশি নম্বর অর্জন করেছে।

গণিতের দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় মোট ৭টি প্রশ্নের কোনটির উত্তর প্রদান করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। ২৫%শিক্ষার্থী (১১জন) ৬-৭টি প্রশ্নেরই উত্তর করেছে এবং বাকি ৫২.২৭% শিক্ষার্থী (২৩জন) ৩-৫ টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় তারা গড়ে ১৯.১% (সর্বমোট ২০নম্বরের মধ্যে ৩.৮২ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। কোনো স্কোর অর্জন করতে পারেনি এমন শিক্ষার্থী সংখ্য ৯ জন অর্থাৎ ২০.৪৫%। ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে ৮৬.৩৬% এবং ১৫-২০ স্কোর করেছে এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি । এ থেকে বোঝা যায় তাদের গণিতের পারদর্শিতা একদমই সন্তোষজনক নয়।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

কলাপাড়া উপজেলা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় এলাকা, যেখানে ভৌগোলিক অবস্থান, জীবিকা নির্ভরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। এই অঞ্চলের মানুষ প্রধানত মৎস্য আহরণ ও পর্যটনকেন্দ্রিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। শিশুদের বয়স একটু বাড়লেই অনেক পরিবার তাদের বিদ্যালয়ের পরিবর্তে আয়মূলক কাজে যুক্ত করে দেয়। যেমন- ঘোড়া ভাড়া দেওয়া, হোটেল বা রেস্টুরেন্টে কাজ করা, পর্যটকদের বাইক চালানো, ডাব বা অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি করা ইত্যাদি। ফলে শিশু শ্রমের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়।

এই অঞ্চলে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কম হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, জীবিকার তাৎক্ষণিক আর্থিক চাহিদা। শিক্ষার মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে- এমন ধারণা পরিবারগুলোকে শিক্ষার চেয়ে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে আয়কে অগ্রাধিকার দিতে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোতে এই প্রবণতা আরও প্রকট।

এছাড়া কলাপাড়া একটি ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা-প্রবণ এলাকা। প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্কুলভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ক্লাসরুম নষ্ট হয়ে যায় বা দীর্ঘ সময় পাঠদান বন্ধ থাকে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অনেক শিক্ষার্থী আর বিদ্যালয়ে ফিরে আসে না। অবকাঠামোগত দুর্বলতাও এখানে একটি বড় সমস্যা–প্রায় ৫৬% বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প বা প্রয়োজনীয় সহায়ক সুবিধা নেই, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পথে বড় বাধা সৃষ্টি করে।

এই বাস্তবতা বিবেচনায় কলাপাড়া উপজেলাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে, কারণ এখানে কোস্টাল ঝুঁকি, জীবিকা নির্ভরতা, শিশু শ্রম, দুর্যোগজনিত ক্ষতি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামোর ঘাটতি–সবগুলো চ্যালেঞ্জ একসাথে বিদ্যমান।

অবকাঠামোগত অবস্থা

উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, কলাপাড়ায় মোট ৩৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে যার মধ্যে ২টি সরকারি ও ৩৩টি এমপিওভুক্ত স্কুল রয়েছে।

কলাপাড়া উপজেলার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষকদের জন্য কক্ষ, মাল্টিমিডিয়া ও শিক্ষার্থীদের জন্য খেলার মাঠ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়নি। এবং সরকারি ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর সংক্রান্ত তথ্যও পাওয়া যায়নি। এছাড়া যেসব অবকাঠামোর স্বল্পতা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সীমানা প্রাচীর। মোট বিদ্যালয়ের মাত্র ২.৬% বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর রয়েছে। সীমানা প্রাচীরের অভাব বিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে। ৫৬% বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প ও ৭৪% বিদ্যালয়ে কম্পিউটার আছে বলে উল্লিখিত রয়েছে। অপর্যাপ্ত র‍্যাম্প নির্দেশ করছে যে, এখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বেশ উপেক্ষিত।

উপজেলার পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়: কুয়াকাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার উপকূলবর্তী কুয়াকাটা এলাকায় অবস্থিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুয়াকাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এটি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করে আসছে। বিদ্যালয়টি কুয়াকাটা পর্যটন ও স্থানীয় বসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। উত্তরে ও পূর্বে গ্রামীণ জনপদ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় পর্যটন এলাকা এবং পশ্চিমে স্থানীয় সড়ক ও জনবসতি বিদ্যমান। কুয়াকাটা এলাকা সড়কপথে কলাপাড়া উপজেলা সদর ও পটুয়াখালী জেলা সদরের সঙ্গে সংযুক্ত। পর্যটন এলাকা হওয়ায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে উন্নত এবং শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত সহজ।

জনবল ও বাজেট ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয়টিতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক আছেন । ১৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৪ জন কর্মরত অর্থাৎ ১৩ শতাংশ পদ শূন্য এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সহায়ক কর্মচারী ৬জনের মধ্যে ৬জন কর্মরত অর্থাৎ কোনো শূন্য পদ নেই। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে সহশিক্ষা চালু আছে। সর্বমোট ৪২৬জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮৮ জন অর্থাৎ ৯১ শতাংশ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতাধীন। সেশনচার্জ, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফিসহ সর্বসাকুল্যে শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক আদায় নিম্নরূপ:

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	নবম শ্রেণি	দশম শ্রেণি
২৪০০ টাকা	২৬৪০ টাকা	৩০০০ টাকা	৩৩৬০ টাকা	৩৬০০ টাকা

বিদ্যালয়ের অভিগম্যতা ও শিখনমান

সামগ্রিকভাবে, মাধ্যমিকে কলাপাড়া উপজেলার এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলায় প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ৫৫.৭৩% (১৫নম্বরের মধ্যে ৮.৩৬) নম্বর পেয়েছে। অর্থাৎ বাংলায় শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা কম। ইংরেজিতে গড়ে পেয়েছে ২৫.১৩% (সর্বমোট ১৫নম্বরের মধ্যে ৩.৭৭ নম্বর) নম্বর এবং গণিতে গড়ে ১৯.১% (সর্বমোট ২০নম্বরের মধ্যে ৩.৮২ নম্বর) নম্বর যা অত্যন্ত শোচনীয়। এখানে জীবিকার তাগিদে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোতে মৎস্য আহরণ ও পর্যটনকেন্দ্রিক কার্যক্রমে সাথে শিশুরা যুক্ত। তাই মাধ্যমিকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার তুলনামূলক বেশি এখানে। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা-প্রবণ এলাকা হওয়ায় প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্কুল ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ক্লাসরুম নষ্ট হয়ে যায় বা দীর্ঘ সময় পাঠদান বন্ধ থাকে। পাশাপাশি এই বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পথে বড় বাধা সৃষ্টি করে ।

৭. টঙ্গী, গাজীপুর

বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল হলো গাজীপুরের টঙ্গী উপজেলা। তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত এই জনপদটি ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্মীয় গুরুত্বের (বিশ্ব ইজতেমা) কারণে দেশজুড়ে পরিচিত। টঙ্গীতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কিছু স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে জনসংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ আরও বৃদ্ধির দাবি রাখে। সেই বিবেচনায় এই উপজেলাকে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে । বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালের প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২- এর রিপোর্ট অনুসারে টঙ্গী পশ্চিমের মোট জনসংখ্যা ২,৯২,১৮০ যার ৪০.৪% জনসংখ্যা দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) এর চেয়ে ২১.২% বেশি । আবার টঙ্গী পূর্বের মোট জনসংখ্যা ৪,২২,৩৩৮ যার ৩০% জনসংখ্যা দরিদ্র।এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) এর চেয়ে ১০.৮% বেশি। দুই এলাকাই অতিউচ্চ দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান: টঙ্গী উপজেলার একটি স্কুলের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ৪২ জন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের শিখন দক্ষতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫ এবং গণিতে ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ৫০ নম্বরের একটি অভীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে মোট ১১ জন ছেলে ও ৩১ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। যার মধ্যে ৮ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২২ জন ও ৯ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০ জন।

মূল্যায়নে দেখা যায়, বাংলায় মোট ৩ টি প্রশ্নের মধ্যে ৯৫.২৪% শিক্ষার্থী (৪০জন) সকল প্রশ্নের উত্তর করেছে, ২টি প্রশ্নের উত্তর করেছে ৪.৭৬% শিক্ষার্থী অর্থাৎ ২ জন। তবে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করেনি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় তারা গড়ে ৬২% (১৫ নম্বরের মধ্যেও ৯.৩) নম্বর পেয়েছে। এর মধ্যে ৯.৫২% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। ৪২.৮৬% শিক্ষার্থী ১১ বা তার উর্ধ্বে স্কোর করেছে। সামগ্রিকভাবে তাদের বাংলা বিষয়ে পারদর্শিতা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়।

একই শিক্ষার্থীদের ইংরেজি দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় ৪.৭৬% শিক্ষার্থী (২জন) কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারেনি। তবে ৩৫.৭১%শিক্ষার্থী (১৫জন) ৩টি প্রশ্নেরই উত্তর করেছে এবং ৫০% শিক্ষার্থী (২১জন) ২টি প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় তারা গড়ে ২৯.১৩% (সর্বমোট ১৫নম্বরের মধ্যে ৪.৩৭ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। তবে যেহেতু ৪.৭৬% শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারেনি, তাদের বাদ দিয়ে

বাকিদের গড় স্কোর ৪.৫৯ যা প্রায় ৩০%। সামগ্রিকভাবে তাদের ইংরেজি বিষয়ে পারদর্শিতা বেশ অসন্তোষজনক। ৬৯% অর্থাৎ অর্ধেকেরও অনেক বেশি শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। একইসাথে ১১ বা তার উর্ধ্বে অবস্থান করছে ৯.৫২% বা ৪ জন শিক্ষার্থী।

গণিতের দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় মোট ৭টি প্রশ্নের মধ্যে ২.৩৮% শিক্ষার্থী (১জন) ০-২টি প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে।তবে ২৬.১৯%শিক্ষার্থী (১১জন) ৬-৭টি প্রশ্নেরই উত্তর করার চেষ্টা করেছে এবং বাকি ৭১.৪৩% শিক্ষার্থী (৩০জন) ৩-৫ টি প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করেছে। প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করলে দেখা যায় গড়ে ১৫% (সর্বমোট ২০নম্বরের মধ্যে ৩ নম্বর) নম্বর পেয়েছে। এর মধ্যে ১৬.৬৭% শিক্ষার্থী (৭জন) কোনো নম্বর অর্জন করতে পারেনি। একই সাথে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতার হার ও ০% শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ১৫-২০ নম্বর পেয়েছে। ৯২.৮৬% শিক্ষার্থী ৩৩% বা তার নিচে স্কোর অর্জন করেছে। এ থেকে বোঝা যায় তাদের গণিতের পারদর্শিতা একদমই সন্তোষজনক নয়।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি: গাজীপুরের টঙ্গী এলাকাটি শিল্পসমৃদ্ধ এবং ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় এখানে মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে রয়েছে নাগরিক জীবনের নিজস্ব কিছু চ্যালেঞ্জ। এটি একটি শিল্পাঞ্চল হওয়ায় এখানে মাধ্যমিক শিক্ষার অভিগম্যতা ভৌগোলিক দূরত্বের চেয়ে মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর বেশি নির্ভরশীল। বিশেষ করে পোশাক কারখানায় কর্মরত নিম্ন আয়ের শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা বেশি, ফলে পারিবারিক অসচ্ছলতা এবং কিশোর বয়সে উপার্জনের তাগিদে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ মাধ্যমিক স্তর শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে।

আবার অনেকক্ষেত্রে যেসকল শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যায় তাদের বাবা-মায়েরা দীর্ঘসময় শিল্পকারখানায় অতিবাহিত করার ফলে সন্তানের পড়াশুনার ঠিকমতো খোঁজ খবর রাখে না। যার ফলে সন্তানরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

সর্বোপরি বলা যায়, শিল্পসমৃদ্ধ টঙ্গীতে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও অভিভাবকদের তদারকির অভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে আশঙ্কাজনক হারে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী-বান্ধব অবকাঠামো ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই সমস্যা দূর করতে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা, বিশেষায়িত অবকাঠামো নির্মাণ এবং অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

উপজেলার পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়: মজিদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত গাজীপুর জেলার টঙ্গী এলাকায় অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠান মজিদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। এটি ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গাজীপুর জেলার টঙ্গী ও আশপাশের এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করে আসছে। বিদ্যালয়টির আশপাশে টঙ্গী এলাকার আবাসিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক অঞ্চল অবস্থিত। উত্তরে ও পূর্বে বসতিপূর্ণ এলাকা, দক্ষিণে শিল্পাঞ্চল এবং পশ্চিমে সড়ক ও নগর লক্ষ করা যায়। মজিদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সড়কপথে টঙ্গী ও গাজীপুর জেলা সদরের সঙ্গে সুসংযুক্ত। নিকটবর্তী মহাসড়ক, রেলস্টেশন ও গণপরিবহন ব্যবস্থার কারণে বিদ্যালয়টির যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত।

জনবল ও বাজেট ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয়টিতে শুধু প্রধান শিক্ষক আছেন। সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। ২৭জন শিক্ষকের মধ্যে ১৩ জন কর্মরত অর্থাৎ ৫২.১৪শতাংশ পদ শূন্যএবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সহায়ক কর্মচারী ৭জনের মধ্যে ২জন কর্মরত অর্থাৎং ৭১.৫০ শতাংশ পদ শূন্য। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে সহশিক্ষা চালু আছে। সর্বমোট

৫০৫জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১০ জন অর্থাৎ ৪৩.৩৭ শতাংশ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতাধীন। সেশনচার্জ, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফিসহ সর্বসাকুল্যে শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক আদায় নিম্নরূপ:

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	নবম শ্রেণি	দশম শ্রেণি
১৫০০ টাকা	১৫০৬ টাকা	১১৫০৬ টাকা	১৫১৫ টাকা	১৫১৫ টাকা

বিদ্যালয়ের অভিগম্যতা ও শিখনমান

সামগ্রিকভাবে, মাধ্যমিকে টঙ্গী উপজেলার এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলায় গড়ে ৬২% (১৫ নম্বরের মধ্যে ৯.৩) নম্বর পেয়েছে। বাংলায় শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মোটামুটি। ইংরেজিতে গড়ে ২৯.১৩% (১৫ নম্বরের মধ্যে ৪.৩৭) নম্বর পেয়েছে যা তাদের শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ করে। তবে এর চেয়েও গণিতে পারদর্শিতা বেশি শোচনীয়। গণিতে গড়ে ১৫% (২০ নম্বরের মধ্যে ৩) নম্বর পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। এই এলাকার মানুষের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কিশোর বয়সে শিক্ষার্থীরা অর্থ উপার্জনে লেগে পরে এবং কর্মজীবী বাবা - মায়েদের তদারকির অভাবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যাচ্ছে।